উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত"

৩০শ বর্ষ

(১৩৩৪ মাঘ হইতে ১৩৩৫ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা

Printed by: MANMATHA NATH DASS,
SRI GOURANGA PRESS, 71/1, Mirzapur Street, Calcutta
Published by: BRAHMACHARI KAPILA,
Udbodhan Office, 1, Mukherji Lane, Calcutta

উদ্বোধন সূচী

(৩০ বর্ষ—মাঘ ১৩৩৪ হইতে পৌষ ১৩৩৫)

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	অ	
অন্ধকবি (কবিতা)	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৬৭৭
অভিনয় ও নৃত্য (আলোচনা)	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	৩৬৪
	আ	
আগমনী (কবিতা)	শ্রীবিধুরঞ্জন দাস, এম-এ	৬৪১
আজগুবী	শ্রীঅমিতা রায়	২৩৭
আসামী সংগীত	শ্রীপার্ব্বতিপ্রসাদ বরুয়া, বি,এ	২৮১
আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দ	শ্রীঅবনীনাথ রায়	৩১২, ৪১১
আলোক ও আঁধার (কবিতা)	বিজ্ঞানা	৫৩১
আলো ও ছায়া (কবিতা)	ঐ	৫৫২
আত্মোপলব্ধির ক্রমবিকাশ	শ্রীরজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৬৬৯
	ই	
ইউরোপে চার্চ্চিয়ানিটী	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	৪৮,১০৫
	উ	
উদ্বোধন	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	১
উদ্ভিদের সাড়া (চিঠি)	প্রিন্সিপাল কামাখ্যানাথ মিত্র	১৫১
	ক	
কথাপ্রসঙ্গে	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৩, ৬৫, ১২৯, ১৯৩, ২৫৭, ৩২১, ৩৮৫, ৪৪৯, ৫১৩, ৫৮১, ৬৪৩, ৭০৯
কবিতা	শ্রীনীহারিকা দেবী	১৭২

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
কাসিয়াং হইতে (কবিতা)	শ্রীসুনয়নী দেবী	৪৪০
কৈলাস ও মানস সরোবর	স্বামী বিবিদিষানন্দ	৪৯
	খ	
খাসিয়া ও সিন্‌টেং জাতি	ব্রহ্মচারী মহাচৈতন্য	২২৪, ২৯১
	গ	
গোপাল (কবিতা)	শ্রীসুনয়নী দেবী	৩১৬
গুরু (কবিতা)	শ্রীসুরমা বসু	৬৬৪
	চ	
চতুর্থ সত্তা	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, এম. এ ; বি-এসসি	৭৬২
	ছ	
ছবি (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর	৪৫৪
	জ	
জড় ও চেতন	ডাক্তার	৬৯২
জলসার চিঠি	শ্রীসুষমা দেবী	২৪২
জীবনের হিসাব নিকাশ	শ্রীহরিপ্রসাদ বসু	৬৫৬, ৭৪৬
	ট	
টমাস্ বেকেট	শ্রীগৌরাঙ্গ	৫৩৯
	ত	
তত্ত্ব কথা (কবিতা)	বিজ্ঞানী	৫২০, ৫৯১, ৬৪২, ৭৫৫, ৮৬৫
	দ	
দুরন্ত (গল্প)	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	৪১৭
দৃষ্টি হারা (মেটারলিঙ্ক)	শ্রীপ্রভাতী দেবী	১১৪, ১৫৩
দেব জন্ম (কবিতা)	শ্রীনীহারিকা দেবী	৫৭১
	ন	
নামানুরাগ (কবিতা)	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	১২৫
	প	
পল্লীছবি (কবিতা)	শ্রীসুনয়নী দেবী	৬১৬

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
পল্লীর নববর্ষ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র	২১৮
পিটার দি গ্রেট্ ও আলেকসিস্ (হ্যাভেজল্যাণ্ডার)	শ্রীপ্রভাতী দেবী	২৮৭
পুস্তক পরিচয়		৫১১, ৫৭৫, ৬৪০, ৬৯৯, ৭৬৫
প্রাচীন ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতি	অধ্যাপক শ্রীবাসমোহন চক্রবর্ত্তী	৫০৪, ৬২৫
প্রেমের সন্ধান (কবিতা)	শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক	৫২৬
পৌরাণিকী	শ্রীপ্রভাতী দেবী ও শ্রীঅমিতা রায়	৪৯৮, ৫৫৯, ৬২১
পরীক্ষান্তে (কবিতা)	শ্রীনীহারিকা দেবী	৩৬৪
বর্ষা আগমনী (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৭৪
বাঁশী (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর	৮০০
বিক্রমশীলা	অধ্যাপক শ্রীবাসমোহন চক্রবর্ত্তী	৩২৮
বাংলার সমাজ	ডমরুধর	৬৭০
বিদায় (কবিতা)	স্বামী অসিতানন্দ	৬১
বিজয়া (কবিতা)	শ্রীবিধুরঞ্জন দাস, এম এ	৬৪১
বিদায় (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর	১৫৮
বিবর্ত্তন (গল্প)	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ	৪৮৮
বুদ্ধবাণী (আঁনা ভৌল ফ্রাঁস্)	বাসুদেবানন্দ অনুবাদক	৩৮
বৈদিক ভারত	অধ্যাপক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস	১৬, ১৩৯, ২১০, ২৭১, ৫৩২, ৫৯৮
বেদ-ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী সুন্দরানন্দ	৬৭৮
বিগত শতাব্দীর ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ		৭৩৪

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
ম		
মাধুকরী		৫৬, ৭৩, ১৭৪, ২২০, ২৪৫ ৩১৭, ৪৪২,
য		
যীশুখৃষ্ট (কবিতা)	শ্রীবিবেকনান্দ মুখোপাধ্যায়	২৬৪,
র		
রাগমালা	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সংগীত রত্নাকর	১৩২, ৩০০, ৩৪৩, ৪৪১, ৪৭৯, ৫৬৬
রাজযোগ (স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রীঅমিতা রায় অনুবাদিকা	৩৪০, ৪০৭, ৪৫৭, ৫২০, ৭৮৮
রোঁমালোঁর চিঠি	স্বামী বাসুদেবানন্দ (অনুবাদক)	৩৪৮, ৪৪৩, ৪৭৫, ৫২৭.
ল		
লঙ্কা কাণ্ড (রস-গল্প)	বজ্রকীট	৩৫
লাঠ্যোষধি (রস-গল্প)	ঐ	৯৩
শ		
শক্তি	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৪৬২, ৫৯২
শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীপ্রমদাসুন্দরী দাসী	২০১
শৈশব (কবিতা)	শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর	৬২৪
শিক্ষকদের প্রতি অভিভাষণ	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই সি এস	১৫৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৫
ষট্‌চক্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৮২
স		
সরল বেদান্ত	স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ	৯৮

প্রবন্ধ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
সমালোচনা		৬৩, ১২৬, ১৯০, ২৫৬, ৩২০, ৭৮১
সর্ব্বানন্দ	শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী	১৯৯, ৪৯৩, ৫৫৩, ৬০৯
সারদা (কবিতা)	শ্রীমণীন্দ্রমোহন চাকী	৫৭৭
সাহিত্য জগৎ	শ্রীকালীপ্রসন্ন কর, শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী	৬৩৭, ৬৮৬
সিন্ধু (কবিতা)	শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়	৯১
সৃষ্টি-রহস্য	শ্রীদুর্গাপদ মিত্র বি-এ, বি-এস, সি,	২৩১
স্বপ্ন	স্বামী বাসুদেবানন্দ	৩০৩, ৩৫৩
স্বপ্নরথ (কবিতা)	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৩৩৯
স্বামী বিবেকানন্দের পত্র	স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ (অনুবাদক)	৯, ৭৮, ১৩৫, ২০৮, ২৬৮, ৩২৬, ৩৯৭, ৪৫৫, ৫৮৬
স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন		১০৩, ১৬৯, ৩১৩, ৩৬৭, ৬১৭, ৬৬৬, ৭২৫
স্বামী সারদানন্দ	স্বামী নিখিলানন্দ	৩৫৭, ৪৪৭
সংঘমিত্রা (কবিতা)	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৯৪
সংঘবার্ত্তা		৬৪, ১২৭, ১৯২, ২৫৩, ৩২০, ৫১১, ৫৬৬, ৬৪০, ৭০০, ৭৬৬
স্বামী প্রেমানন্দ	ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য	৭১৬
হ		
হিমালয় (কবিতা)	শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়	৬৫৪
ক্ষ		
ক্ষীরোদ-স্মৃতিতর্পণ	শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	২৭

উদ্বোধন

"আমায় মানুষ কর"—মূর্ত্ত মানবতা, কবি, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক, আচার্য্য, সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ মানব সাধারণের সহিত একাত্মবোধ আনিয়া জগদম্বার কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন,—"মা, আমায় মানুষ কর।" মানুষ তখনও ছিল—এখনও আছে, কিন্তু যুগাবতার যে বর্ত্তমান ভারত গঠন করিতে আসিয়াছিলেন সেই নূতন-পুরাতনের সংগ্রামে বিজয় পতাকা বহন করিবার মত সামর্থ্যবান্ মানুষ তো ছিল না! মানুষ তখনও ছিল—এখনও আছে, কিন্তু 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' তিল তিল করিয়া সকলের অজ্ঞাতে—সকলের অলক্ষ্যে নিজের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কাজ করিতে পারে, অন্যের কল্যাণ-কামনায় নিজের সমস্ত সুখস্পৃহা—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—নিঃশেষে অম্লানবদনে বিলাইয়া দিতে পারে এমন মানুষ তো ছিল না! তাই স্বামিজী মায়ের কাছে মানুষ চাহিয়াছিলেন,—মনুষ্যত্ব চাহিয়াছিলেন।

তিনি শ্রীভগবানের নিকট যে সাধনা পাইয়াছিলেন তাহা মানুষ গড়িবার সাধনা—মনুষ্যত্বের সাধনা। এই সাধনা যাহারা গ্রহণ করিবে অশ্রুজল তাহাদের চিরসাথী। আত্মীয় স্বজনের দুঃখে, সমাজের দুঃখে, জগতের দুঃখে তাহাদের নিশিদিন কাঁদিতে হইবে; বিশ্বের সমস্ত প্রাণিজাতের সহিত গভীর সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। শান্তি?—বিরাটের সহিত একাত্মবোধে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যখন মুছিয়া যাইবে তখনি তো শান্তি! এ পথে যাহারা চলিবে, বিচ্যুতি

তাহাদের পদে পদে। সিদ্ধি?—পদে পদে ভুল করিয়াই তো অশেষ অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের সিদ্ধি! এইরূপে দুঃখ ও বিপদকে চিরসাথী জানিয়া অকম্পিত হস্তে যাহারা এই সাধন-চক্র গ্রহণে সাহসী হইবে, এস তাহারা কোথায় আছ, হে মনুষ্যত্ব সাধকের দল! অবনত ভারত আজ তোমাদেরই চাহিতেছে। তোমাদেরই উদ্দেশ্যে স্বামিজী বলিয়াছেন, "ভুল করুক, ক্ষতি নাই, সকল কার্য্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয় ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনী? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত কে বুঝে?"

বুঝে না বলিয়াই তো জাতির এত দুর্দ্দশা। বুঝে না বলিয়াই তো সত্য ও আদর্শকে বিদায় দিয়া, আচার ও নিয়মের গলিত শবকে পূজা করিয়া জাতি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। সত্যস্বরূপ দেখিয়া হাসিতেছেন!!! নিয়ম—জড়, মানুষ—চেতন। প্রকৃতি, জড় নিয়মের নিগড় দিয়া চেতন মানুষকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নিয়ম-শৃঙ্খলভারে জর্জ্জরিত মানুষ ধুঁকিয়া মরিতেছে। প্রকৃতির এই নিয়ম-শৃঙ্খল—দেহের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের—চূর্ণ করিয়া সেই ভগ্নস্তূপের উপর স্বাধীন মানুষ নৃত্য করে।

স্বাধীনতা—উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। কোটি জন্মের পরাধীন মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ কখনও পায় নাই বলিয়া স্বাধীনতার অপর নাম দিয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতা। অধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝখানে সীমা-রেখা তাহারা টানিতে জানে না। তাই তাহাদের আছে মাত্র দুইটি পথ,

এক—অধীনতা, অন্য—উচ্ছৃঙ্খলতা। কিন্তু স্বাধীন মানুষ ইহাদেরই মধ্যপথে তরী বাহিয়া চলিয়া যায়। ইহাই কৌশল। এই কৌশলের নামই সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধ সাধককে প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়বদ্ধ জড় জগতের উপর দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে হইবে। তাহার কাজের জন্য এইরূপ জীবন্ত মানুষই স্বামিজী চাহিয়াছিলেন,—জীর্ণ, পরপদলেহী, অসংযমী, ছিদ্রান্বেষী, দাস হইয়াও প্রভুত্ব-প্রিয়, কুটিলস্বভাব কতকগুলি মরা মানুষ নহে।

এইরূপ মানুষ গড়িবার ভার শ্রীস্বামিজী 'উদ্বোধনে'র উপর দিয়া গিয়াছেন। এই দায়িত্বভার বিস্মৃত না হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না চাহিয়া, শুধু সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সে যেন চিরকাল নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে—যুগাবতারের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

কথাপ্রসঙ্গে

'কথাপ্রসঙ্গে' কিছু লেখবার জন্যে অন্দর থেকে আদেশ উঠল, কিন্তু লিখি কি? আমার চোখে ত আর কবির গোলাপী চশমা আঁটা নেই যে, কাঁকুরে জমিতে বাস করে উড়ের পান খেগো দাঁতের মত পাথর, শুকনো দুর্ভিক্ষ পীড়িত ধূলো মাখা, ক্যাদ হত্তকি, শাল শিমূলের গাছ দেখে "বঙ্গলক্ষ্মীর" "সবুজ শাড়ি" পরে "নদীর গান" শোনার ছড়া বা গল্প তৈরী করবো। তবে ইতিহাসে নাকি সাক্ষী আছে জাহাঙ্গির বাদশা শিমূল না পলাশের রূপ দেখে চোখ ফেরাতে পারেন নি। সেই জন্যে আমাদের দিশী লোকেরা বলে, 'ছেলে দেখতেই কেবল শিমূল ফুলের মত'। শুকনো মোষ তাড়ান, ট্যানা পরা, কালকিষ্টে সাঁওতাল ছোঁড়া ছুঁড়ি, গায়ে নিমের তেলের গন্ধে বমি ওঠে, 'হাঁড়িয়া' খেয়ে বেল্লামি করে, বুদ্ধিতে পশু অপেক্ষা অধিক নয়—কিন্তু চোখে যখন

রং লাগে তখন তার মধ্যেই "কাল হরিণ চোখের" সন্ধান পাওয়া যায়, আর তাদের কলম-বাড়া আঙুলযুক্ত দড়ির মত হাতপা-ওয়ালা ছবি মাসিক পত্রিকায় বিরাজ করে। কাব্যি লিখলে, ছবি আঁকলে, নীতির প্রশংসা করলে—কিন্তু সেই চা-বাগানের ও কয়লার খনির ভূত-গুলোর civilised বা cultured হওয়া দূরের কথা—খিদেও মিটল না। তেরঙা দাদারা দু একদিন তাদের ঘরে বাস করে এস না! এত দরদী তোমরা; তোমাদের ফরসা ফরসা শিক্ষিত ছেলেমেয়ে-গুলোকে তাদের সঙ্গে ঘর করিয়ে দাও না—তবে ত বুঝব তোমাদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মর্দানী। কেন, স্বামী বিবেকানন্দও ত "কচুর পাতায় জল ঝরা, সবুজ ঘাসের কিংখাপ মোড়া" বাঙলার রূপ দেখে-ছিলেন, তবে কি কোরে বলতে পারি বঙ্গলক্ষ্মীর রূপ নেই? আরে বেকুব, সে যে কুঁড়ের লোক, ভাঙ্গির কল্কেয় টান দিত, সাঁওতাল-দের সঙ্গে মাটি কোপাত; সে যে ঐ দলেরই লোক ছিল, নইলে ইউরোপের রাজপ্রাসাদে শুয়ে ভাইরা খেতে পায় না বলে কাঁদে? খ্যাদা বোঁচা ছেলেও মায়ের কাছে কত সুন্দর, কারণ সে যে আপনার রক্ত। তা বলে আমরা কি করে তার মধ্যে রূপ দেখি? আমরা যে সুন্দরের উপাসক, রাজপ্রাসাদে বাড়ী, বীণা আর বাঁশী ছাড়া শুনিই নে—সহরের আনাচ কানাচ ও রেলগাড়ির দুপাশ দেখেই আমাদের গ্রামের অভিজ্ঞতার ইতি করে দেই, আমরা যদি বঙ্গলক্ষ্মীর সবুজ সাড়ীর বহর কত মাপি ত সেটা বড়লোকের মৌখিক নকুতো অর্থাৎ যাকে শুদ্ধ ভাষায় ভণ্ডামি বলে, তা ছাড়া আর কিছু কি? আমার এক কবি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আচ্ছা ভায়া! তোমার গুরু-ঠাকুর ত এত বড় লিখিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে স্ত্রী-শরীরের বর্ণনা করতে তাঁর মত জগতে নাকি আর কেউ নেই, কিন্তু প্রথম হিমালয় দেখে হঠাৎ তাঁর মন বোবা হয়ে গেল কেন, কে তাঁর কল্পনার চোখে একটা পর্দা টেনে দিলে?—তাকে মাথা চুলকুতে দেখে, আমি চিন্তান্বিত হয়ে বললুম, বোধ হয় যারা যা নিয়ে থাকে ও করে সেটা তারা যেমন "কালি কলমে" লেখার "কল্লোল" ছোটাতে পারে

এমন আর কেউ পারে না। আমরা রাজারাজড়া লোক—পাড়া গাঁয়ের নিখুঁত ছবি আঁকতে গেলেই গোপনে ইংরিজীর তরজমা করে প্রবন্ধ লেখার মত হয়ে পড়ে। তবে বলতে পার 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'।

গুরু মশাইদের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকেই আমার passive resistance চলে আসচে জানই ত—বিশেষ কিছু যে পুঁথি কেতাব থেকে বের করতে পারবো তার বড় ভরসা করো না, তবে বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শোনা ও নিজের চোখে দেখা দুচারটে কথা লেখবার আছে। আমরা একে নব্য-রসিক, তাতে আবার সাহিত্যিক, কাজেকাজেই বাস্তব-শিল্প সম্বন্ধে দু একটা বেফাঁস কথা যদি বেরিয়ে যায় ত কিছু মনে কর না দাদা। এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ১৮৭৫ খৃঃঅব্দে। পৌরাণিক ভাগবৎকার বা প্রাচীন রসিক চণ্ডীদাসদের কথা বলচিনি, আমি নব্য-রসিকদের কথা বলচি। ভানুসিংহীর বীজ ছড়ানয় "জ্ঞানাঙ্কুরে" দেখা দিল, "বনফুল"। তিনিই প্রথম ভারতলক্ষ্মী "কমলা"কে শেখালেন, যে-বিবাহে সম্মতি নেই সে-বিবাহ বিবাহই নয়। এক ম্লেচ্ছ সমালোচক নাকি বলেছে যে, ওটা খানিকটা কালিদাসের "শকুন্তলা" ও বঙ্কিমের "কপালকুণ্ডলা"র নকল আর বাকিটা সেক্সপীয়ারের "Tempest" ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্তের "Ruth"এর ছায়া। আর যে উপন্যাসখানি তাঁর প্রথম লেখা "করুণা" সেটা হল বঙ্কিমের অনুকরণ। তা ছাড়া "গাথা" যা লিখলেন তার ওপরও স্কটের "Metrical Romance" এর প্রভাব খুব বেশী।

কিন্তু জাতীয়তার দিক থেকে আমরা নিশ্চয়ই বল্‌বো, তিনি ইংরেজী সরস্বতীর কিছু মাত্র ধার ধারেন না, কেবল ঐ "বনফুলে"র "কমলা" চরিত্র ছাড়া, যার চরম বিকাশ হয়েছে কাব্য-কুঞ্জে মা ও বোনের মুখে স্ত্রীর চিত্র ফুটে ওঠায়। ফ্রয়েড সাহেব যদি একবার বাঙ্গলা দেশের সবজী-বাগের পাতাবাহারের মধ্যে ঘোরেন ত তাঁর "Oedipus Complex"এর ঢের নমুনা পাবেন। ধাত্রী বিলিতী সরস্বতী, দ্রোণাচার্য্য সাহস করে যে-লক্ষ্য ভেদ কোর্‌তে পারেন নি, চেলারা সেই লক্ষ্য ভেদ কোরে দ্রৌপদীকে লাভ কোর্‌লে।

আমার ভাইরা সব কেউ লণ্ডন, এডিনবার্গ, বার্লিন গিয়ে Ph. D., D. Sc. হয়ে আসচে দেখে আমি একদিন মনোরথে চড়ে বিলেতে পাশ কোর্‌তে গেলুম। বিশ্ববিস্থালয়ের কর্ত্তারা বল্‌লে, তোমার ও বেপরোয়া Genius এখানে চলবে না, কাজে কাজেই খানকতক সেক্সপীয়ারের নাটক আর Religio Medici পড়ে ফিরে এলুম। ভাবলুম, পাশ না কোর্‌তে পারি কিন্তু এমন life দেখাব যে, আমার সাহিত্যের প্রতি ছত্রে তা রঙে উঠবে। কিন্তু যাহোক্ বিলিতী সরস্বতীর কৃপা আমার ওপর হোল। যাই হওয়া আর মেটার্‌লিংকের পরীর টুপ পরিয়ে দেওয়ার মত সব জিনিষের সার দেখ্‌তে পেলুম। দেখলুম, আমাদের দেশের মেয়েরা সব সামাজিক নীতি-জ্ঞানহীন আর বিদেশের মেয়েরা সব এক একটি নীতির আদর্শ। প্রবন্ধ লিখলুম, দাদার সঙ্গে ঝগড়াও হল, title পেলুম "বাণীবিনোদ"। এতদিন পরে আমার সেই মতের একটা advocate পাওয়া গ্যাচে—সেটি হচ্চে ফেরঙ্গ যুবতী মিস্ মেও।

কী কেবল আবোল তাবোল বকে যাচ্চ। Realistic Art এর আবিষ্কার কর্ত্তার সম্মান আমরা কিছুতেই ভানুসিংহীকে দিতে দেব না। তুমি ভাব যে, বিলেত ফেরত না হলে বুঝি আর কোনও Originality থাকতে পারে না। ভাটপাড়ার সদ্ ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের কথাটা তোমার জানা আছে কি? চন্দ্রশেখরের "শৈবলিনী" তোমার "কমলা"র মুখে ডুশো ঝাড়ু মারে। ওত বে'র পর, এযে বে'র পূর্ব্বেই। কিন্তু বে'র পূর্ব্বে অনুরাগ হওয়াটা ত অস্বাভাবিক নয়, আর তা ছাড়া চাড়িয্যে মশায় শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে বাস্তব শিল্পের একেবারে দফারফা করে ছেড়েচেন। ছোট চাড়িয্যে মশায়ও এমন সিক্রেট যে "পেয়ারী"কে সন্ন্যাসিনী বানিয়ে ছাড়লেন। Realistic Art এর কাজ হচ্চে—মানুষের দুর্ব্বলতার দিকটাই দেখিয়ে সেটাকে Idealise কোরে তুলবে। যত রকমের পাপ আছে, সবের মধ্যে খড়ি ও পরচুলো দিয়ে একটা দেবত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে। শৈবলিনী যদি repentই করুলো, তবে তার সঙ্গে আর খৃষ্টানীর সঙ্গে পার্থক্যটা কি

রইলো। বাস্তব শিল্পীরা repentanceও মানে না, বা বেদান্তাদের "দুর্ব্বলতাই পাপ" এ মতবাদও মানে না। তারা বলে দুর্ব্বলতাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

কিন্তু মাঝে মাঝে একটা দুর্ভাবনা ওঠে—শিল্পরসের ভালমন্দের কি করে নির্ণয় করা যেতে পারে? কেউ ঘোমটা দিতে গিয়ে হাটুর ওপর কাপড় তুলচেন, কেউ পা ঢাকতে গিয়ে ওপর দিক আদুড় করে ফেলচেন। কেউ বলচেন—খাবার সময় ঢেকুর তুল্লেই তুমি একটা nuisance, কেউ বলচেন খাবার সময় রুমালে ভড় ভড় করে সর্দ্দি যদি ঝাড় ত পঙ্‌ক্তি থেকে উঠে যাও। এখন 'কাক্কু বন্দি কাক্কু নিন্দি দোনো পাল্লাভারি'। কি জ্ঞান ভায়া! ঐ যে তোমার সাঁওতালী নাচ আর Ball dance, ওসানীয়া দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের যৌনতত্ত্ব আর আধুনিক সমাজ তন্ত্রীদের সমাজতত্ত্ব, Barbarism আর Civilisation, ভগবান গীতায় যে দৈবী ও আসুর সম্পদের কথা বলেচেন, সেই আসুর সম্পদের দুটো দিক বা রকম ফের।

আসুর সম্পদের দিক থেকে রাবণ—রামের চাইতে ঢের বড় ছিল, অযোধ্যা ও লঙ্কার বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায়। কিন্তু সসাগরা ধরার অধিপতি রাবণ কি কখন ভেবেছিল, দুটো ছোঁড়া আর বাঁদরের হাতে তাকে মরতে হবে? খেয়াল, টপ্পা, গজল, তাজমহলের অবিষ্কর্ত্তা মোগল বাদসারা কি কখনও ভেবেছিল যে, পার্ব্বত্য মুষিকেরা এসে দিল্লীর ভিত শিথিল করে দেবে,—না বিদেশী বণিকেরা তাদের বাবুর্চি করে রাখবে, আর তাদের রংমহালগুলো কনেষ্টবলদের আড্ডা হবে? সেদিন গীতা-ক্লাসে দৈবী সম্পদের ব্যাখ্যা শুনে এলুম—ফুরফুরে কাপড়, থাসা তেড়ি আর leather এর qualityটা খুব বেসমী হওয়া চাই। মনটায় বেশ আরাম পাওয়া গেল। কিন্তু লিখতে বসে বিপরীত চিন্তা এসে সব গুলিয়ে দিচ্চে। এখন দেখচি, শিল্প সাহিত্যে Idealistic, Suggestive, Realistic, Conventional সব ভাব দরকার। ঐ চারটে জিনিষকে ব্যবহার করতে জানা চাই। নইলে কামানের নলের

সামনে বসে তোপ দাগা গোচের হয়। আনন্দ ও উচ্চরস Art এ না দিতে পারলে সেটা Materialistic হয়ে পড়ে।

অলৌকিক বিষয়ে Idealism চলে। দেবদেবীর মূর্ত্তি কিংবা প্রাকৃত দৃশ্যকে মূর্ত্ত কর্‌বার জন্যে তুমি পদ্মপাতা বা খঞ্জনের চোখের অনুকরণ কর, মৃণালের ডাঁটার মত বাহুকে লতিয়ে দাও, আর আঙ্গুলগুলোকে তার পাপড়ির মত ফুটিয়ে তোল (Conventional বা Provincial)—অতি সুন্দর হবে। কিন্তু সাঁওতাল বা ভিখারী আঁকতে গিয়ে যদি Ideal বা Conventional সাঁওতাল বা ভিখারী আঁক ত বড়ই বিসদৃশ হয়ে পড়ে।

এখানে দরকার Art of Perfection। এখানে Realism নইলে চলে না। দেশের ও দশের জন্যে তুমি Suggest কোর্‌তে পার মনুষ্যত্বকে বজায় রেখে। পশুত্বের Reality দেখিয়ে তুমি কোনও কিছু Suggest কোর্‌তে পার না। মনের তিনটে দিক—জ্ঞান, ইচ্ছা আর ক্রিয়া। জ্ঞানের (thinking) দিক থেকে তুমি Ideal গড়্‌তে পার, ইচ্ছার (feeling) দিক দিয়ে তুমি Suggest করতে পার, আর ক্রিয়ার (willing) দিক দিয়ে তুমি Realistic হও, ক্ষতি নেই। টাকা পয়সা, ব্যবসা বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, মরণ বাঁচনের সমস্যায় পড়ে মানুষ যে Realism এর আশ্রয় নেয় সেটাকে ভবিষ্যতের জন্য Suggestও করা যায় না বা আদর্শরূপে তুলেও রেখে দেওয়া যায় না। কোন বিশেষ কাপড় বা শস্যের আধিক্য বর্ত্তমান সময়ে দেশের মঙ্গল সাধন কোর্‌তে পারে কিন্তু একশো বছর পরে তার দরকার থাকবে কিনা তা আমরা বল্‌তে পারি না। তা ছাড়া Art of Realismএর ভাব ও রস —যতটা সয় ততটাই ভাল। শুধু Realism in War দিয়ে যেমন প্রজাশাসন হয় না, তেমনি অসংযমী Realism in Art দিয়ে মনের আনন্দ হয় না। সকাল থেকে তার পরদিনের সকাল পর্য্যন্ত আমরা যা করি, বলি বা ভাবি সবই Real। তা বলে সব ব্যাপারই কি সকলের সামনে বলা বা করা চলে? মনেরও খানিকটা দিক আমরা গোপন রাখি—এই গোপনের নাম Convention। Convention যখন মানতেই হবে তখন ভদ্রলোকের মতনই ত মানা ভাল।

কুকুর-শেয়াল ও মানুষ—দুই পশু জগতের মধ্যে পড়ে। এ দুটোর পার্থক্য রেখেচে ঐ Conventionএ। কেন-না মানুষ কুকুর-শেয়ালের মত ব্যবহার করে না—তার ঘর চাই, বাড়ী চাই, সমাজ চাই, স্ত্রী ও পুত্রের ঠিক থাকা চাই। এ সব Convention না মান ঐ দলে নাম লিখিয়ে পশুত্বের জয় ঘোষণা কর।

ভায়া! আজ লিখতে গিয়ে ভেবেছিলুম গোঁড়াদের এক হাত নেব। কিন্তু বিলিতী সরস্বতীর মুখে লাথি মেরে দিশী সরস্বতী আমার ঘাড়ে চেপে উলটো গাওনা লিখিয়ে নিলেন। আজ তাই এই পর্য্যন্ত। বারান্তরে ফের দেখা যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(স্থানে স্থানে উদ্ধৃত)

সোমবার, ২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬
হাইডিউ ক্যাভারশাম, রিডিং,
ইংল্যাণ্ড।

কল্যাণবরেষু,

শরতের মুখে সমস্ত অবগত হইলাম। * * আমি নিজের কর্তৃত্ব লাভের আশায় নয়, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতে মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে রাখিবে। * * নিয়মবদ্ধ হওয়া ভাল নহে বটে, কিন্তু অপক্ক অবস্থায় নিয়মের বশে চলাব আবশ্যক অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ,

অলস মনে অনেক পরচর্চ্চা দলাদলি প্রভৃতি ভাব সহজেই আসে। সেইজন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশগুলি লিখিতেছি। তদনুযায়ী কাজ যদি কর, পরম মঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহও নাই।

প্রথমতঃ মঠ চালাইবার সম্বন্ধে লিখি :—

১। মঠের জন্য একটা যথেষ্ট স্থান সহিত বাটী ভাড়া লইবে অথবা বাগান যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। একটা বড় হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর যেখানে লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয় আরও একটা বড় হল ঐ বাটীতে থাকার আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চা সাধারণের জন্য হইবে।

২। কোনও লোক মঠে আসিলে সে যার সহিত দেখা করিতে চায় তারই সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে দিক্ না করে।

৩। এক একজন পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে—যাহাতে সাধারণ লোক যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তাহার সদুত্তর পায়।

৪। যে যার আপনার ঘরে বাস করিবে—বিশেষ কার্য্য না পড়িলে আর একজনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে যাহার পড়িবার ইচ্ছা হইবে যাইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া বা অপরের সহিত কথাবার্ত্তা একেবারেই নিষেধ করিবে। নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে।

৫। সারাদিন সকলে পড়ে একটা ঘরে বাজে কথা কওয়া ও বাহিরের লোক যে সে আসছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, তাহা একেবারেই নিষেধ।

৬। কেবল যাহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, তাহারা শান্ত ভাবে আসিয়া সাধারণ হলে বসিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে। অথবা কোনও সাধারণ জিজ্ঞাস্য থাকে, সেদিন-

কার জন্য যিনি সেই কার্য্যের ভার পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবে।

৭। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করিবে।

৮। একটা ছোট ঘর আফিস হইবে। যিনি সেক্রেটারি, তিনি সেই ঘরে থাকিবেন ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখ্‌বার সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্ত থাকিবে। তিনি সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন ও যে সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি আসে, তাহা তাঁহার নিকট আসিবে ও তিনি পত্রাদি * * যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাঁটিয়া দিবেন। পুস্তক ও পত্রিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে।

৯। একটা ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য। তদ্ভিন্ন অপর কোনও স্থানে তামাক খাইবার আবশ্যক নাই।

১০। যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাঁহাকে ঐ সকল কার্য্য মঠের বাহিরে যাইয়া করিতে হইবে। ইহার অন্যথা তিলমাত্র না হয়।

শাসন-সমিতি

১। একজন মোহান্ত প্রতি বৎসর নির্ব্বাচন করিবে অধিক লোকের মত লইয়া। দ্বিতীয় বৎসর আর একজন ইত্যাদি।

এ বৎসর রাখালকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মোহান্ত কর, তদ্বৎ আর একজনকে সেক্রেটারি কর। তদ্বৎ আর একজন পূজাপত্র ও রান্না-বান্নার তদারক করিবার জন্য নির্ব্বাচন কর।

২। সেক্রেটারির আর এক কাজ—তিনি সকলের স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখিবেন।

সে বিষয়ে তিন উপদেশ আছে :—

প্রথম। প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটি নেয়ারের খাটিয়া ও তোষক ইত্যাদি। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। রান্না ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোষহীন হয়, তাহা অবশ্যই করিবে, কারণ, দুষ্ট বা অপরিষ্কৃত জলে ভোগ রাঁধিলে মহাপাপ হয়।

তৃতীয়। শরৎকে (স্বামী সারদানন্দকে) যে প্রকার কোট করিয়া দিয়াছ, ঐ প্রকার গেরুয়া আল্‌খাল্লা প্রত্যেককে দুইটি করিয়া দিবে এবং কাপড় চোপড় যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহা দেখিবে। বাটী অত্যন্ত পরিষ্কার যাহাতে হয়—নীচের উপরের সমস্ত ঘর—সে দিকে নজর রাখিবে।

৩। যে কেউ সন্ন্যাসী হতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে—এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে, তার পর সন্ন্যাসী করিয়া দিবে।

ঠাকুর পূজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে।

বিভাগ

মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা—

১ বিদ্যা-বিভাগ, ২ প্রচার-বিভাগ, ৩ সাধন-বিভাগ।

১। বিদ্যা-বিভাগ—যাহারা পড়িতে চায় তাহাদের জন্য পুস্তকাদি ও অধ্যাপক সংগ্রহ এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে তাহাদের জন্য অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে।

২। প্রচার-বিভাগ—মঠবাসী ও প্রবাসী। মঠবাসী প্রচারকেরা প্রত্যহ শাস্ত্রাদিপাঠ ও প্রশ্নোত্তরাদি দ্বারা জিজ্ঞাসুদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবে।

৩। সাধন-বিভাগ—যাঁহারা সাধন ভজন করিতে চান, তাঁহাদের আপন আপন ঘরে সাধন ভজনের যাহা আবশ্যক তাহার সহায়তা করা ইত্যাদি।

কিন্তু একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাউকেও যে পড়িতে

দিবেন না অথবা প্রচার করিতে দিবেন না এ প্রকার না হয়। যিনি উৎপাত করিবেন, তাঁহাকে অন্তর হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে—ইহাতে অন্যথা না হয়।

মঠবাসী প্রচারকেরা পর্য্যায়ক্রমে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষা-গৃহের দ্বারে লট্‌কাইয়া দিবেন অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি-জিজ্ঞাসু জ্ঞান-শিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি।

বামাচার সাধনের উপযুক্ত আমরা কেহ নহি অতএব বামমার্গের নামগন্ধও যেন মঠে না হয়। যিনি একথা না শুনিবেন, তাঁহার স্থান বাহিরে। ও-সাধনের নাম পর্য্যন্ত যেন মঠে না হয়। তাঁর ঘরে যে দুর্ব্বৃত্ত বিকট বামাচার ঢোকায়, তার ইহপরকাল উৎসন্ন হইবে।

৪। কোনও স্ত্রীলোক যদি কোনও সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে আইসে, তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। কোনও স্ত্রীলোক অন্য কোনও ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ঠাকুর ঘর ছাড়া।

৫। কোনও সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে যাইয়া বাস করিতে পাইবে না।

৬। দুশ্চরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোনও অছিলায় তাদের ছায়া যেন আমার ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দুশ্চরিত্র হয়, যে কেহ হউক, তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকার নাই। প্রভু অনেক ভাল ভাল লোক আনিবেন।

৭। শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে ও প্রচারের গৃহে ও সময়ে যে কোনও স্ত্রীলোক আসিতে পারেন, কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রই চলিয়া যাইতে হইবে।

৮। কোনও ক্রোধ বা ঈর্ষাপ্রকাশ বা গোপনে একজনের নিন্দা আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না।

আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একটা আসন ও খাইবার জন্য একটা ছোট চৌকি। আসনে বসে চৌকির উপর থালা রেখে খাবে—যে প্রকার রাজপুতানায়।

কার্য্যকরী সভা

সমস্ত অফিসার তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারায় যে প্রকার বুদ্ধ মহারাজের আজ্ঞা অর্থাৎ একজন প্রোপোস (Propose—প্রস্তাব) করিল, অমুক এক বৎসরের জন্য মোহান্ত হউক। সকলে হাঁ কি না কাগজে লিখিয়া একটা কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। যদি হাঁ অধিক হয়, তিনি মোহান্ত ইত্যাদি।

যদিও তোমরা উক্ত প্রকারে অফিসার করিয়া লইবে, তথাপি আমি Suggest করি যে, এবৎসর রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মোহান্ত, তুলসী স্বামী নির্ম্মলানন্দ সেক্রেটারি ও ট্রেজারার (সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ . গুপ্ত স্বামী সদানন্দ) লাইব্রেরিয়ান পুস্তকাধ্যক্ষ), শশী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ , কালী (স্বামী অভেদানন্দ , হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) পর্য্যায়ক্রমে পড়াবার ও উপদেশ করবার ভার লউক ইত্যাদি। সারদা যে কাগজ বার কর্ত্তে চেয়েছে সে উত্তম কথা বটে, কিন্তু সকলে মিলে মিশে কর্ত্তে পার ত আমার সম্মতি আছে।

মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতারাদি বলে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথা। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার, নূতন ও progressive (উন্নতিশীল অর্থাৎ পুরাণোরা সব একঘেয়ে—এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারি করিতে হবে।

পুরাতন ধর্ম্ম বেশ ছিল বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম্ম—একাধারে

• স্বামী ত্রিগুণাতীতের এই বাঙ্গলা কাগজ বাহির করিবার সংকল্প ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে কার্য্যে পরিণত হয়। স্বামিজীর সাহায্যে তৎকর্ত্তৃক ঐ সময় হইতে 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্ররূপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের অন্তে আমেরিকা গমন পর্য্যন্ত তিনি উহা উত্তমরূপে পরিচালন করেন।

যোগ জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম—আচণ্ডালে জ্ঞানভক্তিদান—আবালবৃদ্ধবনিতা। অন্যান্য সকল ঠাকুর দেবতা ঠিক—কিন্তু রামকৃষ্ণ একাধারে সব। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্যক অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে অন্য সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের। নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না—তা না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয় না। * * এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম্ম, নূতন বেদ। হে ভ্রাতা, কবে এই পুরাণোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ। গোঁড়ামি না হলে কল্যাণ দেখ্‌ছি কৈ, তবে অপরের দ্বেষ ত্যাগ কর্‌তে হবে।

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তা হলে আমি মঠভাড়া এবং অন্যান্য সমস্ত খরচপত্র পাঠাইয়া দেব। অপিচ—মা,—মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐপ্রকার একটা মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। সেথায়—মাকে এক বৎসর মোহান্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও সমস্ত খরচপত্র আমি পাঠিয়ে দেব।

* * দুজন জগন্নাথ দেখ্‌তে গেল—একজন দেখ্‌লে ঠাকুর আর একজন দেখ্‌লে পুঁইগাছ!!!

* * তিনি নিজেই বল্‌তেন, "নাচিয়ে গাহিয়ে তারা নরকে যাইবে"—এ নরকের মূল "অহঙ্কার।" * * তাঁর কৃপায় বড় বড় দেবতার মত মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেথানে তাঁর দয়া পড়্‌বে।

Obedience is the first duty (আজ্ঞাবহতাই প্রথম কর্ত্তব্য) যা বলি, করে ফেল দেখি। এই কটা ছোট্ট ছোট্ট কাজ প্রথমে কর দেখি—তার পর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে।　　অলমিতি

নরেন্দ্র

পুঃ এই চিঠি—সকলকে পড়াবে এবং তদনুযায়ী কাজ করা যদি উচিত বোধ হয় আমাকে লিখ্‌বে।—কে বল্‌বে, যে সকলের দাস, সেই সকলের প্রভু। যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে, সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।　　ইতি

নরেন্দ্র

বৈদিক ভারত

(ঋগ্বেদীয় যুগ)

প্রথম অধ্যায়

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব

(বর্ত্তমান প্রতিপাদ্য বিষয়ের পূর্ব্বাভাষ)

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ সনাতন এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বিদ্যমান আছেন, এমন কি, ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন। কল্পান্তে বেদ পরব্রহ্মে লীন হন, এবং নূতন সৃষ্টির সময়ে আবার তাঁহার প্রকাশ হয়। এই বিশ্বাসের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, এই অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ইহা হইতে এইটুকু উপলব্ধ হয় যে, হিন্দুরা বেদকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

ঋগ্বেদ যে আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ, তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এবং তাঁহাদের প্রাচ্য শিষ্যগণের মতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ পঞ্চনদ প্রদেশে খৃঃ পূঃ ১৫০০ কিংবা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণ কিংবা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইউরোপের মধ্যভাগ বা উত্তর ভাগ হইতে (কাহারও কাহারও মতে ভূ-মধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে) আততায়ীরূপে পঞ্চনদ প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন; পরে পঞ্চনদ প্রদেশের আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় দাস ও দস্যুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের অধিকৃত ভূমি গ্রহণপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে আর্য্যগণের এই অভিযান বর্ত্তমান সময় হইতে আনুমানিক চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের

সিউড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে পঠিত।

এই মতই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া তদনুসারে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহা স্কুল ও কলেজে পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছি।

বেদ পাঠ বা বেদের আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে এক প্রকার নাই বলিলেও চলে। এখন যে সামান্য বেদ-চর্চ্চা হইতেছে, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণ করিয়াই হইতেছে। তাঁহারা বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং তাঁহারা আর্য্যগণের ভারত-অভিযান সম্বন্ধে যে কাল্পনিক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া তন্মূলে প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইয়াছে। দুই একজন ব্যতীত আমাদের দেশের বৈদিক পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কোনও প্রয়াস করেন নাই। সুতরাং আমাদের জীবনে ও চিন্তায় এখন পাশ্চাত্য মতই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক উত্তর মেরুমণ্ডলে আর্য্যগণের আদি বাসস্থান নিরূপিত করিয়া গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তকের নাম Arctic Home in the Vedas তৎপরে বঙ্গদেশে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মাঙ্গোলিয়া প্রদেশে আর্য্যগণের আদি বাসস্থান অবধারণ করিয়া বাংলা ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। গুজ্জরদেশে শ্রীযুক্ত পাবগীও Aryavartic Home, অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তেই আর্য্যগণের আদিবাস, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা তিলকের পুস্তক প্রকাশিত হইলে, তাঁহার মতের সত্যাসত্য-নিরূপণ করিবার জন্য আমি বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করি। প্রায় ১৫ বৎসর কাল পাঠ ও আলোচনার পর আমার মনে হয় যে, আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতা-নিবদ্ধ মন্ত্রসমূহ সপ্তসিন্ধু (বর্ত্তমান পঞ্চনদ) প্রদেশেই সুদীর্ঘ তিনটি যুগ ব্যাপিয়া রচিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, (ঋগ্বেদ ৩।৩২।১৩ ; ৬।২১।৫), এবং সেই মন্ত্রসমূহের মধ্যে এরূপ ভৌগলিক প্রমাণ পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে,

মন্ত্ররচনার যুগে বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্তে জলস্থলের বিভাগ, সংস্থান ও সমাবেশ অন্যপ্রকার ছিল। অর্থাৎ সপ্তসিন্ধু বা পঞ্চনদের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগে আসাম উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ একটি সমুদ্র ছিল, পঞ্চনদের দক্ষিণ ভাগেও বর্ত্তমান রাজপুতানা প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়া আর একটি সমুদ্র ছিল; পশ্চিমভাগে আধুনিক সিন্ধু-প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়া আর একটি সমুদ্র ছিল, এবং আর্য্যভূমির উত্তরভাগে হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তরদিকে মধ্য এসিয়া সমাচ্ছন্ন করিয়া আর একটি প্রকাণ্ড ভূমধ্যস্থ সাগর ছিল। এই চতুঃসমুদ্রের সীমার মধ্যে (ঋগ্বেদ ৯।৩৩।৬; ১০।৪৭।২) আর্য্যভূমি অবস্থিত ছিল। সপ্তসিন্ধু প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে বহ্লীক, গান্ধার ও বর্ত্তমান আফ্গানিস্থান এবং পশ্চিমদিকে প্রাচীন আরেকোসিয়াও (Arachosia) আর্য্যভূমির অন্তর্গত ছিল। ঋগ্বেদে কুভা (বর্ত্তমান কাবুল নদী), ক্রুমু (বর্ত্তমান কুরাম নদী) এবং ওয়াজিরিস্থানের প্রান্তভাগে প্রবাহিত গোমতী (আধুনিক গোমল নদী), এবং আরেকোসিয়ার মধ্যে প্রবাহিত সরযু (হরযু নদী) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই নদী সমূহের তীরে এবং সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আর্য্যগণ, আর্য্য ঋষিগণ এবং আর্য্য রাজগণ বাস করিয়া বৈদিক যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। ঋগ্বেদে বহ্লীক দেশে প্রবাহিত কতিপয় নদীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর তাহাতে পঞ্চনদ বা সপ্তসিন্ধু প্রদেশের সমস্ত নদনদীরই উল্লেখ আছে। উত্তরে মূজবান্ (আধুনিক কৈলাস) পর্ব্বতেরও উল্লেখ আছে *। মূজবান্ পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট সোমলতা উৎপন্ন হইত। সোম-যাগের জন্য এই সোমলতা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। এই কারণে মূজবান্ পর্ব্বতজাত সোমলতার নাম 'মৌজবত' হইয়াছে; (ঋগ্বেদ ৯।৮২।১)।

* মহাভারতে (১৪।৮।১) মূজবান বা মুঞ্জবান্ পর্ব্বত সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে:—

"গিরের্হিমবতঃ পৃষ্ঠে মুঞ্জবান্ নাম পর্ব্বতঃ।
তপ্যতে যত্র ভগবাংস্তপো নিত্যমুমাপতিঃ॥"

যাস্কের নিরুক্তেও আছে:—"মৌজবতো মূজবতি জাতো মুঞ্জবান্ পর্ব্বতো মুঞ্জবান্ মুঞ্জঃ।"

ঋগ্বেদে গঙ্গার উল্লেখ কেবলমাত্র একবার এবং যমুনার উল্লেখ দুইবার মাত্র দৃষ্ট হয়। যে সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীর উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুবার দৃষ্ট হয় সেই সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর অনতিদূরে প্রবাহিত হিন্দুদের দুইটি প্রধান পবিত্র নদীর উল্লেখ ঋগ্বেদে দুই একবার মাত্র দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইতে হয়।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে; সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগে আধুনিক গাঙ্গেয় প্রদেশের (Gangetic Provinces) উপর সমুদ্র বিস্তীর্ণ থাকায়, গঙ্গা ও যমুনা হিমালয় হইতে সমতল প্রদেশে কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়াই সমুদ্রে (ঋগ্বেদে ইহাকে 'পূর্ব্ব সমুদ্র' বলা হইয়াছে) নিপতিত হইত। এই কারণে এই নদীদ্বয়ের আকার ক্ষুদ্র থাকায় ঋগ্বেদে ইহাদের বহু উল্লেখ নাই এবং ইহাদিগকে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের সপ্তনদীর গণনারও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের পূর্ব্বভাগে কোশল, পঞ্চাল, বৎস, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশেরও কোন উল্লেখ নাই। তাহারও কারণ আর কিছুই নহে। এই সমস্ত প্রদেশ সেই পুরাকালে পূর্ব্ব-সমুদ্রের গর্ভে নিমগ্ন ছিল। কালক্রমে হিমালয় হইতে নিঃসৃত গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর পলিমাটি দ্বারা সমুদ্রগর্ভ ধীরে ধীরে পূরিত হইতে থাকিলে, এই সমস্ত প্রদেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হয়। নবো-ত্থিত ভূমিভাগ যেরূপ বাসযোগ্য ও কৃষিযোগ্য হইতে লাগিল, সপ্তসিন্ধু নিবাসী আর্য্যগণও ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া সেই ভূমিভাগ অধি-কারপূর্ব্বক তাহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিকে আর্য্যগণের এইরূপ অগ্রসর হওয়ার বিবরণ 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেখিতে পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র রচনা কালে কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত। এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া মহাত্মা তিলক গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সেই কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং দীক্ষিতের মতে খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল *। এই কালের আরও বহু পূর্ব্বে বাহুগণ বিদেঘ মাথব ও গোতম ঋষির নেতৃত্বে সরস্বতী

* শতপথ ব্রাহ্মণ (২।১।২।৪)

নদীর তট হইতে বৈশ্বানর অগ্নির অনুগমন করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া সদানীরা (আধুনিক গণ্ডকী) নদীর তট পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই স্থলে 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"বিদেঘ মাথব সেই সময়ে সরস্বতীতে (অর্থাৎ সরস্বতী নদীর তীরে) ছিলেন। সেই (অগ্নি) ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করিয়াছিল, এবং রাহুগণ গোতম ও বিদেঘ মাথব সেই দহন-প্রবৃত্ত (অগ্নির) পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি এই সমস্ত নদীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে (কিংবা এই সমস্ত নদীকে অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করিয়াছিল)। কিন্তু সদানীরা (নামে যে নদী) যাহা উত্তর পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল ইহাকেই বিদগ্ধ করিতে পারে নাই। 'বৈশ্বানর অগ্নি ইহাকে বিদগ্ধ করে নাই' এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে তাহা (ঐ নদী) পার হইতেন না। তাহার পর এখন (তাহার) পূর্ব্বভাগে বহু ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। (সেই সময়ে) ঐ স্থান ক্ষেত্রের নিতান্ত অযোগ্য ও জলপ্রচুর ছিল, কেননা বৈশ্বানর অগ্নি তাহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখন তাহা বেশ ক্ষেত্র-যোগ্যই হইয়াছে, কারণ ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে ইহার আস্বাদন করাইয়াছিলেন।" ইত্যাদি *

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সদানীরার সহিত বর্ত্তমান গণ্ডকী নদীকে অভিন্ন মনে করেন। কেহ কেহ তাহাকে আধুনিক করতোয়ার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, সদানীরার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ তৎকালে জলময় এবং বাসের ও কৃষির অযোগ্য ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে ইহার অনতিদূরেই ঋগ্বেদোক্ত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত 'পূর্ব্ব সমুদ্র' বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'পূর্ব্ব সমুদ্র' ক্রমশঃ পূরিত হইয়া সরিয়া আসিতে আসিতে সদানীরার সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত ছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

* শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ।
'শতপথ ব্রাহ্মণ' (১।৪।১।১০—১৭)

বর্ত্তমান মগধ দেশের দক্ষিণাংশকে পূর্ব্বকালে 'কীকট' দেশ বলিত। ঋগ্বেদে (৩।৫৩।১৪) কীকট দেশের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার যুগে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অব্যবহিত পূর্ব্ব-ভাগে সমুদ্রের অস্তিত্ব নিতান্ত কাল্পনিক। কিন্তু মগধের যে দক্ষিণাং-শের নাম কীকট ছিল, তাহা পার্ব্বত্য ভূমি থাকায় কখনও যে পূর্ব্বসমুদ্রের অন্তর্গত ছিল তাহা মনে হয় না। তাহা দক্ষিণাপথের উত্তরসীমারূপে পূর্ব্বসমুদ্রের দক্ষিণকূলে অবস্থিত ছিল। ঋগ্বেদে সমুদ্র-যাত্রী আর্য্যবণিকগণের বহু উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বসমুদ্রে সঞ্চরণ করিতে করিতে এই উপকূলের বিষয় তাঁহারা অবগত ছিলেন, এবং এই প্রদেশবাসী লোকেরা সোমরসের সহিত গোদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতেন না, তাহা তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন। আর এই প্রদেশের গাভীগণও প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিত না, সেই কারণে 'কীকট দেশের গাভী' একটি প্রবাদের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিত অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ড্ (Prof. Hillebrandt) বলেন যে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশের একটি পর্ব্বতময় বিভাগের নাম কীকট ছিল। এই বিভাগে প্রচুর সোমলতা জন্মিত; কিন্তু এই প্রদেশের গাভীগণ প্রচুর দুগ্ধ না দেওয়ায় কেহ সোমরসের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিত না। এই কারণে বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন, "কীকট দেশের গাভীগণ তোমার কি করিবে? অর্থাৎ তোমার কি কাজে লাগিবে?" (ঋগ্বেদ ৩।৫৩।১৪)। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে এই প্রদেশবাসিগণ দক্ষিণ মগধে বাস করিয়া প্রাচীন মাতৃভূমির নামানুসারেই ইহার নাম কীকট রাখিয়াছিল। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়; কারণ সোমলতা এক সপ্তসিন্ধুদেশে ও হিমালয় পর্ব্বতেই জন্মিত; অন্য কোথাও জন্মিত না। প্রাচীন কীকট দেশবাসী আর্য্যগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত না। এবং সম্ভবতঃ বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনাও করিত না। এই কারণে একদিকে তাহারা যেমন বৈদিক আর্য্যগণের নিন্দাভাজন হইয়াছিল,

তেমনই অপরদিকে পরবর্ত্তী যুগে বেদবিদ্বেষী শাক্যসিংহ তাহাদেরই মধ্যে তাঁহার বেদবিরোধী অভিনব ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রচার করা হয়ত সুবিধা-জনক মনে করিয়াছিলেন।

সপ্তসিন্ধু দেশের পূর্ব্বদিকে যেরূপ 'পূর্ব্বসমুদ্র' ছিল, তাহার দক্ষিণ-দিকেও বর্ত্তমান রাজপুতানা প্রদেশ সমাছন্ন করিয়া দক্ষিণসমুদ্র বিস্তীর্ণ ছিল। এই দুই সমুদ্রের মধ্যে সংযোগ থাকায়, সপ্তসিন্ধু দেশ দক্ষিণা-পথ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং আরবল্লী (পারিযাত্র) পর্ব্বত, বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ও সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া আর্য্যগণ দক্ষিণাপথে গমন করিতেন না। পর্ব্বত-মহারণ্য-সমাচ্ছন্ন হিংস্র-পশু-সমাকীর্ণ এই অন্ধকারময় ও ভয়াবহ দেশে গমন করাও তাঁহারা নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। এই কারণে ঋগ্বেদে দক্ষিণাপথের কোনও প্রদেশ, পর্ব্বত, নদ নদী বা জনপদের উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে গঙ্গা যমুনার সামান্য উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু নর্ম্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, বিন্ধ্যপর্ব্বত বা জনস্থান প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই। দক্ষিণ দিকে যে সমুদ্র ছিল, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহার নাম Rajputana sea অর্থাৎ 'রাজপুতানা-সমুদ্র' রাখিয়াছেন। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার যুগে সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশের দুইটি বৃহৎ নদী তাহাদের জলরাশি এই 'রাজপুতানা সমুদ্রে' বহন করিয়া আনিত। সেই দুইটির নাম সরস্বতী ও শতদ্রু। ঋগ্বেদের দুইটি মন্ত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এই দুইটি নদী 'সমুদ্রের' মধ্যে নিপতিত হইতেন। (ঋগ্বেদ ৭।৯৫।২, ৩।৩৩।২) বর্ত্তমান সময়ে সরস্বতী নদী রাজপুতানার মরুভূমির বালুকারাশি মধ্যে বিলুপ্ত এবং শতদ্রু নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার পরবর্ত্তী যুগেই 'রাজপুতানা সমুদ্রের' তলদেশ উত্থিত হইয়া স্থলভাগে ও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ একটি প্রবল ভূমিকম্পবশতঃ এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কিংবা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সমুদ্রের তলদেশ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া থাকিবে। সমুদ্র তিরোহিত হইয়া তৎস্থলে মরুভূমি হইলে,

সরস্বতীর স্রোতোবেগ বালুকাস্তূপ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পশ্চিম দিকে একটি নূতন পথ প্রস্তত করিতে বাধ্য হয় এবং পরে সিন্ধুনদীর সমান্তরালে একটি খাত খনন করিয়া কচ্ছ দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে নিপতিত হয়।

কালক্রমে মরুভূমির বালুকারাশি বাত্যাতাড়িত হইয়া এই খাত পূর্ণ করিয়া ফেলে। তখন সপ্তসিন্ধু প্রদেশে পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হইতে না থাকায়, সরস্বতীর স্রোতোবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং বালুকারাশি ঠেলিয়া সমুদ্রাভিমুখে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। পরিণামে সরস্বতী মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গেলেন। শতদ্রু নদীর মুখও বালুকারাশি দ্বারা বদ্ধ হওয়ায়, তাহারও স্রোতোবেগ পশ্চিমদিকে একটি নূতন খাত খনন করিয়া তাহাকে সিন্ধুনদের সহিত মিলিত করিল। হিমালয়ের তুষার-ক্ষেত্রের (Glacier) মধ্যে শতদ্রুর উৎপত্তি। পূর্ব্বসমুদ্র ও দক্ষিণসমুদ্রের তিরোধানবশতঃ সপ্তসিন্ধু দেশে বৃষ্টিপাত অল্প হইলেও, গলিত তুষার দ্বারা শতদ্রুর জলরাশি নিয়ত পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; এই কারণে শতদ্রু পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও অপরিবর্ত্তিতই আছেন। কিন্তু সরস্বতী হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশ হইতে উত্থিত হওয়ায় এবং নিম্নপ্রদেশের তুষার ক্ষেত্র কালক্রমে বিলুপ্ত হওয়ায় ক্রমশঃ ক্ষীণাঙ্গী হইতে লাগিলেন। এখন তিনি এরূপ শীর্ণা হইয়াছেন যে, তাঁহাকে প্রাচীনকালের সরস্বতী বলিয়া আর চেনা যায় না। সরস্বতীর পরিত্যক্ত খাতের চিহ্ন অদ্যাপি মরুভূমির মধ্যে লক্ষিত হয় *।

* "An explanation of the decrease of Himalayan glaciers is that it was a consequence of the diminution of the fall of snow, consequent on the gradual change of climate which must have followed a gradual transformation of an Ocean-area into one of dry land. The last named circumstance would also account for the great changes in the quantity of rainfall, and in the flow of the rivers of which there are many instances in Western India, in Persia and the region east of the Caspian."

Encyclopædia Britannica vol. ii. p. 688 (9th Edition).

সরস্বতীর যে দশা, দৃষদ্বতীরও সেই দশা হইল। কালক্রমে এই দুইটি নদী বিলুপ্ত-প্রায় হইলে, সপ্তসিন্ধু (সাত নদীর দেশ) পঞ্চনদ নাম গ্রহণ করিল এবং এখনও এই নামেই পরিচিত।

'রাজপুতানা সমুদ্র' কোন সময়ে তিরোহিত হয়? এই সমুদ্রের তিরোধান যে একদিনে বা এক সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নহে। বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া 'রাজপুতানা সমুদ্রে'র তলদেশ ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল, এবং কিয়দংশ শুকাইয়া যাইতেছিল। ঋগ্বেদে মরুভূমিরও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার যুগেই যে এই সমুদ্রের কিয়দংশ শুকাইয়া গিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিঃ ওয়াদিয়া (Mr Wadia) তাঁহার 'ভারতের ভূতত্ত্ব' (Geology of India) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, অত্যাধুনিক (Pleiastocene) যুগেও 'রাজপুতানা-সমুদ্রে'র অস্তিত্ব ছিল। তাহার পর ইহার তলদেশ ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকায় ইহার জলরাশি শুকাইতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান সময়েও ভূকম্পন দ্বারা রাজপুতানা প্রদেশের সমুদ্র-প্রান্তবর্ত্তী ভূভাগ কখনও সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইতেছে এবং কখনও বা সমুদ্রের তলভাগ উত্থিত হইয়া স্থলে ও বালুকাময় ভূমিতে পরিণত হইতেছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কচ্ছদেশের সমুদ্রের খাঁড়ির (Rann of Cutch) পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ২০০০ বর্গমাইল ভূমি সহসা সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ৬০০ বর্গমাইল ভূমি সমুদ্রের তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া একটি উচ্চ বাঁধের আকারে পরিণত হয়। এই বাঁধের নাম 'আল্লা-বাঁধ' বা পরমেশ্বরের সৃষ্ট বাঁধ *। বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্রগর্ভ হইতে ভূমি যেরূপে উত্থিত হইতেছে—পুরাকালেও 'রাজপুতানা সমুদ্রে'র তলদেশ সেইরূপে উত্থিত হইয়াছিল। পুনরায় প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেটকার (Mr. V. B. Ketkar) পৌরাণিক ও জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৭৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে

* Wadia's Geology of India.

রাজপুতানার উপর সমুদ্র বিস্তীর্ণ ছিল *। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যে ৯৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই মন্ত্রগুলি খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল †। বিলাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ওয়েলস্ সাহেব (Mr H G. Wells) তাঁহার Outlines of History নামক গ্রন্থে দুইটি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৫০০০০ বৎসর হইতে খৃঃ পূঃ ২৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপুতানা ও গাঙ্গেয় প্রদেশের উপর সমুদ্র বিদ্যমান ছিল, সেই সমুদ্র বিশুষ্ক হইতে অথবা স্থলভাগে পরিণত হইতে আরও বহু সহস্র বৎসর লাগে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ খৃঃ পূঃ ১০০০ বা ২০০০ বৎসরে রচিত হয় নাই, পরন্তু আরও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সপ্তসিন্ধু প্রদেশেই রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে যে আর্য্য-সভ্যতার বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহা অত্যুন্নত ছিল। তাহা যে অসভ্য জাতির অসভ্যতার আকারে ছিল না মৎপ্রণীত 'Rigvedic Culture' (ঋগ্বেদের সভ্যতা) নামক পুস্তক পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। যদি খৃঃ পূঃ ১৫০০০ বা ২০০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-সভ্যতা এরূপ উন্নত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সভ্যতার আরম্ভ যে আরও সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই কারণে, আমার বিশ্বাস, পবিত্র সপ্তসিন্ধু প্রদেশেই আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ছিল এবং তাঁহারা ইউরোপ বা উত্তর মেরুমণ্ডল হইতে অথবা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার 'Rigvedic India' (ঋগ্বেদের ভারত) নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পাশ্চাত্য

---

* Paper read at the first Oriental Conference held at Poona

† Rigvedic Culture pp. 37-38 (R. Cambray & Co. 1925).

পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার এই মতের মধ্যে সত্য ও সম্ভাবনীয়তা আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন * । যদি এই মত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে আর্য্য-সভ্যতা যে ব্যাবিলোনীয়, আসীরীয় ও মিশরীয় সভ্যতা অপেক্ষাও বহু প্রাচীন তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার বর্ত্তমান ধারাকেও পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

অধ্যাপক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

---

* "The era of Rigvedic civilisation is calculated by the author to be at a period of 25000 or 20000 years ago, and it is maintained that the Aryan mind by then had attained 'a comparatively high state of culture'. The subject is a difficult one and it is pregnant with possibilities and probabilities. All theories, as a rule, are based upon conjectures and surmises and this theory is no exception to the general rule. There are many conflicting versions as regards the original cradle of the Aryans ; it has been shifted by generations of oriental scholars from one place to another—Kashmir to Central Asia, to Mesopotamia, to the Arctic regions, to Northern and Central Europe and from there to a region lost in the Mediterranean Sea. However Dr. Das has made out a case based upon fresh data and critical examination of the above conflicting theories, and his solution as such is commendable." Pioneer (28-2-26).

ক্ষীরোদ-স্মৃতি-তর্পণ

হিন্দুর শ্রাদ্ধ-বাসরে বিরাট-পাঠের রীতি আছে। শুনিয়াছি, শ্রাদ্ধ-দিনে ঐ বিরাটপাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য—পূর্ব্বপুরুষের লীলা-কথা বা ইতিহাস-স্মরণ দ্বারা শোক-অপনোদন করা। যে স্বনামধন্য নাট্যকবির স্মৃতি-তর্পণ করিতে বাঙ্গলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজস্ব সারস্বত-নিকেতনে আপনারা আজ সমবেত হইয়াছেন, সেই শ্রদ্ধেয় কবির সান্নিধ্য আশৈশব লাভ করিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছি। আমাদের সংসারে, আমার জীবনে, প্রতিবেশী তিনি, এক পরম আত্মীয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন;—আমি তাঁহাকে 'জ্যেষ্ঠতাত' সম্বোধন করিতাম। সুতরাং সে হিসাবে তিনি আমার পূর্ব্বপুরুষ। অতএব বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তাঁহার এই শ্রাদ্ধ-সভায় শোকাশ্রুর তর্পণ করিতে করিতে তাঁহারই জীবনেতিহাসের পর্য্যালোচনা শুনিতে পাইলে, অধিকন্তু, সে আলোচনায় স্বয়ং যোগদান করিতে পারিলে, আমার যে কথঞ্চিৎ লাভ ও কিঞ্চিৎ শান্তি আছে—তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মৃতি মনের মধ্যে উদিত হইলে, আমার মানস-সম্মুখে প্রতিভাত হয়—সেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের একাগ্র সাধনার মূর্ত্তি। সাহিত্য-সাধনায় কেমন করিয়া কবি আপনার তনু-মন মগ্ন করিয়া দিতেন, তাহা দেখিয়া বাল্যে বিস্মিত হইয়াছি, যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছি।

বিশেষভাবে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ না করিলে, বিশেষভাবে তাঁহাকে আহ্বান না করিলে, লেখন-তৎপর কবি কল্পলোকের উচ্চস্তর হইতে নামিয়া আসিতে পারিতেন না। বাল্যে সকৌতুকে অনেকবার দেখিয়াছি, সংসাহিত্যিক ও সুরসিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত ক্ষীরোদপ্রসাদ-স্মৃতি-সভায় (১৩৩০, ১৮ই অগ্রহায়ণ) লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, কবির অদূরে রক্ষিত পাত্র হইতে কবির জন্য প্রদত্ত খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিতেছেন,—লিখন-মগ্ন নতদৃষ্টি কবির চৈতন্য নাই। কবির উপেক্ষিত খাদ্যবস্তু সদ্ব্যবহার করিয়া, নিঃশব্দে ভোজন-পাত্রগুলি অপসারণ পূর্ব্বক বিপুলকায় সমাজপতি মহাশয় সশব্দে আসন গ্রহণ করিয়া কবিকে কুশল প্রশ্ন করিতেন। সমাজপতি মহাশয়ের কম্বুকণ্ঠের আহ্বানে তাঁহার যেন বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধে চেতনা ফিরিয়া আসিত। "কি হে কতক্ষণ এসেছো ?"—বলিয়া সম্মুখে চাহিতে না চাহিতেই কবি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইতেন যে, পাত্রসমেত জলখাবার কোথায় অতর্কিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সমাজপতি মহাশয় কর্ত্তৃক তিনি এরূপভাবে বহুবারই উপহসিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার চমকিত দৃষ্টি, শুধু সমাজপতি মহাশয়ের নহে, আমাদেরও কৌতুককে—বিস্ময়ে পরিণত করিয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-নিষ্ঠার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছি আর একদিন,—যে দিন তাঁহার আদরিণী কনিষ্ঠা কন্যা 'পদ্মিনী' সংসারের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। 'পদ্মিনী' নাটক রচনার পর এই কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাই তিনি আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'পদ্মিনী'। আদরিণী কন্যার শেষ-শয্যা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি যখন আমাদের গৃহে আসিয়া দেখা দিলেন, তখন তাঁহার শোকাহত মুখচ্ছবির বিষাদ-কালিমা আমাদের কৈশোর-দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহার শুষ্ক আঁখি-পলকের পশ্চাতে যে অগাধ শোকাশ্রু সঞ্চিত আছে, তাহা তাঁহার ক্লিন্ন মুখশ্রী আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছিল। এমন সময়ে, অ-দূরে কবির স্ব-গৃহ হইতে শোকের মর্ম্ম-ভেদী আকুলধ্বনি উত্থিত হইল। জলভরা মেঘ অনুকূল বাতাসের প্রশ্রয় পাইয়া এইবারে বুঝি অজস্র বারি-বর্ষণ করিবে! আমরা প্রতিক্ষণে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,—কিন্তু সে মেঘে বারিবর্ষণ হইল না,—সংসারের শোকের বাতাস সে মেঘকে দ্রবীভূত করিতে পারিল না। সকলের বিস্ময় দৃষ্টির সম্মুখে, shelf হইতে আপনার কাগজপত্র পাড়িয়া লইয়া কবি নাট্য-রচনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন,

—সদ্যঃপ্রাপ্ত সন্তানশোকের দারুণ আঘাতেও তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল না, সাধক কবির একনিষ্ঠ সাধনায় বিঘ্ন ঘটিল না।

এইরূপ সাধন-তন্ময়তা ও একাগ্র নিষ্ঠার ফলে 'প্রতাপাদিত্যে'র ন্যায় যুগান্তকারী নাটক মাত্র একপক্ষকাল সময়ের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল। এই অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনা-উৎসের সন্ধান লইতে গেলে দেখিতে পাই যে, সু-প্রাচীন অধ্যাপক ও গুরুবংশ হইতে উদ্ভূত ক্ষীরোদপ্রসাদ, পিতৃপিতামহের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ক্ষীরোদপ্রসাদ, গীতায় শ্রীভগবানের মুখ-নিসৃত নির্দ্দেশ-বাণীকে—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—সংসার-ব্যাধির এই অমোঘ উপদেশকে কেমন শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যোগস্থ হইয়াই কর্ম্ম করিতেন। সাহিত্য-সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের সংকল্পিত কর্ম্ম। সে কর্ম্ম-সাধনায় তিনি নিজেকে এমন অবলীলাক্রমে মগ্ন করিতে পারিতেন, এমন অকপট-তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন যে, সততই আমাদের মনে হইত, শতসঙ্গের মধ্যেও তিনি একান্ত নিঃসঙ্গ। তাই বন্ধুবান্ধবের নানা আলাপমুখরতার মধ্যেও, বহু সঙ্গিসহচর পরিবৃত হইলেও বহুসঙ্গ সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ কবির সাধনার ফল অত অল্প সময়ের মধ্যে 'প্রতাপাদিত্যে'র মধ্যে মূর্ত্ত হইতে পারিয়াছিল। জনকোলাহলের মধ্যে বসিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আত্মস্থভাবে সংকল্পিত কর্ম্ম-সাধন করিতে তাঁহাকে চিরদিন যেমন দেখিয়াছি, অপর কাহাকেও তেমন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কর্ম্ম-যোগীর এই স্ব-প্রকৃতিস্থভাব আমার হৃদয়কে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবনত করিয়া দিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনব্যাপী এই অচঞ্চল সাহিত্য-সাধননিষ্ঠা, ভাষা-জননীর রাতুল চরণে শ্রদ্ধার যে স্রক্-চন্দন নিবেদন করিয়াছে, তাহার নন্দন-সুরভি সুদূর ভবিষ্যতের কাব্যামোদী বা নাট্যামোদী পাঠককে পুলক দিতে পারিবে কি না, তাহা একমাত্র কালই বলিতে পারে। আজ মানুষ নাই,—কিন্তু পুঁথির পাতায় পাতায় তাহার মর্ম্মকথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মানুষ যতশীঘ্র ধ্বংস হয়—তাহার সাধনার ফল ঠিক তত শীঘ্র ধ্বংস হয় না। তাই মানুষের অপেক্ষা বড় জিনিষ—

তাহার সাধনার দান। কোন্ বিশেষ কথা তিনি শুনাইতে চাহিয়াছেন,—সে কথায় আমাদের জীবনে শিক্ষা, প্রাণে আনন্দ, ও মনে নূতন রস-সঞ্চার করিতে পারে কিনা,—তাহা জানিতে পারাই আমাদের পরম লাভ। ক্ষণ-বিধ্বংসী মানুষটাকে লইয়া বেশী টানাটানি করিয়া লাভ কি? ঐতিহাসিক যে যাদুস্পর্শে অতীতের অচেতন ভগ্নস্তূপকে প্রাণময় করিয়া তুলেন, সে মোহিনীশক্তি আমার নাই। সুতরাং ক্ষীরোদ-প্রসাদের জীবনের খুঁটিনাটি কথায় অবতারণায় আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিবার ইচ্ছা বা সাহস আমার নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখা সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আমি একটু আলোচনার চেষ্টা করিব। কারণ, লেখা জিনিষটার দাম অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে করি। স্তূপে, গিরি-গুহায়, প্রস্তর-ফলকে—যাঁহারা আপনাদের মর্ম্ম-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্বে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ঐ খোদিত লিপিই কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া আজ না আমাদিগকে কত নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিতেছে!

ক্ষীরোদপ্রসাদের বিশাল গ্রন্থরাজির আলোচনা করা—সেও এক বিরাট্‌পর্ব্ব। সেরূপ বিরাট্ কিছু করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমি অক্ষম হইলেও, আমার অপটু লেখনীর সাহায্যে ক্ষীরোদ-প্রতিভার আভাস দিবার আগ্রহকে কোনমতে দমন করিতে পারিতেছি না।

জেনারেল এসেম্ব্লীজ কলেজে রসায়নের অধ্যাপনা করিতে করিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশাতে ক্ষীরোদপ্রসাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দেন নাট্যকাররূপে। কলেজে অধ্যাপনা কালেই তাঁহার ‘ফুলশয্যা’ ‘প্রমোদ-রঞ্জন’, ‘প্রেমাঞ্জলি’ ও ‘আলিবাবা’ সাধারণ-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ‘আলিবাবা’র অভিনয় শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়, দেশের মধ্যে একটা অভিনব আনন্দের অক্লান্তধারা বহাইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, এই ধারার ঢেউ কলেজেও পঁহুছিয়াছিল। এবং কোন কোন দিন প্রাতে, কলেজগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে, কলেজের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে ছাত্রবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে—“চিচিং ফাঁক”— চীৎকারে গগন-পবন, আর বিটপিশ্রেণী-বেষ্টিত ‘হেদুয়া’কে চঞ্চল-মুখর করিয়া তুলিত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলেজের কর্তৃপক্ষ ত দূরের কথা—অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। কলেজের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ মরিসনের সহিত এ বিষয়ে মনান্তরের ফলে, ভবিষ্যৎ লাভালাভের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়াই, ক্ষীরোদপ্রসাদ কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া, আর্থিক ক্ষতি স্বীকারপূর্ব্বক, নাট্য-সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। জীবিকার একমাত্র ও প্রধান উপায়কে ত্যাগ করিয়া, শিক্ষিত সাধারণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের জন্য আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির এই যে ত্যাগ স্বীকার—ইহা অনন্যসাধারণ। আজ নাট্য-রচনা কৃতীকে আর্থিক লাভের সন্ধান দিয়াছে,—কিন্তু তখনকার দিনে এ লাভের তেমন সম্ভাবনা ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদ কিন্তু অর্থ-সমস্যার দিকে একবারও চাহিয়া দেখেন নাই, কারণ এমন জনক জননীর অংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নিকট সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন এতটা স্বাভাবিক ছিল যে, আড়ম্বর-বিমুখতাকে তাঁহার একটা ত্যাগের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিতেন না।

ক্ষীরোদপ্রসাদের এই আত্ম-দান সফল হইয়াছে কি না, এখন তাহাই দেখা দরকার। যিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে যুগে প্রাচুর্ভূত হন, সেই যুগের বিশিষ্টভাব বা চিন্তাধারাকে গতানুগতিক ভাবে অনুসরণ না করিয়া, নিজ-সৃষ্ট সাহিত্য কিছু বৈশিষ্ট্য-ভাবে, ভাষায়, রসে ও পরিকল্পনায় পরিস্ফুটভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারই সাহিত্য সেবা সার্থক হয়,—দেশের জন-সাধারণের স্মৃতির-মন্দিরে তাঁহারই বন্দনা ঝঙ্কৃত হয়।

তাঁহার প্রথম নাটক 'ফুলশয্যা'র কবির দর্শকের কাছে তেমন আদর পায় নাই। তাঁহার রূপক-নাট্য 'প্রমোদ-রঞ্জনের' গীতাবলি অল্পকালের মধ্যে লোকের মুখে-মুখে গীত হইলেও,—"দে রামা,—একটা মানুষ দে"—এই অপরূপ ভিক্ষার কাতর আবেদনে জনসাধারণ নাট্যকারের মর্ম্মের সুর কতকটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল মাত্র।—কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া তাহাদের চক্ষে ধরা

পড়িল—তাঁহার প্রথম গীতি-নাট্য 'আলিবাবা'। ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়ার্থ যখন ইহা প্রস্তুত হয়, শুনিয়াছি তখন স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথও ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারেন নাই, কি অনন্ত সৌভাগ্য লইয়া 'আলিবাবা' জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু কোন্ বিশেষত্বের গুণে 'আলিবাবা' তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, সাময়িক ও পরবর্ত্তী গীতি-নাট্যসমূহ অপেক্ষা অধিকতর সাফল্যলাভ করিয়াছিল? কি বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বাঙ্গলার নাট্য-সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে চির-যৌবনলাভ করিয়াছে? শুধু নৃত্যগীতের চটুল চপলতা তাহাকে এ সৌভাগ্য দিয়াছে বলিলে বাঙ্গালীর রসবোধের নিন্দা করা হয়।—এ তত্ত্বের নির্ণয় করিতে গেলে আমরা এমন একটা জিনিষের সন্ধান পাই—যাহা ক্ষীরোদপ্রসাদের উত্তর জীবনের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির একটা অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। এ বিশেষত্ব তাঁহার Idealism বা আদর্শবাদ। তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই একটা আদর্শ-সৃষ্টির চেষ্টা,—আদর্শবাদের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নৃত্যশীলা, চঞ্চলা মরজিনাও দর্শকের নিকট হইতে শেষবিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বলে, "মরুভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো; ক্ষুধার্ত্তের জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, অন্নসত্রের ব্যবস্থা করবো; আর জলহীন দেশে দীঘি-সরোবর খনন করে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে সমস্তই ধর্ম্মের জন্য রেখে দেব।" তাঁর প্রত্যেক গীতিনাট্যের নৃত্যগীতের চপলতার মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিকে এমন নিপুণভাবে একটা আদর্শের পথে পরিচালিত করিয়াছেন যে, তাহা অতুলনীয়। আনন্দকে শিক্ষাময় এবং শিক্ষাকে আনন্দময় করিতে তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ।

আরও, শক্তি-মন্ত্রের উপাসক ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব—অপূর্ব্ব নায়িকা-সৃষ্টি। তিনি মুখে সর্ব্বদাই বলিতেন, "নারীকে কখনও হীনভাবে দেখাইতে নাই।" সাহিত্যের মধ্যেও তিনি সেই আদর্শ নারীত্বের সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। "রঘুবীরে"র মুখে তিনি বলিয়াছেন :—

"নারী তুমি বিধাতার চরম কল্পনা !
মানবের দেহ-সঙ্গে বাঁধিতে জীবন,
সূত্র দিয়ে পাঠায়েছে, বিধাতা তোমারে।"

তাঁহার শেষ নাটক "নর-নারায়ণে" স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"বিধাতা সহিতে পারে—
দানব-মানব-কৃত সর্ব্ব-উপদ্রব,
সহিতে পারে না শুধু, অনাথ-ক্রন্দন,
অনশনে জাতির মরণ,
আর পারে না সহিতে কোনমতে
কার্য্যে, বাক্যে, কল্পনায়, নারীর লাঞ্ছনা।"

কর্ণের মুখ দিয়াও তিনি তাঁহার জীবনের উপলব্ধ সত্যকে কি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"জানি আমি মহাবাক্য, ঈশ্বরী-প্রেরিত,
জগতে সমস্ত নারী আমি।"

তাই তাঁহার সৃষ্ট নায়িকা অনন্ত শক্তিস্বরূপিণী, অপূর্ব্ব তেজোমাধুর্য্যময়ী, এইখানে সাধক-ভাবুক কবির কৃতিত্ব যে কল্পনার কল্পলোক ও ভাবের ভুবন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন ভাস্বর থাকিবে। আদর্শকামী তিনি, ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই, তাই ঐতিহাসিক নাট্য-রচনাতেও পরি-কল্পিত চরিত্রের সাহায্যে বাঙ্গলার মর্ম্মনিহিতা শক্তির সন্ধান করিতে চাহিয়াছেন। সে শক্তির চিত্র 'প্রতাপাদিত্যে'—'বিজয়া', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে'—'মতিবিবি, 'নন্দকুমারে'—'রাধিকা'। উদ্দীপনাময়ী ভাষায় —জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি সে শক্তি-পূজার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের উষর ভূমিতে পরিকল্পনার ভাব-গঙ্গাকে তিনিই প্রথম ভগীরথরূপে আনিয়া ধন্য হইয়াছিলেন,—ঐতিহাসিক নাট্যরচনায় তিনি বাঙ্গলার নাট্যসাহিত্যে যুগ-প্রবর্ত্তক।

আদর্শস্রষ্টা তিনি, তাঁহার গানে দুঃখের অস্তিত্ব নাই,—নৈরাশ্যের অভিমান নাই। তাঁহার আশার তরীতে এখনও স্থান আছে, তাঁহার শক্তিপূজার

পুরোহিত শঙ্কর সাধনার বিফলতায় নিরুদ্যম না হইয়া বলিয়াছে, "এ জন্ম-জন্ম সাধনার বিষয়। এ জন্মে হ'ল না, আবার জন্মাব। আবার ফিরে আসব।"

এই উক্তির মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের সাধনান্তরের আর একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ তিনি, আদর্শ সৃষ্টির মোহে হিন্দুত্বের শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ হইতে কখনই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হন নাই। তাই তাঁহার ঐতিহাসিক ও কল্পনামূলক নাটকেও হিন্দুর মর্ম্ম-নিহিত ধর্ম্মের সেই সনাতন সুরটুকু আছে;—তাই তাঁহার পৌরাণিক নাটকেও হিন্দুর মর্ম্মকথা কহিতে কহিতে তিনি চিরবাঞ্ছিত আদর্শের সন্ধান দিয়াছেন।—তাই তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'উলুপী'তে যোগিজনকাম্য গোলোকে বালক ইলাবন্তকে পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার সাধনার পুরস্কার দিতে দিতে, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করিয়াছেন,—"কোথায় প্রলুব্ধ আছ, দেশের পাপ দূর করতে, ধর্ম্মের পথ প্রসারিত করতে, নারায়ণ-সহচর অর্জ্জুন-রূপী নরের মঙ্গলার্থী আর কে বালকরূপী মহাপুরুষ কোথায় আছ এস —মানবের চিরপূজ্য এই পুণ্যময় অমৃতময় স্থান গ্রহণ কর।"

সাধক, সেবক, ভক্তকবির নাট্য সাধনার শেষ যবনিকাপাত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, 'নর-নারায়ণে' তাঁহার শেষ বাণী :—

"একবার সম্মুখে দাঁড়াও, নর!
সম্মুখে দাঁড়াও, নারায়ণ!"

ভগবৎ-সান্নিধ্যকামী ভক্তকবির আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। তাঁর কাতরকণ্ঠের সকাতর আহ্বানে নারায়ণ আসেন নাই বটে,—কিন্তু তিনি কবিকে আপনার সান্নিধ্যে টানিয়া লইয়াছেন। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে কবি বলিয়াছিলেন, "'নর-নারায়ণ' লিখিয়াছি, এইবারে যদি সময় পাই 'নারায়ণে'র চরিত্র চিত্রিত করিব।" জীবনে তিনি সে সুযোগ পাইয়া ধন্য হন নাই সত্য, কিন্তু জীবনের পরপারে সেই অভয়লোকে পৌঁছিয়া, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে আপনার লীলা-কথা শুনিবার আকুল কামনায় নারায়ণ বুঝি তাঁহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইলেন।

শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

লঙ্কাকাণ্ড

লালমোহন ওরুফে লালুর বুদ্ধিটা ছিল খুব সূক্ষ্ম—আল্‌পিনের ডগার মত। গাঁয়ের লোক ভেবেছিল—ও বড় হয়ে একটা মস্ত কিছু—হয় জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্—না হয় অন্ততপক্ষে রাসবিহারী ঘোষ বা ডব্লিউ, সি, বাঁড়ুজ্যের মত একটা উকিল ব্যারিষ্টার হবে। লালু সবেতে ওস্তাদ, গাইতে বাজাতে, তাস পিট্‌তে, চুরুট ফুঁক্‌তে। আর লেখাপড়ায়?—সে তো ইস্কুলের পয়লা নম্বরের ছেলে—লোকে বোল্‌তো—ও born genius.

ম্যাট্রিক্ পরীক্ষার বেলায় মাষ্টাররা ঠিক করে রেখেছিলেন—লালু stand কোর্‌বে,—কিন্তু পাশকরার লিষ্টের ভেতর তার নাম থার্ড ডিভিসনের ভেতর অতি কষ্টে খুঁজে পাওয়া গেল। অবাক্ কাণ্ড! প্রকৃতির কি বিচিত্র খেলা! একটা কথা কানাকানি হতে লাগ্‌লো—পরীক্ষা দিতে যাবার আগে লালু চরস্ টেনে গিয়েছিল তাই খাতায় সব উল্‌টো পাল্‌টা জবাব দিয়ে এসেছে;—হবেও বা!!

লালুর বেজায় মন খারাপ। কল্‌কাতায় বেড়াতে এলো। এসে উঠ্‌লো তার এক কলেজী বন্ধুর মেসে। তখন ছেলে-মহলে শিশির ভাদুড়ীর নাম মুখে মুখে। কিবা ঢং, কিবা গলা, কিবা বল্‌বার কায়দা, কিবা হাত পা নাড়ার ভঙ্গি! আর্টের চরম! রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর। লালু চল্‌লো বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটার দেখ্‌তে। দেখে—অবাক হয়ে গেল। হাঁা, এ্যাক্টিং কর্‌তে হয় তো এমনি! মানুষের মত মানুষ বটে! ফের্‌বার মুখে বন্ধু জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "কি হে, কেমন দেখ্‌লে?" লালু গদগদ হয়ে বল্‌লে, "অদ্ভুত—অপূর্ব্ব!"

"আর দানীবাবু?"

"আরে ছ্যাঃ—যত সব সেকেলে।"

দু পাঁচ দিন থিয়েটার দেখে, 'ব্যাঙ্ক্রাপ্ট' গোছের অবস্থায় লালু গাঁয়ে ফিরে এলো। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগ্‌লো—'সীতা' প্লে কর্‌লে হয় না? দু পাঁচজন এয়ারকে চুপি চুপি বল্‌লে। তাদের খুব উৎসাহ,—"হাঁা ভাই, তুই লাগ্‌লে ঠিক হবে। আমরা তোর পিছনে আছি। আস্‌ছে পুজোর ছুটিতে—"

লালু হেসে বল্‌লে, "কিন্তু এখন গোলমাল করা হবে না।"

হরেন উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিলে, "খেপেচিস্‌, একেবারে surprise করে দিতে হবে।"

দু তিন সপ্তাহ 'রিহার্সাল' চল্‌লো—গাঁয়ের বাইরে, নদীর ওপারে। পুজোর ছুটির প্রথমেই লালু নিজেদের ভেতর কিছু চাঁদা তুলে কল্‌কাতা এলো—দরকারী সাজ কেনবার জন্যে।

* * *

বোসেদের বাড়ীতে দুর্গাপুজো। খুব ধুম ধাম। চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেচে—এবারে তাদের বাড়ীতে থিয়েটার। অধিকারী—স্বয়ং লালমোহন। মায়ের সামনে পাল টাঙ্গান হয়েচে। তার নীচে ষ্টেজ্‌। ডান দিকে সাজঘর বা Green room ; বাঁ দিকে মেয়েদের বস্‌বার জায়গা—চিক্‌ দেওয়া। আসরের চারদিকে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুল্‌চে। ছেলেরা বসবার জায়গা পাবে না বলে, বিকেল বেলা থেকে যে যার জায়গা দখল করে বসে আছে। লোকে লোকারণ্য : সকলের মুখেই এক কথা—"কখন আরম্ভ হবে ?"

সাজঘরে পোষাক পরিচ্ছদ বিশেষ কিছু নেই। দু চারটে ভাল কাপড়, কয়েকটা রঙীন্‌ সিল্কের চাদর ও মের্জ্জাই, আর দুচার জোড়া শ্যাণ্ডাল্‌। যতদূর বাস্তব চিত্র দেখাতে পারা যায়—লালুর উদ্দেশ্য তাই। মূল নাটকের কিছু অদল-বদল সে করে নিয়েচে—স্থান, সময় ও পাত্র-পাত্রীর উপযোগী।

যথা সময়ে ঘণ্টা বাজলো, 'ড্রপ্‌ সিন্‌' উঠ্‌লো। রামের রাজ্য অভিষেকের সংবাদে অযোধ্যা-নগরীর নরনারী আনন্দে মাতোয়ারা। পথের ধারে সরাবের দোকান। কতকগুলো ছোঁড়া মদ খেয়ে ঢলাঢলি কর্‌চে। প্রথম দৃশ্যেই থিয়েটার খুব জমে গেল। রামের বনবাসের সময় বুড়োরা কাঁদতে লাগ্‌লো। মুহুর্মুহু হরিধ্বনি উঠ্‌লো। কে একজন দূর থেকে উত্তেজিত হয়ে কৈকেয়ীকে অশ্রাব্য গালাগাল দিলে। তারপর বনবাস, সীতা চুরি, হনুমানের সখ্য—সব হুবহু। জয় লালমোহন! জয় লালমোহন! চারদিক থেকে লালুর জয়জয়কার!

হনুমান সীতার খোঁজে লঙ্কায় গিয়ে হাজির। অশোকবনে তাঁর দেখা পেয়ে কিচির মিচির করে খুব খানিকটা আনন্দ জানালে। সীতা বুঝলেন, তিনি দেবী ; কিন্তু শ্রোতারা কিছুই বুঝলে না। বানরের ভাষা মানুষে বুঝবে কি করে ?

তার পরদিন হনুমান রাবণের সভায় উপস্থিত। যাচ্ছেতাই করে তাকে গালাগাল দিলে। বুড়োরা বল্‌লে, "মেয়েরা সব রয়েচেন, লালু অতটা না কর্‌লেই পারতো। যাক্ ছেলেমানুষ, এতটা যে করে উঠেচে তাই খুব।"

রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা হনুমানকে পাকড়াও কর্‌লে। তার হাত পা বেঁধে, ল্যাজে খানিকটা কাপড় জড়িয়ে, ইস্পিরিট্ ঢেলে, আগুন ধরিয়ে দিলে। ষ্টেজের পাশে দু চারজন বালতিতে জল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি হটাৎ কিছুমিচু হয়—সামলে নেবে। সকলে সভয়ে বল্‌লে, "আগুন ধরালে কেন গো—পুড়ে যাবে যে!" একটি ছোকরা জবাব দিলে, "এসব realistic, সব ঠিক্ ঠিক্, আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

হনুমান ল্যাজে আগুন নিয়ে, খুব প্রচণ্ড হয়ে, রাক্ষসদের কিল চড়, লাথি আর কামড়াতে লাগলো। ষ্টেজের ওপর হুলুস্থুল। মেয়েরা অধৈর্য্য হয়ে, চিক তুলে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেন।

সহসা হনুমান উপ্ আপ্ করে ষ্টেজ্ থেকে দর্শকমণ্ডলীর মাঝে লাফিয়ে পড়্‌লো। তখন তার ল্যাজ দাউ দাউ করে জ্বল্‌চে। হৈ হৈ করে ভয়ে সব উঠে পড়্‌লো। কোন্ দিকে পালাবে তার ঠিক নেই। ঠাসাঠাসি—ধাক্কাধাকি। মেয়েরা কেঁদে উঠ্‌লেন। হনুমানের ল্যাজ থেকে পালের একদিকে অগুন ধরে গেল। জল—জল—জল। কোথায় জল ? সব দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখচে—আর হায় হায় কোর্‌চে। অগত্যা থিয়েটারের পোষাক পরেই লালুর এ্যাক্টার-এ্যাক্‌ট্রেস্‌রা ষ্টেজের ওপর বালতি বালতি জল ঢালতে লাগ্‌লো। কে একজন ইতর গোছের লোক বিষম উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে বল্‌লে—"ব্যাটারা আজ লঙ্কাকাণ্ড কর্‌লি— কাল কর্‌বি কি ?"

—ইতি রিয়ালিস্‌টিক্ আর্টের প্রথম অধ্যায়।

বজ্রকীট

বুদ্ধ-বাণী

(আনাতোল ফ্রাঁস)

ইউরোপ নির্ব্বাণবাদ গ্রহণ করবে, যদিও আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা বিশ্বাস করতে পারি না, তবুও একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এ ধর্ম্ম স্বাধীন হৃদয়কে বড় আকর্ষণ করে এবং অসাম্প্রদায়িক মনে মন্ত্রৌষধীর ন্যায় অদ্ভুত কার্য্যকরী হয়। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার—হেলেনী-প্রতিভা বিকাশের বহু পূর্ব্বে এর নৈতিক উৎস হিমালয়ের পাদমূল থেকে নিঃসৃত হয়ে জগৎকে পবিত্র, মধুর ও সতেজ করেচে। বল্‌তে গেলে, এই কপিলাবস্তুর ঋষি এই বুদ্ধ মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা এবং শান্তি-দাতা।

ইউরোপীরা যাকে ধর্ম্ম বলে, বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ঠিক সে ভাবে ধর্ম্ম বলা চলে না। এর মধ্যে স্বর্গ নরক, দেব দেবী বা ঠিক ঠিক বলতে গেলে কোনরূপ পূজা অর্চ্চা নেই। এ হচ্চে মানব-সমাজের অতি সুন্দর নীতি-মালা, বর্ত্তমান যুগের অতি সাহসিক দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে এর মত মেলে। আর সব চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার, এ ধর্ম্ম এক বিন্দুও রক্তপাত না করে, তিব্বত, ব্রহ্ম, নেপাল, কাম্বোডিয়া, আনাম চিন এবং জাপান জয় করেছিল। যদিও সিংহল ছাড়া ভারতীয় অন্য কোনও দ্বীপপুঞ্জে এ নিজের শাসন রক্ষা করতে পারেনি, তথাপি এখনও পৃথিবীর চল্লিশ কোটি অধিবাসী এর অনুসরণ করে। বিগত ষাট বর্ষ ধরে ইউরোপীরা চিন্তা-জগতে যে প্রভাব বিস্তার করেচে, সেটা চিন্তা করবার বিষয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ যখন অতি বড় শক্তিশালী জার্ম্মান দার্শনিকদের অন্তরে প্রেরণা দিচ্ছিল তখন সাধারণের নিকট এ একেবারে অজ্ঞাত ছিল। এখন আমরা সকলেই জানি যে, সোপেনহাওয়ারের ইচ্ছাবাদের (Theory of the Will) উৎপত্তি স্থল হল বৌদ্ধধর্ম্ম। এবং এই দুঃখবাদী দার্শনিক নিজের

সাদাসিদে ভাবে সাজান-গোজান শোয়ার ঘরে যে একটি সোনার বুদ্ধমূর্ত্তি রেখেছিলেন—এ কথা আর অস্বীকার কর্‌বার যো নেই।

তুলনামূলক নিরুক্ত (Philology) এবং ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়ে দিয়েচে। তা ছাড়া কয়েকটি থিয়সফিষ্ট শাক্য মুনির উপদেশ সম্বন্ধে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে অনেক বিষয় প্রচার করেচেন। এদিকে আবার সিংহলের হীনযানের মঠাধ্যক্ষ আধুনিক জড়বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করেচেন। এই শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ তাঁর হলদে পোষাক পরে পান চিবুতে চিবুতে হার্বার্ট স্পেনসার পড়ে থাকেন।

করুণা-প্রাণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজ্ঞানের প্রতি খুব সহানুভূতি আছে এবং সুমঙ্গল হৃদয়বান্‌, শুভেচ্ছাসম্পন্ন, জগতের ঐশ্বর্য্যে বীতরাগ প্রাচীন অরণ্যনিবাসী ঋষিদের সহিত ডারবিন ও লিটারকে একই আসন দিয়েচেন। সিংহলের হীনযান তিব্বতের মহাযান অপেক্ষা অনেক উদার। কিন্তু বিশেষ ভাবে পরীক্ষার পর এটাও আমরা বিশ্বাস করি যে, বৌদ্ধদের এই দুই সম্প্রদায়ে বহু কু-আচার ও সংস্কার প্রবেশ করেচে। কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়ে যদি আমরা বৌদ্ধধর্ম্মকে বিচার করি তা হলে দেখ্‌তে পাই এধর্ম্ম একটা জ্ঞান, প্রেম এবং করুণার সমষ্টি।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে একটা বিশ্বজনীন ভাব একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই নূতন শক্তি রাজধানীর পথের ধূলিকেও বসন্তের সূর্য্যালোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে ঐ দিন আমি মুসি গুইমটের (Musee Guimet) শান্তিময় গৃহে প্রবেশ করি। ধ্যানের নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ এসিয়ার দেবতাদের মধ্যে বসে রইলুম, কিন্তু তবুও বর্ত্তমান যুগের কর্ম্ম-প্রেরণা থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার অনুমতি পেলুম না—চিন্তা কর্‌তে লাগলুম বর্ত্তমান জীবনের নিষ্ঠুর প্রয়োজনীয়তা, পরিশ্রমের তৈরী করা আইন ও দুঃখ সম্বন্ধে। হঠাৎ এক প্রাচীন মূর্ত্তির সমানে এসে দাঁড়ালুম—যার বাণী এখনও চল্লিশ কোটিরও ওপর মানব-মনের মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্চে। আমি স্বীকার

করুচি, সেই দেব-বিগ্রহের সামনে সৎ-জীবনের গুপ্ত সত্য লাভ করুবার জন্য প্রার্থনার লোভ ত্যাগ করতে পারিনি, আজ যা জানবার জন্য রাজনীতি ও সাধারণে বৃথা চেষ্টা করুচে। মনে হল, পবিত্রতার পদ্মাসনে বসে করুণাময় চিরকিশোর যোগী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে সতর্ক উত্তর দিচ্চেন—করুণা এবং ত্যাগ। তাঁর সম্বন্ধে যে সব ইতিহাস বলা হয়েচে তা সত্যই হোক আর গল্পই হোক—কিন্তু বড় সুন্দর। তিনি বলেছিলেন, "জগতের দুঃখ দারিদ্র্য আমার চোখের অন্তরালে রাখ্‌বার জন্য, আমাকে প্রাচীর-বেষ্টিত সুন্দর প্রাসাদের মধ্যে মানুষ করা হয়। সেখানে ছিল সহস্র ফোয়ারার ঝির ঝির শব্দ; সবুজ ঘাসের ওপর ময়ুর তার পাখা বিস্তার করে নেচে বেড়াত—কিন্তু তবুও আমার মনে সর্ব্বদা কি একটা দুঃখের মেঘ এসে ছেয়ে ফেলত—কি একটা অব্যক্ত চিন্তায় আমি সর্ব্বদা যন্ত্রণা পেতুম। সুন্দরী তরুণীরা সুরভি-সিক্ত হয়ে আমার সামনে নৃত্য গীত করুত কিন্তু আমার মনে হত যেন আমি একটা শ্মশানে আবদ্ধ।

"তারপর আমি চারবার প্রাচীরের বাইরে গেলুম। প্রথম বার দেখলুম এক বৃদ্ধ; দেখবামাত্র আমার মনে হল ঐ বৃদ্ধের মত পঙ্গু হয়ে গেচি। তারপর দেখলুম একজন পীড়িত লোককে; দেখবামাত্র বোধ হল তার ব্যাধি যেন আমায় আক্রমণ করেচে। পরে দেখলুম একটা শব; দেখবামাত্র মনে হল আমি মৃত। তারপর এক সন্ন্যাসী; মনে হল সে অনন্ত শান্তির অধিকারী হয়েচে। আমিও তার মত ঐ শান্তি পাবার জন্য কৃতসংকল্প হলুম। একদিন রাত্রে, যখন সমস্ত পুরী নিদ্রিত, আমার ঘুমন্ত শিশু ও স্ত্রীর দিকে একবার শেষ চাওয়া চাইলুম, তারপর আমার সাদা ঘোড়ায় চড়ে বনে এলুম, উদ্দেশ্য—মানবের দুঃখ, দুঃখের অসংখ্য কারণ ও তার নিবৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করুব।

"এসময়ে দুজন মুনির সঙ্গে আমার দেখা হয়—একজন বল্লেন, শরীরকে তাপ দিলেই জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু বুঝলুম তাঁর জ্ঞান লাভ হয়নি। কারণ তাঁর কথা মত আমি এত উপোস করি যে গয়া

পাহাড়ের নিকট রাখালেরা আমায় দেখে বলেছিল, 'দেখ দেখ সাধুটি মাগুর মাছের মত কালো হয়ে গ্যাচে, একেবারে ঝলসে গ্যাচে।' আমার চোখ এত বসে গিয়েছিল, যেন একটা কুয়োর মধ্যে দুটো তারা জ্বলচে। এই কঠোরতার আগে এই হল যে, জ্ঞান লাভ না করেই আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এল। তাই নিরঞ্জন নদীর তীরে এসে আমায় এক পাত্র দুধ আর মধু খেতে হল। একজন তরুণী এই খাদ্য দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচালে। বল পেয়ে আমি বোধি বৃক্ষের তলায় বসে সারা রাত ধ্যান করলুম। উষার আলোক-সম্পাতে আমার জ্ঞান-পদ্মও ফুটে উঠল। আমি বুঝলুম, বাসনা থেকেই যত দুঃখের উৎপত্তি। এই বাসনাই জগতের সত্যকে লোক-চক্ষের অন্তরালে লুকিয়ে রাখে। যদি বাসনার নাশ হয় তা হলে জগতের সকল দুঃখেরই নাশ হয়। সেই দিন থেকে আমি বাসনা নাশের চেষ্টা করলুম এবং মানুষকে সে সম্বন্ধে উপদেশও দিতে লাগলুম। আমি শিক্ষা দিই—সাম্য ও সরলতা। জটা বা ঐশ্বর্য্যে ব্রাহ্মণ হয় না। যার সত্য ও সাধুতা আছে সেই ব্রাহ্মণ।

"আমি আরও বলি, গর্ব্ব ও দম্ভ ত্যাগ করে, দয়া অবলম্বন কর। মৃত্যুর প্রধান অস্ত্র রিপুসকলকে দমন কর। হাতী যেমন নলের কুঁড়ে ভেঙ্গে ফ্যালে, রিপুরা তেমনি দেহ-ঘর চুরমার করে দ্যায়। সমস্ত সমুদ্রের জলেও যেমন পিপাসা মেটে না, তেমনি পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। জ্ঞানই আত্মাকে শান্তি দেয়। গর্ব্ব, ঘৃণা এবং কপটতা ত্যাগ কর। যারা সহ্য করতে পারে না তাদের কাছে সহনশীল হও, যারা উগ্রস্বভাব তাদের কাছে নম্র হও এবং বদ্ধদের কাছে নিজেকে মুক্ত রাখ। এমন কাজ কর যা অপর সকলেও করতে পারে। কারও অনিষ্ট করো না।

"আজ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে, ধনী ও গরীব সকলকেই আমি এই শিক্ষা দিয়েচি। এখন আমি চির শান্তি উপভোগের জন্য মহানির্ব্বাণে প্রবেশ করতে চাই।"—যেন সেই তত্ত্বমুদ্রাধারী, হাস্য-মুখ, উন্মীলিত-পদ্মআঁখি, স্বর্ণ-প্রতিমা এই বলে নীরব হলেন।

হায়! যদি তিনি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে পরিচিত হতেন। মার্কো পোলো তাঁর সম্বন্ধে শুনে বলেছিলেন, তিনি দেবতা। সত্যই তিনি দেবতা ও ঋষি একই সঙ্গে। যারা তাঁর কথা শুনতে জানে তারাই তাঁর গম্ভীর উপদেশ শুনতে পায়। তাঁর কথার শক্তি হৃদয়ের গোপন আঘাত আরোগ্য করে, গোপন ব্যথার উপশম করে।

মুসি গুইমেট (Musee Guimet) ত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বে রটুনডার (Rotunda) সুন্দর পুস্তকাবলী দেখবার অবসর পেলুম। দু একখানা উল্টে দেখলুম,—হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস, হিন্দুসাহিত্যের ইতিহাস। * * * বৌদ্ধ প্রবাদের মধ্যে একটা সুন্দর গল্প পড়্‌লুম যা আপনাদের কাছে না বলে থাকতে পারচি না। গল্পটি যথাযথ ভাবে আমি বলতে পার্‌ব না; কারণ আমায় মনে করে বল্‌তে হবে। তবে গল্পটি যখন পড়েছিলুম তখন সেটি আমার হৃদয়কে পূর্ণ করে দিয়েছিল।

বাংলায় (?) মথুরা নগরীতে এক অপরূপ সুন্দরী গণিকা বাস কর্‌তো—নাম ছিল তার বাসবদত্তা। একদিন এক ধনী শ্রেষ্ঠীর (?) পুত্র উপগুপ্তকে দেখে তার মন প্রেমে মাতাল হয়ে উঠলো। দাসীকে দিয়ে সে বলে পাঠালে যদি উপগুপ্ত তার বাড়ী এসে দেখা করেন তাহলে সে ধন্য হবে। কিন্তু উপগুপ্ত এলেন না। তিনি ছিলেন ধার্ম্মিক—পবিত্রতা, দয়া এবং সহানুভূতি ছিল তাঁর ভূষণ। তেমনি পণ্ডিতও তিনি ছিলেন—বুদ্ধের বাণী তিনি প্রাণপণে মেনে চল্‌তেন। সেই জন্য তিনি সেই স্ত্রীলোকের ভালবাসা প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন।

কিছুদিন পরে এক ঘটনা ঘটল। বাসবদত্তা কোন দোষ করায় তাকে এক শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার হাত পা নাক কান কেটে সেখানেই ফেলে রাখা হল (?)। কিন্তু তবুও সে বেঁচে রইল। তার এক দাসী তাকে খুব ভালবাসত। সে ধীরে ধীরে বাতাস করে তার ঘায়ের ওপর থেকে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিল যেন একটু শান্তিতে সে মরতে পারে। যখন সে এই রকম সেবা কর্‌চে সে সময় দেখতে

পেলে একটি লোক ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে আস্‌চে। তার মুখে চাঞ্চল্য নেই বরং শান্ত ধীর। পোষাক তাঁর সাধারণ লোকের মত নয়। দাসী তাঁকে উপগুপ্ত বলে চিন্তে পেরে, নিজের আঁচল দিয়ে বাসবদত্তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিলে। উপগুপ্ত কাছে এসে ভাবতে লাগ্‌লেন, হায়! এই দেহই একদিন না নগরীর সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ মণি ছিল!

বাসবদত্তা চিন্তে পেরে বল্‌ল, "উপগুপ্ত! যখন আমার দেহ ছিল পদ্ম ফুলের মত, সূক্ষ্ম বসন ও স্বর্ণ ভূষণে ভূষিত ছিল, তখন তোমার জন্য আমি কত অপেক্ষা করেচি। যখন আমার কত বাসনা ছিল, তখন তুমি আসনি। উপগুপ্ত! তুমি এখন কেন এলে? এখন যে আমার শরীরে সৌন্দর্য্য নেই, রক্তাক্ত, ঘৃণ্য, বীভৎস!"

উপগুপ্ত মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভগ্নি বাসবদত্তা! যখন তুমি সুন্দর ছিলে তখন আমার ইন্দ্রিয় তোমাতে আকৃষ্ট হয়নি। আজ তোমার এই অবস্থা আমি ধ্যানে জানতে পেরেচি। আমি জানতুম, তোমার ঐ সুন্দর দেহ পাপের আধার। তোমার মনে হচ্চে, তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৌন্দর্য্য হারিয়েচ, কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জানেন তোমার কিছুই নষ্ট হয়নি। ভগ্নি! একথা তুমি সত্য বলে জেন। ভোগ বিলাসের সুখের ছায়া আজ চলে যাচ্চে বলে তুমি শোক করো না। তোমার এ দুঃস্বপ্ন কাটুক। জলের ওপর চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন অনিত্য, তেমনি এ সংসারের সুখ অনিত্য। অতিরিক্ত বাসনা থেকে তোমার এই দুঃখ উঠেচে। বাসনা ত্যাগ কর, দেবতাদেরও ওপরে স্থান পাবে। জীবনের আশা আর করো না। লোকে বাঁচে তার আশা আছে বলে। ভগ্নি! তোমার চাইতে আর কেউ বোঝেনি জীবনটা কত বড় দুঃখ। বাসবদত্তা! আমায় বিশ্বাস কর আমি তোমায় ভালবাসি। এখন শান্তিতে চির-বিশ্রাম কর।"

কথাগুলি শুনে বাসবদত্তার হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে উঠল এবং তাকে নির্ব্বাসনা করে দিলে। সে পবিত্র হয়ে এই প্রহেলিকার রাজ্য থেকে মুক্তি পেলে।

অনুবাদক—বাসুদেবানন্দ

ইউরোপে চার্চ্চিয়ানিটী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রতিক্রিয়া

অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মানুষ অত্যাচার, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহার সত্যানুসন্ধিৎসা দিকে দিকে প্রধাবিত হয়—পরবর্ত্তী যুগে চার্চ্চিয়ানিটীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। চার্চ্চিয়ানিটীর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ অনেক, তবে মূল কারণগুলি এই,—যাজকমণ্ডলীর বিলাস ও ব্যভিচার, প্রজামণ্ডলীর উপর অন্যায় অত্যাচার, ধর্ম্মের নামে জোচ্চুরি, অযৌক্তিক ধর্ম্মনীতির প্রচলন, চার্চ্চের স্বার্থরক্ষার্থে বহু ক্ষেত্রে সত্যকে অস্বীকার, মানবের স্বাধীন কার্য্য ও স্বাধীন চিন্তার উপর অযথা হস্তক্ষেপ। যখন এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল তখন ইউরোপে কয়েকজন শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাব হইল। জার্ম্মানদেশীয় জন্ রেচ্‌লিন্, আল্‌বিচ্, ভন হাটেন্, এবং ডেসিডেরাস্ এরাস্‌মাস্ এই প্রতিক্রিয়ার মূলে থাকিলেও প্রথিতনামা মার্টিন লুথারই ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মার্টিন লুথারের জন্ম হইয়াছিল ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর। কৃষককুলে জন্ম হইলেও বাল্যকাল হইতে তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া পিতামাতা তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া আইন পড়িবার জন্য তিনি কলেজে প্রবেশ করেন কিন্তু আইন-ব্যবসায়ী না হইয়া যুবক লুথার হইলেন সাধু। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সেণ্ট অগাষ্টীন্ সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া পাঁচ বৎসর খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে লুথার পরিব্রাজকরূপে রোমে আসিলেন এবং তথাকার

মঠসমূহে যাজকমণ্ডলীর অনাচার দর্শনে ব্যথিত হইয়া পুনরায় জার্ম্মানীতে ফিরিয়া গেলেন। এবার আসিয়া উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একটি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন, এবং আরো গভীর ভাবে খৃষ্টীয় এবং অন্যান্য ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ, চার্চ্চ, বেদী ও অনাবশ্যক কঠোরতার উপর মানুষের মুক্তি নির্ভর করে না—আন্তরিক ঈশ্বরানুরক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মার্টিন লুথারকে প্রথমে বেশী লোক চিনিত না, কিন্তু ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর—যে দিন তিনি 'Sale of Indulgences' বা স্বর্গের ছাড়পত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পঁচানব্বইটি যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উইটেনবার্গ-চার্চ্চের দ্বারদেশে আঁটিয়া দিলেন সেইদিন ধর্ম্মদ্রোহী লুথারের নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। বহুলোক তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া, যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া চার্চ্চিয়া নিটীর বিরুদ্ধে লড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে জার্ম্মাণীতে ধীরে ধীরে Protestant Churchএর (প্রোটেস্‌টেণ্ট চার্চ্চ) সৃষ্টি হইল।

'Sale of Indulgences'এর বিরুদ্ধে পঁচানব্বইটি প্রশ্ন করিলেও লুথার তখনও ক্যাথলিক চার্চ্চ পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। তিনি চার্চ্চের ভিতরে থাকিয়াই, উহার আভ্যন্তরিক সমস্ত ব্যাপার জানিবার জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; এবং দেখিলেন যে, 'Sale of Indulgences' ছাড়া আরও এমন সব কদর্য্য ব্যাপার আছে, যাহা জানিয়া শুনিয়া চার্চ্চের সহিত আর সম্পর্ক রাখা চলে না। বুঝিলেন যে, চার্চ্চিয়ানিটীর নাম দিয়া যাজকমণ্ডলী যে সমস্ত অযৌক্তিক অনাচার ও অত্যাচার সমাজের বুকের উপর বসিয়া করিতেছে, তাহার বিধি বাইবেলে নাই, উহা সমস্তই পোপের মনগড়া জিনিস; ধর্ম্ম কখনও ঐরূপ স্বার্থপূর্ণ কদর্য্য নিয়ম কানুন অনুমোদন করিতে পারে না। তখন বাইবেলের বচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়া, এবং চার্চ্চিয়ানিটীর অকল্যাণকর মনগড়া ধর্ম্মনীতি-সমূহের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়া, লুথার 'Babylonish Captivity' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। জার্ম্মাণীতে চার্চ্চিয়ানিটীর

বিরুদ্ধে এই সমস্ত যে আন্দোলন চলিতেছিল যাহাতে তাহা পরস্পরের মধ্যে মিটিয়া যায় তদানীন্তন পোপ (দশম) 'লিও' এতদিন সেই চেষ্টাই করিতেছিলেন, কিন্তু 'Babylonish Captivity' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তিনি লুথারের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। চটিবার কারণ এই যে, লুথার এই পুস্তকে পোপের একাধিপত্য এবং খামখেয়ালি ধর্ম্ম-শাসন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে সুদখোর বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মিটমাটের কথা এখন চাপা পড়িয়া, পোপ এবং লুথারের মধ্যে ভীষণ শত্রুতার সৃষ্টি হইল।

এই সময় পোপ, লুথারকে Heretic বা ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ধর্ম্মদ্রোহীকে পোড়াইয়া মারা হইত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু লুথারের বিরুদ্ধে এই আদেশ তখন কার্য্যে পরিণত হইল না। তাঁহার সাহসিকতা ও আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হইয়া জার্ম্মানীর বহু গুণী ও ধনীলোক তাঁহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে হত্যা করিলে দেশে একটা রাজবিদ্রোহের সৃষ্টি হইতে পারে এই মনে করিয়া তদানীন্তন যুবক রাজা (পঞ্চম) চার্লস্, ওয়ার্মস্ সহরে একটি সম্মেলন গঠন করিয়া তথায় লুথারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাকিয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্য—যাহাতে লুথার ভ্রম সংশোধন করিয়া তাঁহার নিজ মত পরিত্যাগ করেন। লুথারের বন্ধুবান্ধবগণ এই সম্মেলনে যোগ-দান করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে বলিয়া-ছিলেন, "I would go even if there were as many devils as there are tiles on the house-roofs."—'ছাতে যতগুলি টাইল আছে —সেখানে ততগুলি শয়তান থাকিলেও আমি যাইব।' ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল লুথার এই সম্মেলনে আসিয়া যোগদান করিলেন। সম্মেলনে স্বয়ং রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ, বিশপ এবং আর্চ্চ-বিশপগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলন হইতে তাঁহাকে আদেশ করা হইল, তিনি তাঁহার মতবাদ বর্জ্জন করুন। লুথার বলিলেন,—আমি আমার মত ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিয়া যুক্তি-তর্ক

সহায়ে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে যে, আমার মত ভুল। সম্মেলন তাহাতে রাজী হইল না, বলিল,—যুক্তি-তর্ক আবার কি? আমাদের আদেশ। লুথার বলিল,—অমন আদেশ আমি মানি না। আদেশ অমান্য করায় লুথারের জীবন বিপন্ন হইল। তাঁহার একটি বন্ধু—স্যাক্সনির রাজা ওয়ার্টবার্গ দুর্গে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

চার্লস্ (পঞ্চম) লুথারকে ধর্ম্মদ্রোহী ঘোষণা করিয়া ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তাঁহার প্রাণদণ্ডের এবং তাঁহার সমস্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলেন।

প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া চার্লস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। তিনি থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্ত-মানে লুথারকে শাস্তি দেওয়া সহজ হইল না। কারণ, জার্ম্মানীর বহু ছোট ছোট রাজা এবং তাঁহাদের প্রজাবর্গ তখন লুথারপন্থী হইয়াছেন। লুথারকে শাস্তি দিলে তখন রাজবিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। এদিকে চার্লস প্রায় দশবৎসর দেশে ফিরিতে পারিলেন না। এই দশ বৎসর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহাকে প্রায় বিদেশেই কাটাইতে হইয়াছিল। অবশেষে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হইয়া গেলে তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে পুনরায় মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন।

চার্লস অগস্‌বার্গ সহরে একটি ধর্ম্মসম্মেলন আহ্বান করিলেন। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্‌টেন্ট উভয় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গই এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু চার্লস ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দিকে পক্ষ-পাত করিয়া প্রোটেস্‌টেন্ট সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেককে শাস্তি দিবার জন্য আদেশ দিলেন। প্রোটেস্‌টেন্টগণও আত্মরক্ষা করিবার জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া চার্লসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ধর্ম্মবিদ্রোহ শেষে রাজবিদ্রোহে পরিণত হইতে চলিল। বুদ্ধিমান চার্লস ইহার কুফল বুঝিয়া আপোষে মিট্‌মাট্ করিয়া লইবার জন্য ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ট্রেন্ট সহরে পুনরায় একটি ধর্ম্মসম্মেলন আহ্বান করিলেন। কিন্তু প্রোটেস্‌টেন্টগণ এবারে আর ইহাতে যোগ দিলেন না।

রাজাদেশ অমান্য করায় চার্লস এবার সত্য সত্যই অস্ত্রধারণ করিলেন। জার্ম্মানীর রাজন্যবর্গ নিজ নিজ ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠার জন্য অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঠিক এই সময় অর্থাৎ ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে লুথার প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা, তাহার অধিকার-অনধিকার লইয়া এখন হইতে বহুদিনাবধি দেশে যে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যের বিষয় তাহা আর তাঁহাকে দেখিতে হইল না। জার্ম্মানীতে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্ম-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন প্রোটেসটেণ্টগণ রাজার নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা এবং অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্মকে আইন সম্মত বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং রাজন্যবর্গ এই স্বাধীনতা পাইলেন যে, তাঁহারা ইচ্ছামত ক্যাথলিক বা প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রজাসাধারণ ও যাজকগণ এই অধিকার তখনও পাইলেন না। তখনও এই নিয়ম ছিল যে, যে-রাজ্যের রাজা যে-ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত হইবেন সেই রাজ্যের প্রজাবর্গকেও সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে এবং আর্চ্চ-বিশপ ও যাজকগণ প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্মগ্রহণ করিলে ধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকার এবং সম্পত্তি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশেষে বহু বিপ্লবের পর প্রজাসাধারণ ও যাজকমণ্ডলী, রাজন্যবর্গের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীতে প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্মের আন্দোলন শুধু জার্ম্মাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; সমগ্র ইউরোপে উহা ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্ম নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। এইরূপে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী, স্পেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের বহু লোক প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রোটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বিশেষ কোন শক্তিশালী নেতা জন্ম গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং জার্ম্মাণীর প্রোটেস্‌টেণ্ট চার্চ্চকেই কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে জুইন্‌গ্‌লী, ইটালীতে ক্যাল্‌ভিন্‌ (ফ্রান্সের অধিবাসী) এবং

ফ্রান্সে কলিগ্নীর নেতৃত্বে যে প্রোটেস্টেণ্ট ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা লুথারের ধর্ম্মমত হইতে কিছু বিভিন্ন এবং জার্ম্মান-প্রোটেস্টেণ্ট-চার্চ্চের সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না।

প্রথমে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মের যে অধিকার মানবসাধারণ ক্যাথলিক বিশপগণের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া যে স্বেচ্ছাচার তাঁহারা করিয়াছিলেন, প্রোটেস্টেণ্ট ধর্ম্ম তাহারই মূর্ত্ত প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ বা প্রোটেষ্ট হইতেই প্রোটেস্টেণ্ট নামের উৎপত্তি। প্রোটেস্টেণ্ট ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-জগতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে-স্বাধীন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার পরিণতি কোথায় কি ভাবে হইয়াছে—ইহার আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করিবার ইচ্ছা রহিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)　　চন্দ্রেশ্বরানন্দ

কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে চা পান এবং সামান্য জলযোগের পর আমর বাল্ডার দিকে যাত্রা করি। এখান হইতে চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া যোগাড় করা হয়। তাকলাকোটে চড়িবার জন্য যে ঘোড়াটি ঠিক করা হয় মাল বেশী হওয়ায় তাহার উপর মাল চাপান হয়। সুতরাং চড়িবার একটি ঘোড়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধানন্দজী ঘোড়ায় চাপিলেন। আমরা সকলে হাঁটিয়া চলিলাম। ঝনং হইতে বাল্ডা ৬ মাইল। ১১টার সময় আমরা বাল্ডায় পৌছি। স্থানটি বেশ। কাছেই একটি ছোট নদী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিব্বতে জ্বালানি কাঠের বড় অসুবিধা। কারণ, গাছপালার অত্যন্ত অভাব এখানে। স্থানে স্থানে এক রকম ছোট ছোট কাঁটা গাছ আছে। তাহা দিয়াই রান্না হয়। কুলী কিছু

কাঁটা গাছ যোগাড় করিয়া আনিয়া দেয়। দোভাষী নন্দ রান্নার ব্যবস্থা করিতে থাকে। আমরা নদীতে বেশ ভাল করিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। রোদের বেশ তেজ ছিল বলিয়া তত শীত বোধ হয় নাই। শুকনা মূলার তরকারী, মোটা মোটা রুটি এবং চাটনী দিয়া ভর পেট খাওয়া গেল।

বান্ড়া হইতে তল্লী গরলা ৭ মাইল। ২॥০ টার সময় আমরা তল্লী গরলার দিকে যাত্রা করি। রাস্তায় চড়াই উতরাই বিশেষ নাই। তবে অত্যন্ত পাথর থাকায় চলিতে খুব অসুবিধা হয়। আমাদিগকে পাথরে পূর্ণ এক প্রকাণ্ড মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়। এই মাঠে বহু জলের ধারা আছে। চারিদিককার দৃশ্য চমৎকার। যে দিকে তাকান যায় সেই দিকেই বরফের পাহাড় ঝক ঝক করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে অথবা নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। সুতরাং এখানে কদাচিৎ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শুনিলাম এই মাঠে নাকি খুব দস্যু ভয় আছে। সন্ধ্যার সময় আমরা তল্লী গরলায় পৌঁছিলাম। এখানেই রাত্রিবাস করিতে হইবে ঠিক হয়। একটা ভাল স্থান দেখিয়া তাঁবু খাটান হইল। এই প্রথম উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাঁবুতে আমাদের বাস। ডানধারে গরলা মান্ধাতার বিরাট-কায়—যেন অতি কাছে। নিকটে জল না থাকায় আমাদিগকে মাইলখানেক দূর হইতে বরফ গলা জল যোগাড় করিয়া আনিতে হয়। রাত্রে গরম গরম খিচুড়ী এবং শুকনা শবজীর তরকারী খাওয়া গেল। বায়ুর অল্পতার জন্য রাত্রে যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাই ভাল ঘুম হয় নাই।

পরদিন সোমবার খুব সকালে আমরা তল্লী গরলা হইতে রক্ষতালের দিকে যাত্রা করি। তল্লী গরলা হইতে রক্ষতাল ৫ মাইল। প্রথম খানিকটা সামান্য চড়াই করিয়া পরে সমান রাস্তা পাওয়া যায়। পৌনে ৬টার সময় সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে আমরা রক্ষতাল এবং কৈলাসের প্রথম দর্শন পাই। প্রাতঃসূর্য্যের বিমল কিরণে চারিদিকের বরফের পাহাড় বিশেষতঃ কৈলাসের শুভ্র কিরীট এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া ছিল। এই সেই পরম পবিত্র কৈলাস যাহা দর্শন করিবার জন্য

দূর হইতে কৈলাস পর্ব্বতের দৃশ্য

যাত্রীরা এত কষ্ট করে। দেখিয়া আমাদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আর মনে হইতে লাগিল—কি দেখিলাম। জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। মনে কত ভাবের খেলা চলিতে লাগিল। কেহ ভক্তি গদগদচিত্তে কৈলাস-পতির উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ হইলেন। কেহ বা নীরবে কৈলাসের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইলেন। আবার কেহ হয়ত মনে করিলেন কৈলাসই মূর্ত্তিমান শিব।

'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর।
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর॥'

সেই অনিন্দ্য প্রভাতে দূর হইতে কৈলাস প্রথম দর্শন করিয়া বোধ হয়

সকলেরই মনে শিবের জলন্ত ত্যাগ এবং যোগের আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কৈলাসকে কখনও মন্দিরের চূড়ার মত, কখনও বা শিবলিঙ্গের মত, আবার কখনও ধ্যাননিরত যোগীর মত দেখায়। চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ৮॥টার সময় আমরা রক্ষতলে পৌঁছি।

রক্ষতাল একটি সুদৃশ্য বৃহৎ হ্রদ। তাহার চারিদিকে বরফের পাহাড। ইহার ঠিক আকার কি বলা কঠিন। নয় ইহা গোল, নয় চতুষ্কোণ, নয় ষট্‌কোণ। ইহার মধ্যে ২।১টি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে নাকি রাজহংস এবং অন্যান্য জলচর পাখীরা ডিম পাড়ে। সেখানে গেলে নাকি বহু ডিম কুড়াইয়া আনা যাইতে পারে। কৈলাসকে যেমন তিব্বতীরা 'ক্যাংবিস্পোচে' বলে বক্ষতালকে সেই রকম 'ল্যাংগেক সো' বলিয়া থাকে। রক্ষতালের আর একটি নাম রাবণ হ্রদ। লংকাধিপতি রাবণ নাকি এখানে বহুবৎসর কঠিন তপস্যা করিয়াছিলেন। রক্ষতালের তীর হইতে কৈলাস অতি চমৎকার দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ষতালের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০৫৬ ফিট। এই রক্ষতাল শীতকালে ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়া শক্ত হইয়া যায়। তাহার উপর দিয়া লোক অনায়াসে যাতাযাত করিতে পারে। রক্ষতালের জল কাচের মত নির্ম্মল। নির্ম্মল জলে মেঘশূন্য নীল আকাশের ছবি প্রতিফলিত হওয়ায় রক্ষতাল গাঢ় নীলবর্ণ দেখাইতেছিল। রক্ষতালের তীরে আমাদের দ্বিপ্রহরের রান্নার ব্যবস্থা হয়। গায়ের কাপড় খুলিয়া রক্ষতালে আমরা বেশ করিয়া অবগাহন-স্নান করি। রক্ষতালে আমার সাঁতার কাটিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলিয়া বেশীক্ষণ জলে থাকা সম্ভবপর হইল না। এদিকে রান্না প্রস্তুত। আমরা আহার করিতে বসিয়াছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী তিব্বতী আসিয়া উপস্থিত। তাহার গায়ে আলখাল্লা জাতীয় লম্বা কোট, পায়ে পশমী বুট, মাথায় টুপি এবং পিঠে ঐ দেশী বন্দুক। চেহারা দেখিয়াই মনে হইল যেন দুশমন। আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া গম্ভীর ভাবে সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তিব্বতী ভাষায় আমাদের কুলী এবং

দোভাষীর নিকট আমাদের পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। তারপর একখানা গরম চাপাটি চাহিয়া লইয়া খাইতে খাইতে আবার অশ্বারোহন করিয়া চলিয়া গেল। আমরা মনে মনে বলিলাম, "বাঁচা গেল। না জানি কি গোল বাধাইয়া বসিত!" এবার আমাদের চলিবার পালা। আয়ার রক্ষতালের তীরটি বড় পছন্দ করিয়াছিলেন। তিনি মজা করিয়া বলিলেন, "এখানে একটি আশ্রম করিলে বেশ হয়। কেমন পবিত্র স্থান! কোন রকম হট্টগোল নাই। কি নির্জ্জন, আর চারিদিকের শোভাই বা কেমন সুন্দর!" আমরা বলিলাম, "চমৎকার প্রস্তাব! কিন্তু এখানে ছ মাসেও লোকের মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তারপর শীতকালে আশ্রম বরফের নীচে প্রোথিত থাকিবে। পারিবেন এই অবস্থায় থাকিতে?" অবশ্য আয়ারের এই প্রস্তাব আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

ফিরিবার রাস্তায় রক্ষতালের তীরে আমাদিগকে একরাত্রি বাস করিতে হইয়াছিল। তখন এক মহাবিপত্তি ঘটিয়াছিল। তাহা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা কৈলাস-পরিক্রমা শেষ করিয়া বরখা হইতে আসিতেছিলাম। বরখার ময়দান পার হইয়া রক্ষতালের পূর্ব্ব তীর দিয়া আসিয়া যখন পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পৌঁছি তখন সন্ধ্যা হইয়া আসে। তাঁবু খাটাইয়া আমরা এখানেই রাত্রিবাস করিব স্থির করিলাম। অদূরে তিব্বতীদের কয়েকটা কাল তাঁবু, কুকুর, চমরী গরু ইত্যাদি দেখা যাইতেছিল। তিব্বতী ব্যবসাদার অথবা সাধারণ গৃহস্থের তাঁবু হইবে। অথবা, কে জানে, ডাকাতের দলের তাঁবুও হইতে পারে। যাক, আর উপায় নাই। এখানেই রাত্রিবাস করিতে হইবে। ঘোড়া তিনটিকে তাঁবুর কাছেই লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আমরা নিদ্রা গেলাম। সকালে উঠিয়া দেখি ঘোড়া একটিও নাই। মহা বিপদ! কি করিয়া তাকলাকোটে ফিরা যায়? এত মাল কুলীর পক্ষে বহিয়া নেওয়া অসম্ভব। হয়ত এখানে ৭ দিন বসিয়া থাকিলেও মালের জন্য ঘোড়া অথবা চমরীগরু পাওয়া যাইবে না। তারপর রসদও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ঘোড়া নাই দেখিয়া কুলীর ত

আত্মারাম শুকাইয়া গেল। সে পাগলের মত ঘোড়া তিনটা খুঁজিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আমরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। কোথায় খুব সকালে এখান হইতে তাকলাকোটের দিকে যাত্রা করিব, তাহার স্থলে ১১টা বাজিয়া গেল। এদিকে কুলীরও কোন ঠিকানা নাই। কুলীও কি আমাদিগকে এই দুর্গমস্থানে ফেলিয়া পলায়ন করিল? আমাদের দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে দূরে দেখা গেল কুলী ঘোড়া তিনটাকে লইয়া ফিরিতেছে। দেখিয়া আমাদের ধড়ে প্রাণ আসিল। যাক এই বিপদ অল্পতেই কাটিয়া গিয়াছিল।

চলুন, আমরা আবার পূর্ব্ব কথার অনুসরণ করি। অশ্বারোহী তিব্বতী চলিয়া গেলে আহারাদি শেষ করিয়া ১২৷৷• টার সময় আমরা মানস-সরোবরের দিকে যাত্রা করি। এখান হইতে মানস-সরোবর ১• মাইল। অবশ্য আমাদিগকে রক্ষতালের সমস্তটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। নচেৎ ঐ স্থান হইতে মানস-সরোবর ৪।৫ মাইলের বেশী হইবে না। রক্ষতালের তীরের রাস্তা আগাগোড়া পাথরের নুড়িময়। বাকী রাস্তা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া। মাঠ বালি এবং কাঁটা গাছে পূর্ণ। এই মাঠে আমার পকেট ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়। সূর্য্যের গতি এবং বেলা দেখিয়া আন্দাজে ঘড়ী ঠিক করিয়া দেই। খানিকটা পথ যাইয়া মানস-সরোবরের বিস্তৃত নীলজল দেখা গেল। মানস-সরোবরের কাছে মাঠে আমাদের সাড়া পাইয়া বহু বন্য খরগোস প্রাণভয়ে এদিক ওদিক পালাইতেছিল। এই মাঠে সুগন্ধ-যুক্ত বিস্তর একরকম ছোটগাছ রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই গাছের পাতা শুকাইয়া তিব্বতীরা চমৎকার ধূপকাটি প্রস্তুত করে। সন্ধ্যার প্রাকালে যখন আমরা সরোবরের তীরে পৌছি তখন অল্প অল্প হাওয়া এবং বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং বেশ ঠাণ্ডা বোধ পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সরোবরের তীরে পৌছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সেখানে পৌছিয়া একটা ভাল স্থান দেখিয়া তাঁবু খাটান হইল এবং রাত্রের রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। আক

মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া সরোবরের শোভা তখন আশানুরূপ খুলিতে পারে নাই দেখিয়া, আমরা প্রথম কতকটা নিরাশ হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল—বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা চিরদিনই অধিকতর সুন্দর এবং মহত্তর। সুতরাং কল্পনার সরোবরের নিকট বাস্তব সরোবর হার মানিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধীরে ধীরে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া আসিল আকাশও ক্ষণকালের জন্য পরিষ্কার হইল। চতুর্দ্দিকের বরফে পাহাড়গুলি দৃষ্টিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে সরোবরের চেহারা বদলাইয়া গেল।

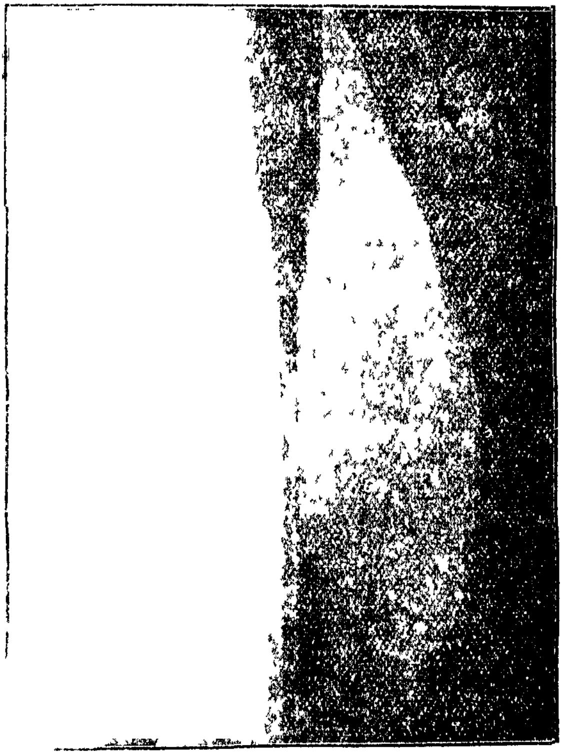

মানস-সরোবরের একদিকের দৃশ্য

এই সেই মানস-সরোবর দেবতার লীলাক্ষেত্র। মানবের তীর্থ। ইহার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনিয়াছি। ইহাকে

অবলম্বন করিয়া কত গল্প, রূপকথা এবং কবিতাই না রচিত হইয়াছে! ইহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্মরণাতীত যুগ হইতে কত ধর্ম্মপ্রাণ স্ত্রী পুরুষ কত দুঃখ কষ্টই না স্বীকার করিয়াছেন! কল্পনা-নেত্রে এখনও স্পষ্ট দেখিতেছি, যাত্রীর পর যাত্রী ইহার পূত জলে জন্মজন্মান্তরের মালিন্য ধৌত করিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইহার তীরে কত যোগী ঋষি মুনিগণ কত তপস্যাই না করিয়াছেন! কত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ, কত সনক সনন্দন সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন! সদা পরিবর্ত্তনশীল অপূর্ব্ব ইহার রূপ! আর এই রূপের পশ্চাতে অনন্ত ভাবের কি অফুরন্ত ভাণ্ডার! কখনও দেখা যায়, চতুর্দ্দিকের শুভ্র তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণীর এবং উপরের নীলাকাশের ছবি স্বীয় নিবাত নিষ্কম্প বক্ষে ধারণ করিয়া সরোবর আনন্দে হাসিতেছে। আবার কখনও দেখা যায় বাত্যা-তাড়িত বিক্ষুব্ধ সরোবরে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। ভাবুক, চক্ষে ভাবের অঞ্জন মাখিয়া মানস-সরোবর দর্শন করুন। কত রহস্য কত সত্য ইহার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

(সমাপ্ত) বিবিদিষানন্দ

মাধুকরী

ঋষি টলস্টয়ের একখানি চিঠি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(রমাঁ্যা রলাঁ)

মিলন যাহার সাহায্যে গড়ে তাহাই সুন্দর তাহাই বিশ্বমানবের কল্যাণকর। এই কল্যাণ যদি শিল্প ও বিজ্ঞানের পাণ্ডাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এটি তাঁহাদের ভোলা উচিত নয়, যে শিল্প ও যে বিজ্ঞানের সাধনায় ঐ কল্যাণ হয় শুধু তাহারই চর্চ্চা যদি পাণ্ডারা করেন তবেই স্বীকার করিব তাঁরা সত্যধর্ম্মী। কিন্তু তাহা হইলে ভেদমূলক আইন-

বিজ্ঞান, অর্থ-শোষক অর্থনীতি ও ধন-বিজ্ঞান ও মৃত্যুমূলক যুদ্ধ-বিজ্ঞান কোথায় দাঁড়ায়? ইহাদের যে একমাত্র উদ্দেশ্য একদল মানুষের উচ্ছেদ করিয়া অন্য একদলকে সাময়িক ভাবে বাড়ান। সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে ইহাদের ত কোন যোগই দেখি না, তবু কেন এই সব তথাকথিত বিজ্ঞান একটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে? আজকাল দেখি শিল্প ভোগে অসক্ত অগর্ব্বদের লালসার অবলম্বন অথবা হৃষ্টপুষ্ট নিষ্কর্ম্মাদের খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তবু এই শিল্প কেন এত লোককে টানিতেছে? এ শিল্পের দ্বারা কোন্ কল্যাণ সাধিত হইতেছে? কতকগুলা বিষয়ে খবরের সংখ্যা বাড়াইয়া গেলেই জ্ঞান মিলে না। জানিবার বস্তু এ জগতে অসংখ্য, অনেকের চেয়ে বেশী জানিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। কোন্ জিনিষ কতটা মানব-কল্যাণের সহায়ক তাহাদের গুরুত্ব ও ক্রমানুসারে নিজের জ্ঞানের মধ্যে গ্রহণ করা— ইহাই একমাত্র পন্থা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল অরণ্যে কোনটিকে বাছিব? যাহার সাহায্যে এমন জীবন গঠন করা যায় যাহাতে মানুষকে সব-চেয়ে কম দুঃখ ও সব-চেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারে তাহাই আমার কাছে সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান; এবং আমাদের তুচ্ছতম কাজেও যখন শিব সুন্দরের ছায়া পড়িবে, তখন সেই জীবনকেই সর্ব্বোচ্চ শিল্প বলিব। কিন্তু যে সব ভণ্ড শিল্প-বিজ্ঞান বিশ্বমানবকে ঠকাইয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে কল্যাণধর্ম্মী শিল্প-বিজ্ঞানের স্থান কোথায়?

আজকাল সমাজে শিল্প ও বিজ্ঞান বলিয়া যে সব জিনিষ চলে তাহার অধিকাংশই একটা বিরাট বুজরুকী মাত্র। এককালে ছিল ধর্ম্মের বুজরুকী, এখন তাহার স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে শিল্প বিজ্ঞানের বুজরুকী। চোখে ঠুলী দিয়া দিব্য আরামে আমরা আছি! কিন্তু মনে নাই যে, অনেক জিনিষই চোখে পড়িতেছে না। চোখের ওই ঠুলীটা দূর করিয়া ফেলিয়া একেবারে গোড়া হইতে নূতন চোখে সব জিনিষ দেখিতে হইবে। গন্তব্য পথের সন্ধান করিতে হইবে। কত প্রলোভন পথ ভুলাইতে চেষ্টা করে। হাত অথবা মাথা খাটাইয়া আমরা খাই, ক্রমশঃ সামাজিক মর্য্যাদার সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতেছি, ক্রমশঃ বনিয়াদীদের ধাপে

উঠিয়া সভ্যতার পাণ্ডা হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। জর্ম্মানদের মত কাল্চারের নামে প্রায় মূর্চ্ছা যাই আর কি। এত কষ্টে জাতে উঠিয়া এত বাম্নাই করিয়া হঠাৎ আগাগোড়া সবটাকে অবিশ্বাস করিতে হইলে অনেকখানি সরলতা ও সত্য-নিষ্ঠা থাকা দরকার। সত্য-কল্যাণের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা না থাকিলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'; যে কেহ প্রাণের মধ্যে সাড়া পাইয়াছে, জীবনের সমস্যা তোমার মত যাহাদিগকে আকুল করিয়াছে, তাহাদের সত্যের পথ না ধরিয়া গতি নাই। মোহের আবরণ যতই মধুর হউক সকল কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিত্তকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। যে মানুষ অন্ধভাবে তার গোঁড়ামিকে আঁকড়াইয়া থাকে তাহার কথা বলিয়া লাভ নাই। যুক্তির ক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক অনেক সুন্দর বক্তৃতা হইতে পারে কিন্তু সত্যের দিকে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। সমস্ত যুক্তি গোঁড়ামির খোঁটায় ধাক্কা খাইবে, সকল সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। গোঁড়ামি শুধু ধর্ম্মে নয়, তথাকথিত সভ্যতার রাজ্যেও আছে, দুই-ই মূলতঃ এক বস্তু। গোঁড়া ক্যাথলিক বলিবে, "আমরা কি যুক্তি মানি না? মানি বই কি, তবে যুক্তিকে শাস্ত্র ও আচারের উপরে যাইতে দিই না, কারণ তাহাদের মধ্যে পূর্ণ ধ্রুব সত্য রহিয়াছে।" সভ্যতার পাণ্ডা বলিবে, "আমার সমস্ত যুক্তি শিল্প ও বিজ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়া যায়। কারণ উহাদের মধ্যে আমি সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ দেখি। মানবের সমস্ত জ্ঞান আমাদের বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত; পূর্ণ সত্যকে এখনও বিজ্ঞান ধরিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে পারিবে এবং আমাদের শিল্পের উদার ভিত্তির উপর সত্য-শিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠা।" ক্যাথলিক বলিবে, "মানুষের বাহিরে একটি মাত্র বস্তু পূর্ণ ভাবে আছে সেটি হইতেছে সঙ্ঘ (Church)।" আর সংসারী বলিবে, "মানুষের বাহিরে আছে শুধু সভ্যতা।" ধর্ম্মে অন্ধ সংস্কার লইয়া আলোচনা করিতে যুক্তির দুর্ব্বলতাটা আমরা সহজেই ধরিতে পারি, কারণ সেই সংস্কার আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু যে করে তার কাছে একটি মাত্র ধর্ম্ম, একটি মাত্র

সত্য আছে সেটি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস করে। অথচ সেটা যুক্তির দ্বারা সে প্রতিপন্ন করিয়াছে বলিয়া তার ধারণা। সভ্যতা-সংস্কার লইয়াও আমাদের সেই একই অবস্থা আমরা বিশ্বাস করি যে, জগতে শুধু একটি মাত্র খাঁটি সভ্যতা আছে, সেটি আমাদের; অথচ নিজেদের অযৌক্তিকতাটা মোটেই আমরা দেখিতে পাই না। আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি সকল যুগ সকল জাতির মধ্যে আমাদের এই যুগ এই জাতিই সত্য-সভ্যতার অধিকারী। যে কয়েক কোটি লোক ইউরোপ খণ্ডে বাস করে তাহারাই সকল খাঁটি-বিজ্ঞান ও শিল্পের মালিক। জীবনে সত্যের প্রকাশ অতি সহজ; এই সত্যকে ধরিতে বিজ্ঞান-দর্শনের গভীর জ্ঞান না হইলেও চলে, কিন্তু একটি যায়গায় নাস্তিবাদী না হইলেই নয়—সমস্ত মূঢ় সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে "নেতি" বলিয়া উড়াইয়া দিয়া পূর্ণ মুক্ত চিত্তে দাঁড়াইতে হইবে। হয় শিশুর মত সরল হইতে হইবে অথবা দেকার্ত (Descartes) এর মত বলিতে হইবে, "আমি কিছু জানিনা, কিছু বিশ্বাসের বশে মানিয়া লই না; আমি অন্য কিছুই চাই না, শুধু বুঝিতে চাই এই যে, যে জীবন আমরা ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহার অর্থ কি, ইহার সত্য সার্থকতা কোথায়?"

এই প্রশ্নের সরল স্বচ্ছ ও পূর্ণ উত্তর মানুষ যুগের পর যুগ পাইয়াছে। আমার স্বার্থ আমাকে শিখায় যে, জগতের যত ধনসম্মান সৌভাগ্য আমার হউক। কিন্তু আমার জ্ঞান আমায় দেখাইয়া দেয় যে, ঐ ইচ্ছাটি শুধু আমার একলার নয় প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রাণীর। সুতরাং আমি একা সমস্তটা দখল করিতে গেলে ইহারাই আমায় পিষিয়া মারিবেই। যে সুখের জন্য আমি লালায়িত তাহা আমি একচেটিয়া করিতে পারি না। কিন্তু সুখের পিছনে ধাওয়াটাই ত জীবন। সুখ না পাওয়া, সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা মাত্র না করা—সে ত মৃত্যু।

যুক্তি বলে জগতের নিয়মে সকলেই নিজের নিজের সুখ চায় সুতরাং আমি একা সব সুখ কখনও পাইব না এবং পুরাপুরি বাঁচাও সেই জন্য আমার অদৃষ্টে নাই। কিন্তু এই নিখুঁত যুক্তিটা অটল থাকিলেও দেখি আমি দিব্য বাঁচিয়া আছি এবং সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

আমাদের বলিতে হয়—মানুষ নিজেকে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে আমাকে যদি ভালবাসে তবেই আমার সুখ সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু এটা যে অসম্ভব ব্যাপার। ইহা কখনও হয় না, তবুও আমরা ত পাশাপাশি আছি, আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আমাদের শক্তি সৌভাগ্য ও সম্মানের অন্বেষণ কিসের আভাস দেয়? আমরা ঐ সবের ভিতর দিয়া পরকে আপন করিতে চেষ্টা করিতেছি। নিজেকে মানুষ যতটা ভালবাসে তাহা অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাসাইতে প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু সকলেই দেখি আমা অপেক্ষা নিজেকে বেশী ভালবাসে সুতরাং সেই চরম তৃপ্তি আর ভাগ্যে ঘটিল না। কত মানুষ এমনি অনুভব করে—এ সমস্যার সমাধান করিতে পারে না—হতাশ হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া বলে—এ জীবন কিছুই না শুধু একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

কিন্তু তবু বলি ঐ সমস্যার সমাধান অতি সহজ এবং আপনা হইতে আমাদের কাছে দেখা দেয়, একটি মাত্র অবস্থায় আমরা সুখী হইতে পারি যখন পৃথিবীর জীব নিজেদের যত ভালবাসে তাহা অপেক্ষা অপরকে অনেক বেশী ভালবাসিবে। এইটি সত্য হইলে নিখিল বিশ্ব আনন্দময় হইয়া উঠিবে।

আমি মানুষ এবং আমার চৈতন্য আমাকে সর্ব্ব সাধারণের সুখের মর্ম্মগত নিয়মটি দেখাইয়া দিতেছে। সে নিয়ম আমাদের মানিতে হইবে। আপনাকে যতটা ভালবাসি তাহা অপেক্ষা অপরকে ভালবাসিতে হইবে।

এই ভাবে জীবনকে চালাইলে তাহার এমন একটি অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবে যাহা আমরা কখনও দেখি নাই। সৃষ্টির মধ্যে জীবে জীবে হিংসা দেখি—এক অন্যকে ধ্বংস করিতেছে দেখি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, জীবে জীবে প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে —এক অন্যকে সাহায্য করিতেছে। ধ্বংসের সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই, প্রাণের ধারা পুষ্ট হইতেছে প্রেমের আদান-প্রদানে। এই প্রেম বাহিরে জীবে জীবে মৈত্রী ও অন্তরে অনুপম মাধুর্য্যের রূপ ধরিয়া দেখা দেয়। বিশ্বমানবের ইতিহাস আমি যতটুকু বুঝিয়াছি—আমি দেখিয়াছি যে, মানব-সভ্যতা সম্মুখপানে চলিয়াছে একটি শক্তির প্রেরণায়—সেটি

পরস্পরের প্রতি প্রীতির টান ; এইখানেই জীবের ঐক্য-সিদ্ধির অটল ভিত্তি। এইটি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করা এবং এই অনুপম নিয়মটি জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ইহাই আমার কাছে ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপ-নির্দ্দেশ। মানুষ তার অন্তরের অনুভূতি ও বাহিরের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়া ঐ সত্যটিকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শুধু বোধের মধ্যে ধরা নয়—প্রাণের গভীরতম প্রেরণায় ঐ সত্যের অসন্দিগ্ধ প্রামাণ্য দেখা। মানুষের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি, বড় মুক্তি, বড় আনন্দ,—ত্যাগ ও প্রেম। এই অনন্ত পথটি দেখাইয়া দেয় প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের আবেগ মানুষকে সেইদিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যাহা তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যদি তাহা তোমার কাছে অস্পষ্ট বোধ হয় তাহার কঠোর সমালোচনা করিও না। আমার আশা আছে রমঁ্যা রলাঁ! একদিন তুমি এ জিনিষটা পরিষ্কার ও স্পষ্ট করিয়া ধরিবে। আমি এখন যে ভাবে দেখিতেছি তাহার একটু আভাস তোমায় দিলাম। ইতি— লিও টলষ্টয়

(প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৪)

বিচার

মস্ত পাহাড় সূর্য্য আলোয় উজল আকাশ পানে,
পাথরখানা রোদ পোয়াত স্বাধীন পুলক প্রাণে।
বুনো ছাগল লাফায় ছুটে,
পাথর খানা পাহাড় টুটে,
পড়্‌লো গিয়ে লাথির ঘায়ে গভীর খাদের মাঝে,
অন্ধকারের কুজ্ঝটিকা যথায় সদাই রাজে।
একলা নিরজনে
গভীর আঁধার আঁকড়ে তারে
ধর্‌চে ক্ষণে ক্ষণে।
ওগো জগৎ-সৃজনকারী দয়াল ভগবান্‌
ধরার বুকে আলোর পরশ কোর্‌চ সদা দান
খাদের বুকে অন্ধকারে
নীবিড় কর বারে বারে
বিচার কর তায়,
কি পাপে সেই পাথর খানা
সদাই ডুবে যায়।
ছাগল লাথি মারে, সূর্য্য কিরণ হরে
তিলে তিলে মরণ-পরশ তীব্র করি ধরে,
আজো প্রভু, আজো প্রভু, আজো প্রভু যে,
কেন ধরার বিচার-পতি বিচার-বিহিন সে?

অসিতানন্দ

একটি ইংরাজি কবিতা অবলম্বনে

সমালোচনা

গিরিশচন্দ্র—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য তিন টাকা; প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রদ্ধাভাজন গিরিশবাবুর বিস্তারিত জীবনী লিখিয়া অবিনাশবাবু বাংলা-সাহিত্যের একটি দীর্ঘ অনুভূত অভাব মোচন করিয়াছেন। গিরিশবাবু অবিনাশবাবুকে সর্ব্বদা কাছে রাখিতেন এবং তাঁহার দ্বারা সাহিত্য-সম্বন্ধীয় অনেক কাজ করাইয়া লইতেন, সুতরাং তল্লিখিত গিরিশবাবুর প্রাত্যহিক জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। জীবনীটি বৃহৎ,—পঞ্চাশটি 'বিচ্ছেদে' বিভক্ত হইয়া 'পরিশিষ্ট' সমেত ৬৭৮ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে; ৭৯টি চিত্র ইহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। কাগজ ও ছাপা ভাল। ভাষা প্রাঞ্জল। আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্যতে আর কিছু না লিখিলেও, শুধু এই জীবনীখানি লিখিয়াই বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।

বাংলার কথা—দৈনিক সংবাদপত্র, সম্পাদক—শ্রীসত্যচরণ বক্সী। 'ফরওয়ার্ড' অফিস হইতে প্রকাশিত এই নূতন দৈনিক সংবাদ-পত্রটিকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কাগজটি বড়; টাট্‌কা খবরে পরিপূর্ণ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সুলিখিত ও সুচিন্তিত। আশা করি, জাতি, ধর্ম্ম, দল ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ইহা সকলের কথাই বলিবে, বৃহতের কল্যাণ-কামনায় ক্ষুদ্র স্বার্থকে অস্বীকার করিবে এবং প্রয়োজন হইলে সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্যকে ধরিয়া থাকিবে।

সংঘ-বার্ত্তা

শ্রীমদাচার্য্য স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

বিগত ১৩ই পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে 'উদ্বোধন' কার্য্যালয়ে স্বামী সারদানন্দের জন্মতিথি-পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্রাধিক ভক্ত এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া এবং প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-কীর্ত্তন চলিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর কালী-কীর্ত্তন হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগজ্জননীর পূজা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পত্রপুষ্প ও মাল্যাদিতে ভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের এবং পূজ্যপাদ স্বামিজীর বাস-গৃহ অনুপম শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

স্বামী প্রভবানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ১০ই অক্টোবর (১৯২৭) St. Louis—Missouri (সেণ্ট লুই—মিসুরী) গমন করিয়াছিলেন। তথাকার টাউন ক্লাবে সর্ব্বসাধারণের জন্য তাঁহাকে চারিটি বক্তৃতা দিতে হয়। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চতুর্থ দিবসে টাউন ক্লাব লোকে লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। তারপর তিনি ছয়টি ধর্ম্মবিষয়ক ক্লাস করেন। ক্লাসগুলিতেও বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের জন্য বাইবেল সম্বন্ধে আরও দুইটি বক্তৃতা করিতে হয়। এই সমস্ত ক্লাস ও বক্তৃতায় সেণ্ট লুই সহরবাসী নরনারীগণ বেদান্তধর্ম্মে এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে, তথায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র খুলিবার জন্য স্বামী প্রভবানন্দকে তাঁহারা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁহাদের আগ্রহ তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেণ্ট লুই-এর এই নূতন কেন্দ্রটি যাহাতে স্থায়ী হইয়া আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় বেদান্ত-প্রচারের আর একটি শক্তিশালী ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়, স্বামী প্রভবানন্দ তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

বেশ লিখেছ দাদা, তুমি যে একটা জড়—তা জানতুম না। এমন সবুজ খেতের দোদুল আঁচল, বাতাসে তার বুকের কাঁপন, নিশীথ রাতে স্তব্ধতার অবগুণ্ঠন, পলাশ শিমূলের আগুন লাগা বন, এ সব প্রকৃতি-সুন্দরীর জীবন্ত ছবি দেখা তোমার মত অন্ধের কাজ নয়। Psycho-analystরা কি বলে জান?—"Art is wish-fulfilment in the region of phantasy"। কিন্তু কি করবো বল ভাই, আমাদের মস্তিষ্কটা অনেকটা "শ্রীকান্তে"র মত। সে ঠিক আমার মনের ভাবটা প্রকাশ করে বলেছে, "ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি—ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্ব্বতকে পাহাড় পর্ব্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া, জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না! আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যাথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক্ একগাছি চুলের সন্ধানও কোন দিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু, কাহারও মুখ-টুক ত কখনও নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান্ যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না! চলে শুধু সত্য সোজা কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।"

কথায়বলে, "স্বভাব না যায় মলে, ইজ্জত না যায় ধুলে"। শ্রীকান্ত

দাদা, এত বড় প্রতিজ্ঞেটা করেই পাতা কতক পরেই চাঁদের লুকোচুরি, ডোবা, ভাসা, হাসা এবং স্রোতের হুঙ্কার শুনতে পেলেন। তারপর দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা লাগিয়ে দিলেন,—"বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বলে যে, ওই বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি, সব ফাঁকি। আসল যা কিছু তা, এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হয়ে সে তখন তাই শুধু দেখে।"

একদল শিল্প-সাহিত্যিকরা বলছেন, প্রকৃতিকে দেখতে হবে রূপ-রসের মধ্য দিয়ে, নইলে যে, শিল্প-সাহিত্যের কোন দাম নেই, সেটা খাঁটি জড়সর্ব্বস্বতা। কিন্তু Materialistic শিল্পীরা বলছেন, আনন্দের জন্য সকলেই সব কাজ করে কিন্তু মিথ্যা রূপ-রস দিয়ে শিল্পের পৌত্তলিকতা আমরা নিয়ে আসতে পারব না। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সত্যগুলোর ওপর রূপ ও রসের কল্পনা করে করে এই হিন্দু Pantheon এর সৃষ্টি হয়েছে। এই পৌত্তলিকতাটা তোমরা ঘৃণা কর কিন্তু নিজেরা শিল্প সাহিত্যের রাজ্যে চাঁদের মুখ, দেহপল্লব সৃষ্টি করে সেই একই ভ্রমে পড়ছ। এটা হচ্ছে Idolatry in Art and Literature।

কেন হে বাপু, আমরা ত আর বুড়ো নই যে বসে বসে অলস চিন্তা করে দিন কাটব? আমাদের এমন "সবুজের ফোয়ারা ছুটেছে, আনন্দের বিপ্লব জেগেছে।" যখন বিপদ-টিপদ দেখা যাবে তখন "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।" বয়সের ওপর তার মনের যৌবন নির্ভর করে না। সেই বৃদ্ধ বাউলের গান শোনা আছে ত তোমার?—

"কপালে পড়েছে ত্রিবলির রেখা,
পলিত হয়েছে কেশ,
গলিত হয়েছে দন্ত,—তাতেও
দুঃখের নাহি লেশ।"

মন যখন যাকে যা দেখাবে তাকে তখন তা দেখতেই হবে, এ কথাটা ঠিক বটে। এই দেখনা কবি লিখলেন, "বাল্মীকি প্রতিভা"

ও "মায়ার খেলা", কত লোক তার অভিনয় দেখে তাতে রূপ ও রসের আনন্দ পেলে। আবার কতকগুলো সমালোচক বলছে, ও সব আদা দিশী আদা বিলিতি। কবি একেবারে মূরের (Moore) Irish melodies দ্বারা পাগল হয়ে গ্যাছেন। "বাল্মীকি প্রতিভা"র ভূমিকাটা টেনিসনের (Tennyson) Titaniaর নকল। বন-দেবীদের গান ও ভঙ্গি বিলিতি wood nymphsদের অনুকরণ। তারপর সেক্সপিয়ারের Midsummer Night's Dream ত আছেনই। মায়া-কুমারীরা হোল ইংরেজী elves। তা ছাড়া ওর মধ্যে ঢুকেছেন Hardy's chorus of Pities, Midsummer Night's Dream এর Oberon।

তা বলে তোমার কবিকে ছোট করা উচিত নয়, তিনি আমাদের National poet।—ছোটো করছি না দাদা! ভীষ্ম পরশুরামকে বলেছিল, তোমার ব্রাহ্মণত্বের দিকটাকে আমি নমস্কার করি, তোমার ক্ষাত্র শরীরের ওপরই আমার অস্ত্র গিয়ে পড়বে। তেমনি কবির হিঁদুয়ানার দিকটাকে আমরা নমস্কার করি কিন্তু ঐ পশ্চিমের দিকটা-কেই আমরা পরিষ্কার করে দিতে চাই।

মনের দোলায় চড়ে সকলকেই বেড়াতে হয়। সব জিনিষেরই দুটো দিক আছে। এই দেখনা কবি একজনকে বল্লেন,—

I have introduced some new element in our music, I know. I have composed five hundred new tunes, perhaps more. This is a parallel growth to my poetry. Anyhow, I love this aspect of my activity. I get lost in my songs, and then I think that these are my best work; I get quite intoxicated. I often feel that, if all my poetry is forgotten, my songs will live with my countrymen, and have a permanent place. I have very deep delight in them.

আবার তার পরেই বল্লেন,—

It is nonsense to say that music is a universal language. I should like my music to find acceptance,

but I know this cannot be, at least not till the West has had time to study and learn to appreciate our music till the same, I know the artistic value of my songs. They have great beauty. Though they will not be known outside my province, and much of my work will gradually be lost, I leave them as a legacy. My own countrymen do not understand.

কি জান ভাই, সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। ছেলে বেলায় যখন মৃদ্‌পাত্রের কাংসপাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখান করার গল্পটা পড়ি ও "হিতোপদেশে"র "যৎ যেন যুজ্যতে লোকে"র গল্প গুলি তখনও সেটা তত বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু যেদিন শ্রীকান্তর কাছে শুনলুম, "কখনও কোনও কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে দেখিতে বন্ধু প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্ব পাশ দাসত্বের বেড়ী হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে।"

আমাদের সাহিত্য-রাজ্যেও হয়েছে তাই। পূবেরা পশ্চিমেদের সঙ্গে মিতালী করতে গিয়ে দাসত্বের বেড়ীতে আটকে গ্যাছে। এখন এমন অবস্থা যে, বন্ধুকে খুসী করতে গিয়ে নিজস্ব সব বাজি রেখে বসেছে। ঠাকুর এই জন্যেই বলেছেন "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

কিন্তু যার ওপর মা সরস্বতীর কৃপা পড়েছে তিনি তাকে ঠিক ঝেড়ে মুছে নেবেনই। উনিশ বছরের মধ্যেই তার মধুর রসে তিক্ত রস ঢেলে দেন। দেখ, যার কবি হওয়ার কথা তার কি ব্যারিষ্টারী পড়া চলে। প্রকৃতির চিত্র যে আঁকবে তাকে তিনি অন্য পথে যেতে দেবেন কেন?

বাস্তবটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে কল্পনাটাকে খাঁটি সত্য বলে নেওয়াটা যে কিছু নয়, ডাঃ শীল ধরেছিলেন ঠিক। ঐ Subjective Egoism সম্বন্ধে তিনি খুব "Criticism" লিখে গ্যাছেন,—

Winged fancies, floating shapes and flying phantoms that haunt the wilderness of a poet's heart, fill the air, as it were, with a strange hiss as of rustling wings. The deadly and desparate struggle to which all subjective egoism is doomed.

ঐ রকম কল্পনা মানুষকে কিছুই দিতে পারে না কেবল,—নিরালা, অশ্রু, তারা, কুমারী, প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলো পুরাণো নিত্য-নৈমিত্তিক কথা ছাড়া।

যৌনতত্ত্ব নিয়ে সেকালে একালে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সকল দেশের অধিকাংশকেই স্বীকার করতে হয়েছে যে, সংযমেই সুখ ও শান্তি, যে ব্যক্তি বা জাতি যত সংযমিত সে বা তারা তত বড়। এর বিরোধী মত ওঠে কখন, না যখন সমাজে, একটা নর তার মনের মতন অপরের নারীকে পেতে বাধা পায় বা আলস্য ও বুদ্ধির জড়তা হেতু আমরা দারিদ্র্য ভোগ করি, দেবতার নিকট যখন এক পয়সার গুড়ে চিনি মানত করে রাজৈশ্বর্য্য কিনতে গিয়ে বিফল মনোরথ হই, মেয়ের বিয়ের টাকা যোগাড় করতে যখন আমরা না-পারি—তখনিই আমরা বলি, 'হে বলশেভিক! এস আমাদের দেশ উদ্ধার করে দিয়ে যাও।'—তখনই সমাজ-শাসনে পড়ে মস্ত গোলমাল।

ঠাকুর সাহেব একবার নাকি শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ওরা নাকি Celibacy preach (ব্রহ্মচর্য্য প্রচার) করে? আমাকে * * বললে —আমি সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যাচ্চি। প্রথম এক রকম ঠিক করেছিলাম, তারপর তাদের মনের গতি দেখে ব্যবস্থাটা একটু বদলে দিলাম। এটা খুব wise (বিজ্ঞজনোচিত) ব্যবস্থা বটে, কিন্তু বিবাহ দিয়া Celibacyতে (ব্রহ্মচর্য্যে) থাকা preach (প্রচার) করাটা আমি মস্ত ভুল মনে করি। সাধারণ জীবনের মধ্যে spiritual (আধ্যাত্মিক) করে তোলবার শিক্ষা দাও ভাল; কিন্তু physical (দেহ) বাদ দিয়া spiritualটা (আধ্যাত্মিকতা) হতেই পারে না, এটা annihilation (ধ্বংস), এটা সৃষ্টি নয়। জগতের ব্যবস্থাটাকে অমান্য করে যাওয়া এটা একটা অধর্ম্ম আমি মনে করি।" এ কথা আষাড়ে "বসুমতী"র কাছে শোনা গ্যাছে। বোধ হয়, তিনি তাঁর গুরু ও গুরু-পত্নীর পাদপদ্মে বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্যই এই সব মত ছাপেন।

সে যাহোক, কিন্তু তার পরের মাসেই "বিচিত্রা" দৌড়ে এসে

খপর দিলে ঠাকুর সাহেবের মত বদলে গ্যাছে, আর তাকে আপনারা দুষতে পারবেন না। তিনি বল্‌ছেন,—"জীব-ধর্ম্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রবৃত্তিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মানুষের স্বার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। * * যৌন মিলনের যে চরম স্বার্থকতা মানুষের কাছে, তা 'প্রজনার্থ' নয়, কেন না সেখানে সে পশু, সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। * * উপরে যে পশু শব্দটির ব্যবহার করেছি ও নৈতিক ভাল মন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষা ঘটিত পশু-ধর্ম্ম মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু সে হল বিজ্ঞানের কথা—মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু রস বোধ নিয়ে যে-সাহিত্য ও কথা সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।" জিজ্ঞাসা করলুম, এ কথার পর নারী-কেশীরা কি করলে? হুতাস, পেলব, অশ্রু, বিমান, বিগলিত প্রভৃতি রথীন্দ্ররা সবজীবাগের রঙ্গমঞ্চে তুললে বীরত্ব রসের ঝাপটা, ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি, ripple। আর হবু, বটুক, বেতাল, বিটকেল প্রভৃতি দর্শকেরা বল্‌লে, Bravo! Hear!! Hear!!!

দেখ্‌, তোর এ দোষটা যাবে না। কোনও গম্ভীরাত্মক ব্যাপার নিয়ে তুই যে ফাজলুমি জুড়ে দিস এটা সব সময় ভাল লাগে না। সব জিনিষেরই একটা সময় আছে আর বয়সও আছে। তোদের কি সাধে লোকে ঠাট্টা করে বলে,—

নয়নে যদিও ঝাপ্‌সা নেহারি তবু বরে বিধাতার
দাড়ি দুলাইয়া ফুলাইয়া ছাতি "চঞ্চল হয়ে" ফিরি।

* * *

সহরে এত ভিড়, এত উত্তেজনা দেখেও বুঝতে পারছিস্‌ না জিনিষটার কত public appreciation। আরে ভাই, ভিড়টাই যদি সত্যের লক্ষণ হয় তাহলে কি আর "গো-রস" গলি গলি ঘুরে বেড়ায়, আর "হাঁড়িয়া"র দোকানে এত ঠেলা ঠেলি বাধে। এই ধরনা বিশ্বেবিনোদ

মশায় "কিন্নরী"ও লিখলেন, "নর-নারায়ণ"ও লিখলেন। কিন্নরীর কত বাহবা, কিন্তু "নর-নারায়ণ" হাটে বিকল না, এর কারণ কি বল দেখি? আমাদের গো-বুদ্ধি দিয়ে দেখলে দেখতে পাই, popular বলে যে জিনিষটা সেটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে কখন, যখন কেউ, শিল্প সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি বা ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে মনের পশুটার খোরাক যোগাতে পারে। ভাল মন্দ জিনিষটা বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকে না। ভেতর থেকেই ওঠে, বাইরের জিনিষগুলো ভেতরে ঢুকে কেবল সেগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, আর নয় ত যে ভাবগুলো বাইরের ভয়ে মাথা তুলতে পারছিল না, সেগুলো অনুকূল অবস্থা পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তখন আমরা বলি, বেশ বলেছে, বলিহারি!—তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। মানুষ যখন পশু, তখন তাকে আর পশুর কলাবিদ্যা শেখাবার জন্য বই লিখতে হয় না। লেখবার কৌশল জানলে, "বাৎসায়ন সূত্র" না পড়েই, একটা ইতর অমন অনেক বই লিখতে পারে —অসুরকে কি আর আসুর সম্পদ শেখাতে হয়?

কিন্তু যখন দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলো মানুষ জগৎ শাসন করছে, আর কতকগুলো কুকুর শেয়ালের মত বেঁচে আছে। কতক বলছে—আমরা দেবতার সমকক্ষ হব, আর কতক বলছে—কামভোগই হচ্ছে চরম সুখ—এর হেতুটা কি? সমস্ত প্রাণী ও প্রকৃতির ওপর কতক-গুলো জীব কেন শাসন বিস্তার করছে?—তারাই বাঁচছে কেন আর সব মরে হেজে যাচ্ছে কেন?—বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে জীব যত বুদ্ধিমান সে তত শক্তিশালী। যে জাত যত শক্তিশালী তারা জানে, বুদ্ধির গোপন উৎস হচ্ছে সংযমে। কিন্তু মালেক্! রোম্যানরা এত বুদ্ধিশালী শক্তিশালী ছিল কিন্তু তাদের মত ব্যাভিচারীই বা কোথায়।—তাদের ব্যাভিচারটা যে দেখাচ্ছ সেটা তাদের পতনের সময়কারের। তাদের ওঠবার দিকটার সংযম একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু তারা যখন পড়ে তখন লড়াই বাধল রোমান বা বারবেরিয়ানে নয়, হিদেন বা খৃষ্টানে। খৃষ্টানের সংযম শক্তি বেশী বলেই তারা রোমান সম্রাজ্যের ধ্বংস করলে। ঋষির বংশধর বল্লে কি হবে—মুসলমানের ত্যাগ

তপস্যা বেশী ছিল বলেই হিন্দুকে তারা শাসন করলে।—ইংরেজও সেই কারণেই বড়।

তবে বলতে পার, পারমার্থিকের দিক থেকে আসুর ও দৈবী সম্পদ উভয়ই ব্যবহারিক—কাজেকাজেই মিথ্যে, ওনিয়ে অত চেঁচামেচি করে কি হবে? কিন্তু বিজ্ঞানের হিসাবে কয়লা ও হীরা একই জিনিষ হলেও কোনও বৈজ্ঞানিককে কয়লার দামে কেউ হীরা দেবে না। Convention এর রাজত্বে যতদিন বাস করবে, ততদিন বেশ ভদ্রলোকের মত বাস করে চলাই ভাল। তবে Convention যখন সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতি রুদ্ধ করে দেবার মত হবে, তখন মানুষ ঠিক বুঝতে পেরে, আপনি তা ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু এমন কতকগুলো Convention আছে যেগুলো মানুষ এখন ভেঙ্গে দেবার কল্পনাও করতে পারে না। যদি কখনও জগৎটা একটা Eden Garden এ পরিণত হয়, তখন হয়ত নরনারী অপাপবিদ্ধ হৃদয়ে নগ্ন ভাবে বিচরণ করবে—কিন্তু বর্তমানে যখন তার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না তখন ছিঁড়ে খাঁ করবার দরকার কি? পরন্তু দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীপুরুষ অবাধে বিচরণ করতে গেলেই যখন একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে বা হিন্দু-মুসলমান 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' বললেও যখন দাঙ্গা বাধছে, তখন একটা বন্দোবস্ত মেনে তফাৎ থাকাই ভাল নয় কি?

একটা জাতের যখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় তখন তার মধ্যে ফুটে ওঠে—বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা কথা, কুৎসা রটান, জাল, জুয়াচুরি, ইহকাল-ভোগ-সর্ব্বস্বতা, অতিরিক্ত কৌতুক হাস্যরস ও কামুকতা। তখন বেকুব-পণ্ডিতেরা বলেন, এত বড় জাতেরা যখন morality ফরালিটি 'কেয়ার' করেন না তখন আমরা ওসব 'কেয়ার' করতে যাব কেন? আরে বাপ্! গরু খেলেই যদি ইংরেজ হওয়া যেত তাহলে ডোম বাউরিরাও ইংরেজ হয়ে যেত। এই ধর, আধুনিক বাংলার ভদ্র ও অভদ্র দুই শ্রেণীর মধ্যেই কেউ কেউ গরু খায়—কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটাও তজাঁদরেল রকমের লোক বেরুল না—যারা সংযমীদের পায়ের ধূলো দেবার জন্য পা বাড়িয়ে দিতে পারে। বই লিখে লেকচার দিয়ে, হুজুক করে বড় লোক হওয়া যায় দুচার দিনের জন্য, কিন্তু যাঁকে ভালবাসলে, যার আশ্রয় নিলে এ জীবনে কখনও বিবেকতঃ অনুশোচনা করতে হয় না, এবং ভবিষ্যতে মানুষ যাঁকে appreciate করতে বাধ্য হবেই তাঁকেই বলি আমরা মহাপুরুষ। তাই বলি ভায়া সাবধান!

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

—রোমাঁ রোলাঁ—

সুইজারল্যাণ্ড ২৫-১০-২৭

ঠিক পাঁচ বৎসর বাদে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ। তাঁর চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌লাম না, কেবল তাঁর স্বভাবতঃ পাণ্ডুর আনন যেন একটু বেশী পাণ্ডুর মনে হোল। কিন্তু সেই সৌম্য হাসি ও উদ্ভাসিত স্বাগত সম্ভাষণ।

রোলাঁর হ্রদতটবর্ত্তী ছোট কুটীরখানি হেমন্তের শুভ্র আলোয় ঝলমল করছিল।

আমরা একত্রে মধ্যাহ্ন-ভোজনে বস্‌লাম; রোলাঁ, তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা, তাঁর ভগিনী মাদেলিন রোলাঁ ও আমি।

কথায় কথায় রোলাঁকে বল্‌লাম, "যদি আপনি আমাদের দেশে একবার আসতেন ত বেশ হোত।"

রোলাঁ ফরাসীসুলভ shrug-এর সহিত বল্‌লেন, "জানি না সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হবে কি না।"

"কেন?"

"সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়।"

"আপাততঃ কি কাজে ব্যস্ত আছেন?"

রোলাঁ হেসে বল্‌লেন, "কাজ কি একটা—দিলীপ?—কাজ অনেক; আমি সচরাচর একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ কোরে থাকি।......মস্ত বই লেখবার যোগাড়-যন্ত্র করছি তোমাদের দেশের সম্বন্ধে, যার জন্যে উপাদান সংগ্রহ করতে বড় কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। প্রায় বিশ খণ্ড ইংরাজী বই এসে হাজির হয়েছে যা আবার মাদেলিনের সাহায্য নিতে হবে, যেহেতু আমি ইংরাজী জানি না।"

আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বল্‌লাম, "আমাদের দেশের সম্বন্ধে? আবার কি লিখ্‌ছেন?"

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।"

উৎসাহিত হয়ে বল্লাম, "এ ইচ্ছে আবার কবে হল আপনার?"

মাদেলিন রোলাঁ বল্লেন, "ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একটি বইয়ে প্রথম এ সম্বন্ধে কিছু পড়ে আমি রোমাঁকে অনুবাদ কোরে শোনাই। সেই থেকে ও ভারি উৎসাহিত হয়ে ওঠে—রামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে—বেশি জানবার জন্যে।"

রোলাঁ বল্লেন, "হাঁ। কারণ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ে রামকৃষ্ণের প্রশংসায় য়ুরোপ ও আমেরিকার একদল লোক মহা রাগ করে; আমি সে সবের প্রতিবাদ স্বরূপ একটা বই লিখ্‌তে মনস্থ করেছি।"

"য়ুরোপ এখন এশিয়ার প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ মনে হয়।"

"অত্যন্ত। য়ুরোপে আবার সেই পুরোনো সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ও তার ফলে নির্ব্বিচারে এশিয়ার সব মহামানুষকেই এখানে লোকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছে। ফলে য়ুরোপ এশিয়ার সম্বন্ধে ক্রমেই কম খবর রাখ্‌ছে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই বটে, কিন্তু বিদ্বান্ মনস্বীদের ক্ষেত্রে এটা শুধু বিস্ময়ের নয়, আক্ষেপেরও কথা বলে আমি মনে করি। একটা উদাহরণ দেই। সেদিন সোপেনহর সোসাইটির এক ধুরন্ধর পাণ্ডা আমাকে মহা আশ্চর্য্য কোরে দিয়েছিলেন যখন তিনি আমার একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত বিবেকানন্দের দু চারটি অনুপম তেজঃপূর্ণ কথা পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'এ প্রতিভাবান্ হিন্দুটি কে'?"

"এতে আশ্চর্য্য হবার এমনি কি আছে মসিয়ে রোলাঁ?—বিবেকানন্দকে স্মরণ কোরে রাখা কি বর্ত্তমান য়ুরোপের প্রবণতার অনুকূল? বিশেষতঃ যখন য়ুরোপে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে বোলে আপনি এইমাত্র আক্ষেপ করছিলেন?"

রোলাঁ বল্লেন, "কিন্তু তাই বোলে এত বড় মানুষটাকে এত সহজে ভুলতে চাওয়ার মানে কি এই নয় যে, বর্ত্তমান য়ুরোপ অতীত য়ুরোপের একটা মস্ত গৌরবের উত্তরাধিকার হেলায় হারাতেই ব্যগ্র হয়ে উঠেছে?

তা ছাড়া যারা মানুষের কীর্ত্তিকে বড় কোরে দেখে, তারা এতে ব্যাথা পাবে না ? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একখানি ভাল বই লিখ্‌তে যে আমি সঙ্কল্প করেছি, সেটা অনেকটা এই জন্যও বটে।"

"এদের সম্বন্ধে আপনি এত উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন কি কোরে ?

"উৎসাহিত হব না ? বিবেকানন্দের লেখার প্রতি ছত্রে যে সমাহিত তেজ, যে দীপ্ত আত্মমর্য্যাদা, মানুষের দেবত্বে যে বিশ্বাস, সেটা কি মানুষের একটা মস্ত সম্পদ নয় ? তবে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক জিনিষ য়ুরোপে লেখা বিপজ্জনক ও অনেক জিনিষ য়ুরোপীয়ের কাছে অগ্রাহ্য বোলেই আমার মনে হয়।"

"তার কারণ কি ?"

"কারণ অনেক। তবে একটা প্রধান কারণ এই যে, থিয়সফিষ্টরা হিন্দুধর্ম্মের গভীরতম তত্ত্বকে এমন বাজে ভড়ঙের মধ্যে দিয়ে বিকৃত কোরে য়ুরোপের বাজারে সস্তা দামে বিকোতে বসেছে যে, তাতে কোরে য়ুরোপের চোখে হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদার হানি হতে বাধ্য। তা ছাড়া এর ফলে এশিয়াকে খাটো প্রতিপন্ন করা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠেও বটে। এবং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এজন্যে আধুনিক আত্মসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণ য়ুরোপীয়দের মনে এক দিক দিয়ে আনন্দ হবারই কথা।"

"কিন্তু আশ্চর্য্য এই মসিয়ে রোলাঁ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গৌরব আপনি এত দূরে থেকেও এভাবে এত সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে, ভারতে রামকৃষ্ণ-বিকানন্দের অভ্যুদয় একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা আজ পর্য্যন্ত আমরাই, অর্থাৎ ভারতীয়েরাই, পূরোপূরি উপলব্ধি করিনি।"

রোলাঁ উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আমি এ কথায় অরবিন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সায় দেই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে বর্ত্তমান ভারতের একটা মস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এবিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নেই ও য়ুরোপে এঁদের প্রভাব বর্ত্তমান সময়ে ভাঁটা পড়লেও জোয়ার আবার আস্‌বেই বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া আমি ত রামকৃষ্ণের জীবনী পড়তে পড়তে বারবার বিস্ময়-সাগরে তলিয়ে গিয়েছি। তুমি শুন্‌লে

আশ্চর্য্য হবে দিলীপ, টলষ্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল চিরুকফ প্রভৃতি সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ কোরে রুষদেশে এমন আরও অনেক লোক আছেন।"

আমি বল্‌লাম, "পল চিরুকফ প্রভৃতি যে বিবেকানন্দের দ্বারা এতটা প্রভাবিত তা আমি জান্‌তাম না, তবে টলষ্টয় যে শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তা আমি জানি। কারণ, আমার এক বাঙ্গালী বন্ধু টলষ্টয়কে তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ে টলষ্টয় তাঁকে লেখেন যে, মানুষ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক চিন্তায় এর চেয়ে উর্দ্ধে কখনো উঠেছে বোলে তিনি মনে করেন না।" *

রোলাঁ ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন, "দিলীপ, তোমার সেই বন্ধুটিকে টলষ্টয়ের সে চিঠিটির একটি নকল আমাকে পাঠাতে বল্‌তে পার? আমি শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ্‌ব। আমার বিশেষ দরকার।"

"তিনি আমাকে টলষ্টয়ের চিঠির এঅংশটি উদ্ধৃত করে পাঠিয়েছিলেন—"

"আমি সমস্ত চিঠিটাই চাই—"

"বেশ, আমি তাঁকে লিখে দেব।"

"ভুলো না কিন্তু—এটা ভারি দরকার।"

"না ভুল্‌ব না, নিশ্চিন্ত থাকুন।"

খানিকক্ষণ আমরা কথা কইলাম না, হঠাৎ রোলাঁ যেন আবার

---

* চিঠিটি ১৯০৬ সালের অক্টোবরে লেখা হয়। যথা,—

Dear Sir, I received your letter and the book and thank you very much for both.

The book is most remarkable and I have received much instruction from it * * *

So from humanity has frequently gone backwards from the true and lofty and clear conception of the principle of life, but never surpassed it.

Yours etc.
LEO TOLSTOI.

নিজের মনেই বল্‌তে সুরু কোরে দিলেন, "বিবেকানন্দের লেখার মধ্যে কী তেজ, কী আত্মসমাহিত শক্তি-গৌরব, কী সাধন-ক্ষমতা! আমার এক এক সময়ে মনে হয় যেন অসাধ্য সাধনের দিক্ দিয়ে বিবেকানন্দকে নেপোলিয়নের সমান বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—অর্থাৎ, অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতে। এত অল্প বয়সের মধ্যে একটা মানুষ যে এতবড় একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে পারে তা ভাব্‌লে সত্যিই সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসে। আর রামকৃষ্ণের কথা ভাব্‌লেও অবাক্ হতে হয় যে এ বিশ্বজয়ী কর্ম্মবীরকে প্রথম সাক্ষাতে তিনি এক আঁচড়েই বুঝতে পেরেছিলেন।"

একটু থেমে আবার বল্‌লেন, "আমি শুধু মাঝে মাঝে ভাবি, সমাজসংস্কারের দিকে বিবেকানন্দের যে নিগূঢ় প্রেরণা ছিল, বর্ত্তমান ভারতের মহৎ মানুষেরা সেদিকে কোনো প্রেরণাই অনুভব করেন না কেন? গান্ধী প্রমুখ সকলে এখন বিবেকানন্দের এ অসম্পূর্ণ কাজ কেন সম্পূর্ণ করতে অগ্রসর হন না।"

আবার একটু থেমে বল্‌লেন, "কী বিরাট প্রাণ! দুঃখীর জন্য কী বিরাট ব্যথা! পতিতের জন্য কী অনুকম্পা! বিবেকানন্দের জীবনের এই ট্র্যাজিডিটি আমার কাছে মহনীয়; মনে হয় যে, তিনি নিরন্তর ব্যক্তিগত জীবনে মুমুক্ষু হয়েও বাইরের জীবনের দাবীর জন্যে সে মোক্ষকেও আশু প্রয়োজনীয় মনে করেননি!"

মাদেলিন রোলাঁ বল্‌লেন, "রামকৃষ্ণের জীবনে কিন্তু এ দ্বন্দ্ব ছিল না।"

রোলাঁ বল্‌লেন, "না। কারণ রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক দিকে প্রকাণ্ড মানুষ হলেও ব্যবহারিক জীবনে বিবেকানন্দের পূর্ণতা পাননি।"

আমি বল্‌লাম, "আপনি কি মনে করেন যে য়ুরোপে বিবেকানন্দের বাণীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল?"

রোলাঁ বল্‌লেন, "নিশ্চয়—তবে শুধু সভ্য শিক্ষিত সুকুমার-হৃদয় মানুষের মধ্যে। তাঁর অখণ্ড আত্মনির্ভর ও মানুষের মধ্যে দেবত্বে বিশ্বাস সব দেশের সুকুমার-হৃদয় মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতেই সাড়া তুলতে

বাধ্য। তাঁর কথা যেন তীরের মতন একেবারে সোজা গিয়ে হৃদয় বিদ্ধ করে। তাইত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি ভাল বই লেখার সঙ্কল্প করেছি। কেবল মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এত বেশী উপাদান জড় হয়েছে যে সব পড়ে উঠ্‌তে পারা কঠিন।"

"রামকৃষ্ণের মধ্যে কোন্ বাণীটি আপনাকে এত স্পর্শ করেছে?"

"তাঁর বিশ্বাসের উদারতা—সার্ব্বজনীনতা, সার্ব্বভৌমিকতা। এই-ই ত কর্ম্ম। যে মানুষ একদম লিখতে পারত না, যে মানুষ ব্যবহারিক বুদ্ধিতে অসামান্য নয়, সে মানুষ কেমন কোরে আধ্যাত্মিক জগতে এই সার্ব্বধর্ম্মিকতা ও সার্ব্বভৌমিকতার বাণী শুন্‌তে পেল? এইখানেই তিনি বিরাট।"

"অরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এত বড় উচ্চ আকারের যোগী, যোগিশ্রেষ্ঠের মধ্যেও বিরল।"

"সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।"

খাওয়া শেষ হলে আমরা রোলাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বস্‌লাম।

(বিচিত্রা—পৌষ, ১৩৩৪) শ্রীদিলীপকুমার রায়

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(ইংরাজির অনুবাদ)

(২)

আমেরিকা

২৩শে জানুয়ারি, ১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এতদিনে তুমি নিশ্চিত আমার প্রেরিত 'ভক্তিযোগে'র কপি ছাপাবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছ। আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' কাগজের শেষ সংখ্যা (২১শে ডিসেম্বর তারিখের) পেয়েছি।

'ব্রহ্মবাদিন্'এর শেষ কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ ও আশঙ্কা হয়েছে। তোমরা কি—দের সঙ্গে যোগ দেবে নাকি? এই শেষ সংখ্যাটায় দেখ্‌ছি তোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছো। তোমাদের সংবাদ মন্তব্যের ভিতর—দের বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন? ——দের সঙ্গে আমার কোন রকম যোগ আছে সন্দেহ করলে ইংলণ্ড আমেরিকা উভয়ত্র আমার কাজের ক্ষতি হবে আর তা হতেই পারে। যাদের মাথায় কিছু গোল নেই, এরূপ সকল লোকেই তাদিকে ঠগ্ মনে করে; আর তারা যে মনে করে, সে ঠিকই করে. আর তোমরাও তা ভালরূপই জানো। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা কোরছো। তোমরা মনে কোর্‌ছো.—র নামে বিজ্ঞাপন দিলে ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাবে। তোমরাও যেমন আহাম্মক! আমি —দের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া। তারা কি বিজ্ঞাপনের জন্য তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমরা আগ বাড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কেন? আমি এইবার যখন ইংলণ্ড যাব, তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক যোগাড় কোর্‌বো।

আমি বিশ্বাসঘাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট বলে রাখ্‌ছি, কোন বদ্‌মাস আমার উপর চাল্ মেরে যাবে, এ আমি হতে দেবো না। আমার সঙ্গে কপটতা চল্‌বে না। হয় তোমরা তোমাদের কাগজে প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপন দাও যে, তোমরা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রব ত্যাগ করে—দের দলে যোগ দিয়েছ অথবা তাদের সঙ্গে সংস্রব একদম ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বল্‌ছি। একজন—মাত্র একজন যদি আমার অনুসরণ করে সেও ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাকে। সিদ্ধি বা অসিদ্ধি আমি গ্রাহ্যই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্য্যের মিছে কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি —দের কেহ আমার সাহায্যার্থে এসেছিল? বাজে আহাম্মকি যত। আমি

যে আন্দোলন চালাচ্ছি, তা অন্য বাজে ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রাখ্‌বো, তা না হয়, আমি কোনরূপ আন্দোলন চালাতে চাই না।

ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ

পুঃ—উপরোক্ত বিষয়ে তোমরা কি ঠিক কর্‌লে, তা পত্রপাঠ আমায় লিখ্‌বে। আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়্‌বার নয়। ইতি

বি—

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিন্' বেদান্ত প্রচারের জন্য, থি—— প্রচারের জন্য নহে। তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, এরূপ হয়, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা উচিত ছিল পরিষ্কারভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্য্যকালে অন্যরূপ কর্‌তে দেখ্‌লে আমি একরকম ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি। বি—

পুঃ—জগৎটা এই। যাদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য কর, তারাই তোমায় ঠকাতে চায়। ঘৃণিত সংসার !!! বি—

(ইংরাজির অনুবাদ)

(৩)

আমেরিকা

১৮৯৬

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

গত সপ্তাহে আমি 'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে লিখেছিলাম। উহাতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির কথা লিখ্‌তে ভুলেছিলাম। ঐগুলি সব একসঙ্গে করে একখানা পুস্তকাকারে বার করা উচিত। ছাপান হলে কয়েক শত আমেরিকায় গুডইয়ারের নামে নিউইয়র্কে পাঠাতে পার। আমি বিশ দিনের ভিতর ইংলণ্ড রওনা হচ্ছি। আমার কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে বড় বড় বই রয়েছে। কর্ম্মযোগ

বেরিয়ে গেছে। রাজযোগখানা খুব বড় বই হয়েছে—উহা ইতিমধ্যেই যন্ত্রস্থ হয়েছে। জ্ঞানযোগখানা বোধ হয় ইংলণ্ড থেকে ছাপাতে হবে।

তোমরা 'ব্রহ্মবাদিনে' ক্র—র একখানা পত্র ছেপেছ, তা ভাল করনি। ক্র—এখনও ————দের কাছ থেকে যে ঘা খেয়েছে, তাইতে জ্বলে মরছে—আর ঐরকম চিঠি লেখেন প্রতি ইতরের মত খোঁচা দেওয়া। 'ব্রহ্মবাদিনে'র সুরের সঙ্গে উহা খাপ খায় না। সুতরাং ভবিষ্যতে ক্র— যখন কিছু লিখবে, তখন তাতে কোন সম্প্রদায়ের উপর (উহা যতই বেয়াড়া বা কিম্ভূতকিমাকার হোক না কেন) আক্রমণ থাকলে উহা কেটে কুটে খুব নরম করে দিয়ে তবে ছেপো। ভালই হোক আর মন্দই হোক, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'ব্রহ্মবাদিনে' কিছু ছাপান যেন না হয়। অবশ্য জুয়াচোরদের সঙ্গে গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাবারও কোন আবশ্যক নেই। আর এক কথা তোমাদের জানিয়ে রাখছি, কাগজটা যেরূপ পারিভাষিক শব্দবহুল, তাতে এখানে গ্রাহক বড় হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্য দেশবাসী ঐ সব দাঁতভাঙ্গা বটমার্কা সংস্কৃত কথা বা পারিভাষিক শব্দগুলি জানেন না, জানবার তাদের দরকারও নেই। এইটুকু আমি দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে কোন একটা মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটাও শব্দ যেন না থাকে। মনে রাখবে, তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন করে কথা বল্‌ছ আর তোমরা যা বলতে চাচ্ছ, জগৎ তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোকের তর্জমা খুব সাবধানে করবে, আর যতটা সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা কর।

এই পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ইংলণ্ড পৌঁছে যাব। সুতরাং আমাকে C/o ই. টি. ষ্টার্ডির ঠিকানায় হাইভিউ, কেভারশাম, ইংলণ্ড, বলে পত্র লিখবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

ষটচক্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

প্রশ্ন হয়েছে, তন্ত্রে যে ষট্চক্রের উল্লেখ আছে তা কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান যেতে পারে কি না? এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের দিক থেকে যতটুকু আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাই সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করবো।

দেহের মধ্যে দু রকমের স্নায়ু প্রবাহ চলেছে। তার প্রথমটা থেকে মনের ইচ্ছা মত ক্রিয়া হয়। এই প্রবাহের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। তন্ত্রকারেরা একে বলেছেন, সহস্রার বা রূপক সহস্রদল পদ্ম। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য অনেকটা জীবের ইচ্ছা মত সম্পন্ন হয়। এই সকল কাজ করবার জন্যে মস্তিষ্ক থেকে মেরুমজ্জা দিয়ে জ্ঞানাত্মক ও গত্যাত্মক (Sensory and Motor) স্নায়ুশিরা সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে। এই সকল শিরার মধ্যে যে স্নায়ু প্রবাহ (Neural current) চলছে, তাদেরই চাঞ্চল্য বশতঃ মন মস্তিষ্ক হতে দেহের প্রত্যেক অংশ অনুভব করে এবং মাংসপেশী চালনা করে নিজের দরকার মত কাজ করে। এইরূপে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের কাজ চলেছে। কিন্তু বাকি কটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চোক, কান, নাক ও জিহ্বা) কাজের জন্য মস্তিষ্ক থেকে বিশেষ বিশেষ স্নায়ু আছে, যারা ঐ চারটি আভ্যন্তরিক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন (Optic nerve, Auditory nerve etc)।

আর এক প্রকারের স্নায়ু প্রবাহ আছে যাদের বৈজ্ঞানিকেরা সহানুভূতিক মণ্ডলী (Sympathetic System) বলেন। এরা মনের অগোচরে অজ্ঞাতসারে কাজ করে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মনস্তত্ত্ববিদেরা "মনের অগোচর" কথাটি স্বীকার করেন না। স্বামী বিবেকানন্দ এ কথা বহু পূর্ব্বে রাজযোগের বক্তৃতায় বলে গ্যাছেন,—"প্রাণই সমুদয় প্রাণীর অন্তরে জীবনী শক্তি রূপে রহিয়াছে। মনোবৃত্তি ইহার সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যাহাকে আমরা সচরাচর মনোবৃত্তি

আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক প্রকার ভেদ আছে। যাহাকে আমরা সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান বির্বহিত-চিত্তবৃত্তি বলি, তাহা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্যক্ষেত্র। আমাকে একটি মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনাআপনি উহাকে আঘাত করিতে গেল। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ এক প্রকারের মনোবৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহায্য বিরহিত প্রতিক্রিয়াগুলিই (Reflex actions) এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির অন্তর্গত। (রাজযোগ-প্রাণ)।

"আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজাতির যত কিছু জ্ঞান, যাহাদিগকে বিচারজাত জ্ঞান বলে, সে সকলই অহং বুদ্ধির অধীন। আমি এই টেবিলটিকে জানিতেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেছি, এইরূপে আমি অন্যান্য বস্তুও জানিতেছি; আর এই অহংজ্ঞান বশতঃই আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখানে, টেবিলটি এখানে, আর অন্যান্য যে সকল বস্তু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি বা শুনিতেছি তাহারাও এখানে রহিয়াছে। ইহা ত গেল এক দিকের কথা। আবার আর এক দিকে ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে আমার সত্তা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে পারি না। শরীরাভ্যন্তরস্থ সমুদয় যন্ত্র, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি কাহারও জ্ঞানের বিষয় নহে।

"যখন আমি আহার করি, তখন তাহা জ্ঞানপূর্ব্বক করি, কিন্তু যখন আমি উহার সার ভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আমি উহা অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি। যখন উহা রক্তরূপে পরিণত হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। আবার যখন ঐ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমুদয় ব্যাপারগুলি আমার দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। এই শরীরের মধ্যে ত আর বিশটি লোক বসিয়া নাই, যে ঐ কার্য্যগুলি করিতেছে। কিন্তু কি করিয়া

জানিলাম যে, আমিই ঐগুলি করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ বিষয়ে ত অনায়াসেই আপত্তি হইতে পারে যে, আহার করার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক; খাদ্য পরিপাক করা ও তাহা হইতে শরীর গঠন করা আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে। একথা কথাই নহে; কারণ, ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে সকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই আবার সাধনবলে আমাদের জ্ঞাতসারে সাধিত হইতে পারে। আমাদের হৃদয়-যন্ত্রের কার্য্য আপনা আপনিই চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, আমরা কেহই উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারি না, উহা নিজের খেয়ালে নিজে চলিতেছে। কিন্তু এই হৃদয়ের কার্য্য ও অভ্যাস বলে এমন ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে যে, ইচ্ছামাত্র উহা শীঘ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরের প্রায় সমুদয় অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহাও আমরা করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এই মাত্র। অতএব দেখা গেল, মনুষ্য-মন দুই অবস্থায় থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে জ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে। যে সকল কার্য্য করিবার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি করিতেছি, এই জ্ঞান সদাই বিদ্যমান থাকে, সেই সকল কার্য্য জ্ঞান ভূমি হইতে সাধিত হয়, বলা যায়। আর একটি ভূমির নাম, অজ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে। যে সকল কার্য্য জ্ঞানের নিম্ন ভূমি হইতে সাধিত হয়, যাহাতে 'আমি' জ্ঞান থাকে না, তাহাকে অজ্ঞান ভূমি বলা যাইতে পারে।" (রাজযোগ—ধ্যান ও সমাধি)

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ ফ্রয়েডের (Sigm. Freud) সমস্ত গবেষণা অজ্ঞান-ভূমি সম্বন্ধীয় ও উল্লিখিত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

যা হোক ঐ সকল কাজগুলোকে অজ্ঞানকৃত ধরে নিয়ে, দেখতে পাই যে, দেহের কতকগুলো যন্ত্রের ক্রিয়া জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। ওদের কাজ মনের অজ্ঞাতসারে সব সময়ই চলেছে, যেমন,

ফুসফুসের শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, অন্ত্রের খাদ্য দ্রব্য পাক, পোষণ ও রক্ত, মজ্জা, অস্থি, মাংস প্রভৃতিতে পরিণতি। জেগেই থাক আর ঘুমোও এদের কাজ চলবেই। বস্তি, উদর ও বক্ষের যন্ত্রগুলির ওপর এই সহানুভূতিক মণ্ডলীর প্রভাব সর্ব্বদাই চলেছে। সাধারণ অবস্থায় বোধ হয় এদের ওপর মনের কোনও প্রভাব নেই। কিন্তু যাই ওদের কোনও গোলমাল বাধে তখুনি মনে যন্ত্রণার অনুভব এসে লাগে অথবা মনের গোলমালে ঐ যন্ত্রেরও বৈলক্ষণ্য দেখতে পাওয়া যায়। মনের অজ্ঞাতসারে অভ্যাস বশতঃ হারমোনিয়াম বাজাচ্চ, একটা জোরে চিমটি কাটলেই কিন্তু হাত থেমে যাবে। তা হলে ঐ যে সহানুভূতিক টুতিক যা কিছু—যাকে আমরা অজ্ঞানকৃত বলছি তার সঙ্গে জ্ঞানকৃতের ভেদটা কি?—ভেদটা একই জ্ঞানের তারতম্য অবস্থা বলে বোধ হয় না কি?

তন্ত্র বলছেন, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটে নাড়ী ও শরীরের মধ্যে ষটচক্র ঐ সহানুভূতিক মণ্ডলীর অন্তর্গত। ইড়া নাড়ী যাচ্ছে মেরু মজ্জার (Spinal chord) বাঁ দিক দিয়ে আর পিঙ্গলা যাচ্ছে ডান দিক দিয়ে। মেরু মজ্জার যে জ্ঞানাত্মক ও গত্যাত্মক স্নায়ুর ওপর মনের যে প্রভাব চলেছে, ইড়া পিঙ্গলা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সুষুম্না যাচ্ছে মেরু মজ্জার মধ্য দিয়ে। নীচের দিকে এর মুখ বন্ধ। আবার সুষুম্নারও মধ্যে আছে চিত্রা নাড়ী। এ ব্রহ্মরন্ধ্রকে বেষ্টন করে আছে। ব্রহ্মরন্ধ্র মস্তিষ্কের পঞ্চগুহা (Ventricles of the Brain) ভেদ করে গ্রীবাস্থি Medulla Oblongata) ও মেরু মজ্জার ঠিক মাঝ খান দিয়ে নীচেয় আসছে।

এখন এই চক্রগুলি নিম্নলিখিত ভাবে সাজান আছে—বস্তি দেশে দুটি—

(১) কুলকুণ্ডলিনী (Ganglia impar)

(২) স্বধিষ্ঠান (Sacral plexus)

উদর গর্ভে একটি—

(৩) মণিপুর (Abdominal plexus)

বক্ষ স্থলে একটি—

(৪) অনাহত (Cardiac plexus)

গ্রীবা দেশে একটি—

(৫) বিশুদ্ধ (Medulla Oblongata)

মস্তিষ্কে একটি—

(৬) আজ্ঞা (Frontal plexus)

এখন আমরা জীবনী শক্তি সংগ্রহ করি খাদ্য থেকে। এই শক্তি দুভাগে বিভক্ত হয়ে কুণ্ডলিনী ও মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। এই মস্তিষ্কের শক্তির দ্বারা মানসিক ও দেহের ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সাধিত হয়; আর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহানুভূতিক মণ্ডলীর সকল ক্রিয়া সাধিত করে। এখন যোগীরা চান যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা সুষুম্নার মুখ খুলে সহানুভূতিক মণ্ডলীর সমস্ত কার্য্যের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে। সহানুভূতিক স্নায়ু মণ্ডলীর ওপর আধিপত্য হলেই এখন যে সকল কাজ অজ্ঞাতসারে হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে, সে সব ইচ্ছা শক্তির দ্বারা চালিত হতে পারে। আহার আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক করি, তার অ-দরকারী ভাগ ত্যাগও আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক করি কিন্তু পাকাশয়ে ও অন্ত্রে জীর্ণ ও শোষিত করা ও শোণিতাদিতে পরিণত করা আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক বা মনের সহজ অবস্থায় করতে পারি না। এর মানে এ নয় যে, ওদের সঙ্গে মনের কোনও সম্বন্ধ নেই। কারণ বিকৃত অবস্থায় অজীর্ণ, অম্ল, শূল প্রভৃতি রোগ হলে মন বেশ বুঝতে পারে। উদরের মধ্যে মণিপুর চক্রে স্নায়ুর ক্রিয়া বশতঃ পাকাশয় ও অন্ত্রের কাজ চলেছে; "প্রাণ ও অপান" শক্তির সঙ্গমস্থল এই নাভি চক্রে। এখানেই "চতুর্ব্বিধ অন্ন পচিত" হচ্ছে।

যোগীরা বলেন, মস্তিষ্কের মধ্যে তৃতীয় জ্ঞান-নেত্র আছে। এর স্থান কেউ কেউ নির্দ্দেশ করেন মস্তিষ্কের তল ভাগ (Pineal Gland)। হঠ যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা যেমন সহানুভূতিক মণ্ডলীকে জাগরিত করা যায় তেমনি ধ্যানযোগ বা রাজযোগের দ্বারা এই তৃতীয় নেত্র উন্মিলত হয়।

এখন ধ্যানযোগ বা হঠযোগ উভয়েরই ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যের ওপর।

কারণ ব্রহ্মচর্য্যবান ব্যক্তির ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি প্রবল। শরীরের সব রস ও শক্তির সারাংশ হচ্ছে ওজঃ। এ শুক্রের সঙ্গেই জন্মায় এবং শুক্রাধারে (Vesiculoe Seminalis) সঞ্চিত থাকে। পরে রক্তের সঙ্গে সঞ্চারিত হতে হতে মস্তিষ্কে ও ষটচক্রে সঞ্চিত হয়। জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় অবস্থায় এ নিঃসৃত হয়। অতিরিক্ত নিঃসরণে শরীরে ওজঃ হ্রাস পেলে স্নায়ুমণ্ডলীও দুর্ব্বল হয়, কারণ ওজঃই পুষ্টিকারক। যাঁর ওজঃ শক্তি যত অধিক তিনি তত চিন্তাশীল ও ইচ্ছাশক্তিমান। কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে এ ধারণ করতে গেলে পাগ্‌লামী প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়।

আমরা দেখতে পাই যদি মিনিট পাঁচেকের জন্য নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে যায় তা হলে শরীর নীলবর্ণ হয়ে প্রাণশক্তি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এ হল সহানুভূতিক স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য। এর কেন্দ্র হল মেরুমজ্জায়, বক্ষস্থলের অনাহত চক্রের দ্বারা এর কাজ সম্পন্ন হয়। তবুও শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর মনের কতকটা আধিপত্য আছে। মস্তিষ্কের নিম্নে গ্রীবাস্থি (Medulla Oblongata) থেকে বায়ুবহ স্নায়ু (Nimo Grastric) ফুসফুসে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই স্নায়ু দিয়ে মন শ্বাস-প্রশ্বাসকে জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছামত সংযত করতে পারে। এখন সহানু-ভূতিক মণ্ডলীর যে ক্রিয়াটি আমরা ধরতে পারি সে ক্রিয়াটি ধরে ঐ মণ্ডলীর অন্যান্য ক্রিয়াও আয়ত্ত করবার চেষ্টা যোগীরা করে থাকেন। প্রাণায়াম দ্বারা সহানুভূতিক মণ্ডলীর শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ওপর আধিপত্য করে পরে যোগীরা ঐ মণ্ডলীর অপর ক্রিয়াগুলির ওপব আধিপত্য করতে চান।

যে বাতাস আমরা নাক দিয়ে ভেতরে টেনে নি, তা অম্লজানে (Oxygen) পূর্ণ। আর যে বাতাস আমরা নাক দিয়ে বের করে দি সেটা হচ্ছে অঙ্গারাম্লজানে (Carbonic Acid) পরিপূর্ণ। বাতাস ফুসফুসের বায়ু কোষে (air cells) ঢুকে কৈশিকনাড়ীর (Capillaries) মধ্যে প্রবাহিত অবিশুদ্ধ কাল রক্তের অঙ্গারাম্লজান বের করে নিয়ে তাকে অম্লজান দিয়ে শোধিত ও রক্ত বর্ণ করে। রক্তের লাল কণিকাগুলো

অম্লজানকে ধমনী ও কৈশিক নাড়ীর সাহায্যে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেয়। তখন অম্লজান প্রত্যেক যন্ত্রের কাজ করবার সহায় হয়। এর মানে এ কেউ যেন বুঝে না বসেন যে, বাতাসটাই সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করে, বাতাসের অম্লজান অংশই সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করে যন্ত্রের জীবাণুগুলিকে অনুপ্রাণিত করে। নিশ্বেস ফেলা এবং টানার সময় মাংসপেশি ওঠা নামা করে; উদরের ওঠা নামা দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে বাতাস পেটে ঢুকে ওঠা নামা করাচ্ছে।

সাধারণ অবস্থায় একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, বাতাস এক নাক দিয়ে ঢুকছে আর এক নাক দিয়ে বেরুচ্ছে। যোগীরা প্রাণায়াম করে এই নিঃশ্বাসকে জয় করতে চান। পূরক (টানা), রেচক (ছাড়া) ও কুম্ভক (রাখা) দিয়ে তাঁরা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীকে উত্তেজিত করে, অনাহত চক্রে (বক্ষে) নিজেদের ইচ্ছা শক্তি চালাবার ইচ্ছা করেন। বহুদিন অভ্যাস করলে প্রাণ (ওপরদিকের স্নায়ু প্রবাহ) ও অপান (নীচু দিকের স্নায়ু প্রবাহ) বায়ু মিশে যায় এবং কুণ্ডলিনী ও তৃতীয় জ্ঞানচক্ষুর শক্তি জেগে ওঠে।

আয়ুর্ব্বেদে স্নায়ু প্রবাহকে বায়ু নাম দেওয়া হয়েছে। বাইরের বায়ু ও ভেতরের স্নায়ু প্রবাহে কি সম্বন্ধ এখনও তা ঠিক হয়নি। বোধ হয় রূপকে বলা হয়েছে। নাগ কূকর প্রভৃতি গৌন বায়ুর নাম থেকেও তাই বোধ হয়। স্নায়ুর প্রবাহ ও গতির তুলনা করে অলঙ্কারে ঐ সব নামের কল্পনা। কিন্তু একেবারে বায়ুর সঙ্গে যে কোনও সম্বন্ধ নেই তা বলা যায় না। কেন-না বায়ুর অম্লজান রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের পোষণ করে, তেমনি যবক্ষার জানও (Nitrogen) স্নায়ুমণ্ডলী পোষণের সাহায্য করে। হঠ যোগীরা বলেন, বহুদিনের অভ্যাসে প্রাণায়ামের দ্বারা যখন বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঠে তখন কুণ্ডলিনী জাগরিত হন।

আর একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি, মন যখন চঞ্চল থাকে নিঃশ্বাসও তখন তাড়াতাড়ি পড়ে। পক্ষান্তরে শরীরের ক্রিয়া বশতঃ নিঃশ্বাস যখন তাড়াতাড়ি পড়ে মনও তখন ভয়ানক উত্তেজিত থাকে। আবার মন যখন খুব একাগ্র এবং স্থির হয় নিঃশ্বাসও

তখন খুব দীর্ঘ ও স্থির হয়ে আসে। সেই জন্য যোগীরা বলেন, দীর্ঘ প্রাণায়ামের দ্বারা মন স্থির হয়।

যে সকল প্রাণী তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস ফেলে তাদের শরীর গরম এবং তারা অল্পজীবী হয়, যেমন খরগস, কুকুর প্রভৃতি এবং যে সকল প্রাণীর নিঃশ্বাস দীর্ঘ তাদের শরীর ঠাণ্ডা এবং তারা দীর্ঘজীবী হয়, যেমন সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ। দেখতে পাওয়া যায় ভেক, সাপ ও অন্যান্য অনেক সরীসৃপ শীতকালে শ্বাস রোধ করে তিন চার মাস না খেয়ে বাঁচতে পারে। সেই সময় তাদের দেহে প্রাণটি বর্ত্তমান থাকে মাত্র, কেবল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি অল্প মাত্রায় চলতে থাকে। আর সব জৈবী ক্রিয়া প্রায় একেবারে বন্ধ থাকে। তখন তাদের খিদে তেষ্টা থাকে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের জন্য তাদের রক্ত সাধারণতঃ ঠাণ্ডা সেই জন্য উষ্ণ শোণিত জীবের স্বাভাবিক উত্তাপ রাখার জন্য যে পরিমাণ আহার্য্যের প্রয়োজন, তাদের তার আবশ্যকই হয় না। ঐ সব প্রাণীরা তাদের জিব উল্টে কণ্ঠনালীতে রাখে, তাইতে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যোগীরা ইতর জন্তুদের মধ্যে স্বাভাবিক যোগ ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে বাস্তব জীবনে সেগুলোকে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ ওদের মত খেচরী মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন। জিবের মল কেটে দিয়ে দীর্ঘ করে তাঁরা কণ্ঠ-নালীর মধ্যে জিব রাখেন, তাইতে শ্বাস রোধ হয়। *

---

* নাশ্নন্তি দর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ
কূর্ম্মাশ্চৈবাঙ্গগোপ্তারো দৃষ্টান্তা যোগিনোমতাঃ॥

স্বরোদয়যোগে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। তদনুযায়ী শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ তাঁহার পাতঞ্জল দর্শনের অবতরণিকাতে প্রাণীদের নিঃশ্বাসের ও পরমায়ুর তালিকা দিয়াছেন, পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে ফলিত করিলাম।

প্রতি মিনিটে

প্রাণী	[illegible]-শ্বাস-সংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু-বৎসর
শশ	৩৮।৩৯	৮
কপোত	৩৬।৩৭	৮।৯

কিন্তু দেহের ও মনের ওপর নানা বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করলেই যে আধ্যাত্মিকতা হল তা নয়। ও সব হঠযোগ দিয়ে জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয় না। সেই জন্য যাঁরা ঈশ্বরলাভেচ্ছু তাঁদের এসব দিকে মন না দেওয়াই ভাল।

বাসুদেবানন্দ

প্রতি মিনিটে

প্রাণী	প্রায়িক-শ্বাস-সংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু-বৎসর
বানর	৩১।৩২	২০।২১
কুকুর	২৮।২৯	১৩।১৪
ছাগল	২৩।২৪	১২।১৩
বিড়াল	২৪।২৫	১২।১৩
ঘোড়া	১৮।১৯	৪৮।৫০
মনুষ্য	১২।১৩	১০০
হস্তী	১১।১২	ঐ
সর্প	৭।৮	১২০।২২
কচ্ছপ	৪।৫	১৫০।৫৫

"পূর্ব্বে যখন লোক সকল সবলকায়, অরোগী ও শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত এখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যার ঐক্য হয় না। তখনকার মনুষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রায় ১১।১২ই ছিল, কিন্তু এখনকার মনুষ্যের আয়ুর অল্পতা প্রভৃতির দোষে তাহাদের শ্বাস-সংখ্যা এক্ষণে প্রায় প্রতি মিনিটে ১৫।১৬ সংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা কলির মনুষ্যের শ্বাস সংখ্যা গণনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "ষষ্টি শ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্‌প্রাণা নাড়িকা মতা। ষষ্টিনাড্যা অহোরাত্রং জপ সংখ্যা ক্রমো মতঃ।। একবিংশতি সাহস্রং ষটশতাধিকমীশ্বরি। জপতে প্রত্যহং প্রাণী" ইত্যাদি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মনুষ্য জীব এক অহোরাত্রে একুশ হাজার ছয় শত বার হংস মন্ত্র জপ করে; অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। সুতরাং জানা গেল, কলির মনুষ্যেরা প্রতি মিনিটে ১৫ বার মাত্র শ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন করে। এই ব্যবস্থা প্রায়িক অর্থাৎ অধিকাংশ মনুষ্যের পক্ষে।" (পৃঃ ৯।১০)

সিন্ধু

হে অমিত! কত যুগ যুগান্তর ধরি দৃপ্ত রোষে
সুগম্ভীর অশনি-নির্ঘোষে
নাহি জানি কি অতৃপ্ত ক্ষুধা লয়ে এই নিত্য-নব
মুক্ত-অসীমের তলে রচিয়াছ প্রলয় উৎসব!
কার অন্বেষণে তুমি ফিরিতেছ ওগো ক্লান্তি-হীন
তব আয়োজন মাঝে কারে তুমি যাচ নিশিদিন?
কোন্ রুদ্ধ বেদনায় গর্জ্জিয়া উঠিছ চিরকাল—
হে রুদ্র-ভয়াল।
নিঃশ্বাসে কি কথা ঢাক তব বক্ষ মাঝে
কেহ জানে না যে।

কি মহান্ বাণী তব কণ্ঠ-তলে নাচে নিরন্তর
হে চঞ্চল। অশান্ত সুন্দর।
কেবা জানে অন্তরের কোন তব গুপ্ত-কক্ষ-তলে
অনাদি অতীত হতে অবিরাম—প্রতি পলে পলে,
কোন্ স্নেহ-ফল্গু ধারা ধরাগাত্রে শিহরণ তুলি
গভীর মমতা লয়ে উচ্ছ্বাসে উঠিছে দুলি দুলি,
বিস্মিত করিয়া সবে গাহি যাও কি যে নিতি নিতি
অন্তহারা-গীতি।
কি মুক্ত-পুলকে তব ভরেছে হৃদয়
হে আনন্দময়!

চপল-নর্ত্তন-তালে নূপুর বাজিছে অবিরল
হে উলঙ্গ! হে শিশু চঞ্চল।
আলোক-নন্দিত-প্রাতে জীবনের প্রথম উন্মেষে
সর্ব্বাঙ্গে কিরণ মাখি নেচে এলে কি বিচিত্র বেশে
তট প্রান্ত মুখরিত করি, তব কোলাহল জাগে
তোমার চেতন-মায়া বিশ্বটির অঙ্গে অঙ্গে লাগে।

সুদূরের সীমা ঘিরে পাতিয়া রেখেছ তুমি বেলা—
সেথা—কি অপূর্ব্ব খেলা !
কৌতুক-উজ্জ্বল-মুখে ভাসে তব প্রীতি
হে স্বপ্ন অতিথি !

এ উদ্দাম-মত্ত-লীলা আনে না কি কভু অবসাদ
হে অধীর, হে চির উন্মাদ !
যৌবন-বিক্ষুব্ধ চিত্ত সতত তুলিছ তুমি বাড়ি,
মদিরা-বিভোর-অঙ্গ আবেশে পড়িছে তব ভাঙি,
তুলিবার শক্তি লভি, বিপুল আগ্রহ সাথে নিয়া—
আবার উঠিছ তুমি, সবারে সে বার্ত্তা বলি দিয়া,
সীমা-হীন আকাঙ্ক্ষার শেষ তব হবে কোন্ ক্ষণে
তাই ভাবি মনে !
অপূর্ব্ব তোমার লীলা চির অজানীত
হে দুরন্ত-চিত্ত !

উন্মুক্ত অম্বর মাঝে ওঠে তব যজ্ঞ ধূম-রাশি
নির্ব্বিকার হে ভোলা-সন্ন্যাসি !
কোন্ অনন্তের ধ্যান নীরবে করিছ মুদি আঁখি
সমাহিত-চিত্ত-তব কাহারে ফিরিছে ডাকি, ডাকি,
পরিপূর্ণ-বক্ষ-তব কিসের উচ্ছ্বাসে উঠে টলি
গভীর গোপনে তাহা হে উদাসি। কিবা যায় বলি ?
হে বৈরাগি ! রিম্ ঝিম্ কি সুর তুলিছ একতারে—
ভুলি আপনারে !
কাহার যাচিছ তুমি অমৃত-পরশ
হে মহাতাপস !

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

লাঠ্যৌষধি

আমার ডিস্‌পেন্‌সারীর সম্মুখে একটা বস্তিতে কয়েকজন হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান বাস করে। গত রাত্রে তাহাদের একজনের খোলার ঘরে সিঁদ কাটিয়া যথাসর্ব্বস্ব চোরে লইয়া গিয়াছে। সকালে পুলিস আসিয়াছে; বস্তির লোকগুলোকে মারধোর করিয়া চোরের নামধাম জিজ্ঞাসা করিতেছে। অনেক লোক জমা হইয়া মজা দেখিতেছে।

আমরা চার এয়ারে বসিয়া নিতান্ত অলসভাবে চা খাইতেছিলাম; এবং এই চুরির সূত্র ধরিয়া আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যু হইতে বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাত, নিমে চামার, করিম চাচা প্রভৃতি যত রাজ্যের বড় বড় ডাকাত, সিঁদেল চোর, ছিঁচকে চোর, বোম্বেটে ও গুণ্ডার গল্প করিয়া পরাণবাবু শীতের সকালটুকু বেশ গরম রাখিয়াছিলেন। আমারও পেটের ভিতর অনেক দৃষ্ট ও শ্রুত কাহিনী বাহির হইবার জন্য হাঁচোড় পাঁচোড় করিতেছিল, কিন্তু গোল্পে পরাণবাবুর ভাণ্ডার অফুরন্ত, তাহার সোম নাই, বিচ্ছেদ নাই। আমি হঠাৎ একফাঁকে বলিয়া উঠিলাম, "উঃ, মার্‌—মার্‌, সে কী মার!!!"

সুনীল ও হরেন সভয়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাকে—কাকে ডাক্তার বাবু?"

আমি চায়ের তলানিটুকু শেষ না করিয়াই বলিলাম, "শোন তবে। সে আজ বছর পাঁচেকের কথা। কলে (Call) বেরিয়েচি। বিকেল বেলা। তখনও মানিকতলা স্পার্‌ হয়নি। ওখানে একটা বাড়ী ছিল—মস্তবড়, লালরঙের। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেটা এখন ভেঙ্গে ফেলেচে। বাড়ীটার যেই কাছাকাছি এসেচি—দেখি, একটা ছোঁড়াকে গোটাদশেক গুণ্ডাগোচের লোক ধরে বেদম মারচে। আরও কতকগুলো মারবার জন্যে উঁচিয়ে আছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে গাড়ী থেকে নেমে এসে, ভিড় ঠেলে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

'কি হয়েচে, হে?' আমারি বোকামি, তার কি উত্তর দেবার মত তখন সামর্থ্য আছে? তিন চারটে লোক উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে, 'ঐ—ঐ লালবাড়ীতে চুরি কোরতে ঢুকেছিল, মোশাই। মার্ ব্যাটাকে—আরো মার্।' আমি বেগে লোকটাকে গাড়ীতে তুল্‌লুম—পুলিশে দেবার জন্যে। যারা এতক্ষণ মারতে পারেনি, তারা ছুটে এসে গাড়ীর ওপরেই তাকে দুচার ঘা বসিয়ে দিলে। লোকটা আমার হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বল্‌লে, 'বাবু, আমি চোর নই, ভদ্দর লোকের ছেলে;— রক্ষে করুন।' বল্‌লুম, 'চল্ ব্যাটা ভদ্রলোকের ছেলে'।।

"এইখানেই তাকে নিয়ে এলুম। এতক্ষণ হাঙ্গামার ভেতর ভাল করে তাকে দেখা হয়নি। দেখে বুঝ্‌লুম, নেহাৎ ছোটলোকের মত চেহারা নয়; চোর না হতেও পারে। বয়স আন্দাজ উনিশ কুড়ি। ছেলেটার কাত্‌রানি দেখে একটু দয়া হোল। বল্‌লুম, 'কি করেচ সত্যি করে বল। কোকেন টোকেন খাও নাকি?' সে বল্‌লে, 'না বাবু, upon God বল্‌চি কোকেন খাইনে, প্রাইভেট টিউসিনী করি'।"

পরাণ বাবু বেজায় রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হারামজা—,'প্রাইভেট টিউসিনী করি'— চোরের যাশু।"

সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "আরে, আপনি যে এখানেই মারপিট আরম্ভ কর্‌লেন, আগে শুনুন না মোশাই। তারপর বোঝা যাবে, চোর না সাধু।"

তাহারা থামিলে বলিলাম, "প্রাইভেট টিউসিনী কর?—কোথায়? ছেলেটি বলিল, 'সেই লালবাড়াতে।' 'কিছু চুরি চামারি করনি?' 'আজ্ঞে না— upon God বল্‌চি।' 'upon God ত বল্‌চো, তবে মার খেলে কেন?' ছেলেটি আব কথা বলে না, ঘাড় হেঁট করে। আমি জিজ্ঞেস করলুম্, 'তোমার নাম কি?' 'লালমোহন।' 'ডাকনাম?' 'লালু।' 'কতদিন কল্‌কাতা এসেচ?' 'ছুমাস।' 'তার আগে কি কোর্‌তে?' 'পড়তুম।' 'তারপর?' 'থিয়েটার করেছিলুম।' 'থিয়েটার ছাড়লে কেন?' এবারও লালমোহন ঘাড় হেঁট করিল।"

হরেন বলিল, "ব্যাটা খুব চালাক তো ? খুব উপস্থিত বুদ্ধি !"

সুনীল বলিল, "আহা ! তা না হলে চোর হওয়া যায় ?"

পরাণ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "কিন্তু পরাণ বাবু, ছেলেটার সভয় চোকমুক দেখে, তার কথায় কেমন বিশ্বাস হয়ে গেল। একডোজ বলকারক ওষুধ খাইয়ে একটু তাজা করে তাকে ছেড়ে দিলুম।"

সুনীল উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কর্‌লেন কি—একেবারে ছেড়ে দিলেন ?"

হরেন বলিল, "আবার ওষুধ খাইয়ে ?"

পরাণ বাবু আমার সিগারেট কেস্ হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া বলিলেন, "না বাপু, কাজটা ভাল করনি। প্রাইভেট টিউটার কি আর চোর হতে পারে না ?"

আমি বলিলাম, "শুনুন তারপর—"

সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "সার্চ্চ কর্‌লেন না কেন ?"

"ঠিক, ঠিক, বল্‌তে ভুলে গেচি। করেছিলুম বৈকি ?"

পরাণ বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু পেলে না ?—মাল টাল ?"

"পেয়েছিলুম—একটা কবিতার খাতা।"

হরেণ হাসিয়া বলিল, "আরে যোলো—"

"জিজ্ঞেস করলুম, 'এসব কবিতা কার লেখা। বল্‌লে, 'আমার!' 'লিখে কি কর ?' 'ছাপাই।' 'কোন কাগজে ?' 'পরানিয়া।—আমি পরাণিয়ার সম্পাদক' !"

সুনীল উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "খাতাখানা আছে নাকি ?"

"সেখানা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলুম। তবে দু একটা কবিতার এক আধ লাইন মনে আছে।"

হরেণ আগ্রহের সহিত বলিল, "বলুন না ডাক্তার বাবু, যদি মনে আছে।"

হে কবি !

অদ্ভুত তব ছবি।

তোমার কিরণ ডাঁসাইয়ে তুলে
কচি ফল অকালে।

পরাণ বাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি কবিতা? ছন্দ কই?"

"আমিও তাকে ঐ কথা বলেছিলুম, সে বল্লে, 'সবুজী ছন্দ'।"

পরাণ বাবু রাগিয়া বলিলেন, "কাবুলী ছন্দ!!! নাও—তারপর কি হোল বল?"

"তারপর, তার সঙ্গে দেখা—বছর খানেক পরে, এই ডিস্পেনসারীতে। চেহারাখানা একেবারে বদলে ফেলেচে। মাথায় বড় বড় বাবরি ছন্দে ঢেউ খেলান চুল, আদ্দির পাঞ্জাবীর ওপর একখানা সিল্কের চাদর এলোমেলো করে জড়ান, পায়ে লক্ষৌ লপেটা। যত্ন করে বসালুম। বল্লে, 'কিছুদিন থেকে শরীর বড় খারাপ—মাথাধরা, বুক দুর্ দুর্, অনিদ্রা'।"

"জিজ্ঞেস্ করলুম, 'কি ভাল লাগে?' বল্লে, 'নীল আকাশ, আর রাঙ্গা পলাশ'।"

সুনীল মুচ্কে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাগল নাকি—মাথা খারাপ হয়ে গিছ্লো?"

"শোন তারপর—। আমি তখন সাইকলজি মতে চিকিৎসা সুরু করেচি। আশা দিয়ে বল্লুম, 'ও কিছু না—সেরে যাবে। দুচার দিন পরে এসো। আর দেখ, এর ভেতর যা স্বপ্ন দেখ্বে—লিখে নিয়ে এসো। দুদিন পরে এসে হাজির। বল্লে, 'ডাক্তার বাবু, গতরাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেচি তাই আপনাকে জানাতে এলুম। যেন—একটা নদীর তীরে বেড়াচ্চি, নদীটা ছোট কিন্তু খুব গভীর। হঠাৎ বড় গাজোন আরম্ভ হোল। নদীতে নেমে সাঁতার কাটতে লাগলুম। খানিক পরেই হাত পা অবশ হয়ে এল। তারপর জলের ভিতর তলিয়ে গেলুম। ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনও দেখি হাঁপাচ্চি।' একটু ভেবে নিয়ে এ্যানালিসিস্ সুরু করে দেখালুম, ফ্রয়েডের (Freud) মতে—স্বপ্নে ঐরূপ ভয় অপূর্ণ যৌন-লিপ্সার ফল, এসকল অস্বাভাবিক ভালবাসার লক্ষণ * * *। লালমোহন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, 'আপনি অন্তর্যামী ডাক্তার বাবু, আমায় ভাল করে দিন।' বল্লুম, 'তা দেব, কিন্তু তার আগে তোমার জীবনের সব ইতিহাসটুকু আমায় বলতে হবে—নইলে চিকিৎসা হবে কি করে?' একটু চুপ করে লালু বল্লে, 'কিন্তু ডাক্তার বাবু, একথা যেন লিক্ (leak) না করে, দেখ্‌বেন।' বল্লুম, 'ক্ষেপেচ? নির্ভয়ে বল।' অভয় পেয়ে বল্লে, 'আমি বাস্তব সাহিত্যের পূজারী। কিন্তু মায়ের পূজায় তেমন প্রেরণা আসছিল না। কোথায় যেন একটু অভাব বোধ কর্‌ছিলুম। বুঝ্‌লুম, অভাব—নায়িকার। মূর্ত্তিমতী নায়িকা না পেলে, শুধু কল্পনায় মানসী প্রতিমা গড়ে সাহিত্যে রস উদ্বোধন হয় না। কিন্তু বে করা সত্বেও আদর্শ নায়িকার অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সেই লালবাড়ীর ঝিয়ের ভেতরই আমার আদর্শ খুঁজে পেলুম; তিনিই হলেন আমার রস-উৎস রঞ্জকিনী। নিত্য নব নব রসে বাণীর বন্দনা করলুম। অথবা আমি ভুল বুঝেছিলুম। তিনি ছিলেন—বিষ-উৎস। আমার ছন্দ বন্দনা উপেক্ষা করে বাড়ীর কর্ত্তাকে তিনি বলে দিলেন। তারপর যা লাঞ্ছনা সে ত আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। সে যাত্রা আপনিই ত আমায় বাঁচিয়ে ছিলেন।' আমি হঠাৎ বলে ফেল্লুম, 'এমন জানলে—।' সে বল্লে, 'নির্দ্দয় হবেন না ডাক্তার বাবু'!"

পরাণ বাবু সক্রোধে বলিলেন, "বেটা—পাষণ্ড!"

সুনীল গর্জ্জন করিয়া বলিল, "Beastly. Damned the Realistic School."

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর—? লালমোহন বল্লে, 'তারপর—এখনও আমি সাহিত্য-সাধনাই করে থাকি। 'পরাণিয়া' বেশ ভালই চল্‌চে। প্রতিমাসে সে বহু তরুণ তরুণীর কাছে অনাগতের শাশ্বত বাণী বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার বাবু, তিনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। তিনিই আমার প্রাণপ্রিয়া—তাঁকে স্মরণ করেই আমার এই পরাণিয়া।' বুঝ্‌লুম—রিপ্রেসন (repression), বল্লুম—'বাড়ী যাও লালু, সেরে যাবে।' সে সিউরে উঠে বল্লে, 'না—

না—ডাক্তার বাবু, ওকথা বল্‌বেন না—বিবাহশৃঙ্খলে আমার বিদ্রোহী মনকে চিরদিন আমি বেঁধে রাখতে পারবো না।' বিরক্ত হয়ে বল্লুম, 'আচ্ছা—তুমি এখন এস।' বল্লে, 'ওষুধ?' 'হবে—এখন।' মনে মনে বল্লুম, 'তোমার ওষুধ লাঠ্যৌষধি।' ভগবান কি অন্তর্য্যামী? যেই ডিস্‌পেনসারী থেকে ফুটপাথে পা দেওয়া—, কয়েকটা ছোঁড়া ওত পেতে ছিল, ধরে—বেদম মার্। বলে, 'হারামজা—. রোজ বিকেলবেলা লালবাড়ীর চারদিকে ঘোরা হয় কেন? বেহায়া! নির্লজ্জ!! ইতর'!!!"

—ইতি রিয়্যালিস্‌টিক্ আর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়—

বজ্রকীট

সরল বেদান্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্ঞান-লাভের উপায়

উল্লিখিত সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারী কি কি উপায় অবলম্বন করিলে জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইবে এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে। জ্ঞান-লাভের উপায় তিনটি যথা:—(১) শ্রবণ, (২) মনন ও (৩) নিদিধ্যাসন।

'শ্রবণ' বলিতে গুরুমুখ হইতে অথবা সৎ-শাস্ত্র হইতে মহাবাক্য-শ্রবণই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। মহাবাক্য চারিটি যথা:—(১) অহং ব্রহ্মাস্মি, (২) তত্ত্বমসি, (৩) অয়মাত্মা ব্রহ্ম (৪) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ইহাদের প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করা; এবং পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভেদ—ইহা জানার নামই জ্ঞান।

সুতরাং জ্ঞানের বীজ এই মহাবাক্য-সমূহে নিহিত। প্রধানতঃ শ্রবণের দ্বারা 'মহাবাক্য-শ্রবণ' বুঝাইলেও যে সৎ-শাস্ত্র সমূহ ঐ বাক্যান্তর্গত অর্থকে দৃঢ় করে তাহাদের শ্রবণকেও শ্রবণের মধ্যে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যিনি তাঁহার শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া উহাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত 'গুরু'পদ-বাচ্য। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই গুরু-পদে সমাসীন হইবার অধিকারী। তিনি শাস্ত্রে পারদর্শী, কামনা-গন্ধ-হীন ও জ্ঞান-নিষ্ঠ হইবেন। শাস্ত্রে পারদর্শিতা না থাকিলে অপরের অজ্ঞান-প্রসূত সংশয়জাল ছিন্ন করা অসম্ভব কামনা-গন্ধ-হীন, জ্ঞান-নিষ্ঠ অহেতুক কৃপাসিন্ধুই বসন্তের মলয়ানিলের ন্যায় যথার্থ লোক-কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

জ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তির এরূপ গুরুর বিশেষ প্রয়োজন। যেমন কোন সুদূর অজ্ঞাত প্রদেশে যাইতে হইলে পথ-প্রদর্শকের সাহায্য লইতে হয়, সেইরূপ গুরুই জ্ঞান পথে পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকেন। একদিকে গুরু যেমন উক্ত-গুণ-সম্পন্ন হইবেন, অন্যদিকে শিষ্যও আবার তদ্রূপ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া গুরুর একান্ত শরণাগত ও আজ্ঞাবহ হইবেন। ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমন্বিত বিনয়াবনত শিষ্যই জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। শিষ্যের নিকট গুরু সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ। যে শিষ্য স্বীয় গুরুতে সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে জ্ঞান-লাভ বিড়ম্বনা-মাত্র। গুরুকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহ মনে করিয়া অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও আত্মনিবেদন প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অধ্যাত্ম প্রশ্ন-সমূহ জিজ্ঞাসা করিবেন। শ্রীগুরুও তখন শিষ্যের সমুদয় সংশয় ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির মার্গ দেখাইয়া দিবেন। গুরুকৃপা ব্যতীত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। চারিপ্রকার কৃপা প্রাপ্ত হইলে তবে জ্ঞান-লাভ করা যায়। উক্ত চারিপ্রকার কৃপা এই:—
(১) আত্ম-কৃপা (২) গুরু-কৃপা (৩) শাস্ত্র-কৃপা (৪) ভগবৎ-কৃপা। যতদিন আয়ু থাকিবে ততদিন শ্রীভগবান্, শ্রীগুরু ও বেদান্ত-

শাস্ত্র—এই তিনে ভক্তি-শ্রদ্ধা স্থির ও দৃঢ় রাখিতে হইবে। গুরু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার শত-সহস্র বাধা-বিঘ্ন থাকিলেও তাহার জ্ঞান-লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। 'শ্রীগুরু-কৃপয়া শিষ্য-স্তরেৎ সংসার-বারিধিম্'—গুরুকৃপাতেই শিষ্য সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

অধিকারি-ভেদে শ্রবণের তারতম্য হইয়া থাকে। উত্তম অধিকারীর পক্ষে গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণই জ্ঞানলাভের জন্য যথেষ্ট। জ্ঞানি-কুল-চূড়ামণি অষ্টাবক্র ঋষির নিকট শ্রবণমাত্রেই জনক-রাজার জ্ঞানোৎপত্তি হইল। নচিকেতার মত শ্রদ্ধালু হইলে অধিক শ্রবণের আবশ্যকতা হয় না; তত্ত্ব-বিষয়ক দুই চারিটি কথা শ্রবণেই তাহাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। মধ্যম ও অধম অধিকারীর গুরুবাক্য শ্রবণ ব্যতীতও শাস্ত্র-শ্রবণের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। ইহাদের গুরুবাক্যে স্বল্পাধিক শ্রদ্ধা হইলেও পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। ঐ স্বল্পাধিক শ্রদ্ধাকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য শাস্ত্র-শ্রবণের আবশ্যকতা।

শাস্ত্র অনন্ত। স্বল্পায়ুঃ মানবের পক্ষে সকল শাস্ত্র আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য জল-দুগ্ধ-সংমিশ্রণ হইতে দুগ্ধমাত্র-গ্রাহী হংসের ন্যায় অনন্ত শাস্ত্র-রাশির মধ্য হইতে সারবান্ শাস্ত্রগুলিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া আলোচনা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। জ্ঞান-লাভের জন্য তিন প্রকার শাস্ত্র মুখ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—উহাদিগকে 'প্রস্থান-ত্রয়' বলে। প্রস্থান-ত্রয় যথা:—(১) ন্যায়-প্রস্থান (২) শ্রুতি-প্রস্থান ও (৩) স্মৃতি-প্রস্থান।

ন্যায়-প্রস্থান—উত্তর মীমাংসাকে 'ন্যায়-প্রস্থান' বলে। ইহার অন্যান্য কয়েকটি নাম আছে, যথা:—ব্রহ্মসূত্র, শারীরক সূত্র, বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি। ইহার প্রণেতা ব্যাসদেব। সমস্ত শ্রুতির সামঞ্জস্য-বিধান করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শ্রুতি-প্রস্থান—উপনিষদ্‌সমূহই 'শ্রুতি-প্রস্থান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কলির প্রারম্ভে ইহাদের সংখ্যা ১১৮০ ছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের সকলগুলি পাওয়া যায় না। ঋক্, যজুঃ, সাম ও

অথর্ব্ব—এই চারি বেদের যতগুলি শাখা ততগুলি উপনিষৎ। ঋগ্বেদের শাখা-সংখ্যা ২১, যজুর্বেদের—১০৯, সামবেদের—১০০০, এবং অথর্ব্ববেদের—৫০, একত্রে ১১৮০, অতএব উপনিষদের সংখ্যা ১১৮০। বেদ দুইভাগে বিভক্ত;—কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। কর্ম্ম-কাণ্ডে যাগ-যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত আছে; পারমার্থিক সত্য-নির্দ্ধারণই জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্দেশ্য। শ্রুতিসমূহকেই জ্ঞান-কাণ্ড বলা হইয়া থাকে। শ্রুতি-পঠন সম্বন্ধে মুক্তিকোপনিষদের মত এই:—কৈবল্য-মুক্তি লাভের পক্ষে মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ই যথেষ্ট; ইহাতেও জ্ঞান-লাভ যদি না হয়, তবে দশখানি উপনিষদ্ পড়িবে, তাহাতেও যদি না হয় তবে ৩২ খানি পড়িবে; বিদেহমুক্তি-লাভের ইচ্ছা থাকিলে ১০৮ খানি পড়িবে। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-পাঠে জ্ঞান-লাভ না হইলে যে দশখানি উপনিষৎ পড়িবার বিধান আছে তাহাদের নাম যথা:—(১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাণ্ডুক্য (৭) ঐতরেয় (৮) তৈত্তিরীয় (৯) ছান্দোগ্য ও (১০) বৃহদারণ্যক।

স্মৃতি-প্রস্থান—গীতা ও মনু-স্মৃতি প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্র 'স্মৃতি-প্রস্থান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-স্থলে উপনিষৎ সমূহের সার অংশ একত্র করিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। ঐ উপদেশই গীতা-শাস্ত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন নহেন যে উপনিষৎ পাঠ করিয়া সহজেই উহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে গীতা-পাঠই বিধেয়। গীতায় সরল ভাষায় ও সহজভাবে উপনিষদের তত্ত্ব-সমূহ আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মনু-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করিবার নিমিত্ত বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে,—আচ্ছা, শ্রুত্যাদি শ্রবণের কথা ত বলা হইল, কিন্তু এরূপ শ্রবণের প্রকৃতপক্ষে কোন উপকারিতা আছে কি [illegible] অবশ্যই আছে। শব্দের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে —ইহা [illegible]কেই অবগত আছেন। শব্দের অদ্ভুত শক্তিকে লক্ষ্য

করিয়াই আমাদের শাস্ত্রকারগণ শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাইবেলেও লিখিত আছে,—'আদিতে শব্দই ছিল, শব্দ ভগবানের সঙ্গে থাকিত এবং শব্দই ভগবান্।' * সাধারণ ভাবে দেখিলেও শব্দের শক্তি বেশ বুঝা যায়,—কাহাকেও মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিলে তাহার সন্তোষ ও আনন্দের উদ্রেক হয়; পক্ষান্তরে, কর্কশ ভাষায় সম্বোধনে ক্রোধাদির উদ্রেক হইয়া থাকে। একজন সুপ্ত পুরুষকে 'জাগ্রত হও' বলিয়া ডাকিলে সে জাগ্রত হইয়া থাকে। এস্থলে শব্দ-শক্তিই সুপ্ত পুরুষকে জাগ্রত করিল। বেদান্তের 'তত্ত্বমস্যাদি'রূপ মহাবাক্য-শ্রবণে অনাদি মায়া-নিদ্রায় মগ্ন জীব স্বরূপোপলব্ধিতে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে।

এই শ্রবণের ফল আবার বিশেষরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে যদি উপনিষদের বাণী কোন মহাপুরুষের মুখ হইতে নির্গত হয়। মহাপুরুষেরা ব্রহ্মচর্য্যপালন ও ভগবচ্চিন্তনের দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাক্যসমূহ তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় বলিয়াই উহারা সমধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে। আবার পঠন হইতে শ্রবণ শ্রেয়ঃ,—ইহা অনেকেই জানেন। এইজন্য যখনই কোন মহাপুরুষের মুখ হইতে তত্ত্ব-কথা শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই উহা সর্ব্বপ্রযত্নে গ্রহণীয়।

সৎ-শাস্ত্রের পরিমিত শ্রবণ উপকারী হইলেও অত্যধিক শ্রবণ অধিকাংশ সময়ে উপকার না করিয়া অপকারই করিয়া থাকে। শ্রবণে অধিক সময় ব্যয়িত হইলে, মনন ও নিদিধ্যাসনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে না। অথচ, শ্রবণ অপেক্ষা মনন শ্রেয়ঃ এবং মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন শ্রেয়ঃ। এইজন্য যখন নিদিধ্যাসন বা মননের সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন উহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণে কালাতিহরণ করা উচিত নহে। জ্ঞান-লাভ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে শাস্ত্রালোচনা করিলে উহাতে বিদ্যাভিমান নাম-যশের স্পৃহা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া অনর্থের হেতু হইয়া থাকে।

---

* 'In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God'

—St. John I. I.

"বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশলম্‌।
বিদুষাং বৈদুষ্যং তদ্বৎ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥"
[বিবেক-চূড়ামণি]

শ্রুতি-বিরুদ্ধ শাস্ত্রের শ্রবণ অবিধেয়। পারমার্থিক সত্য-নির্দ্ধারণে শ্রুতিই একমাত্র প্রমান। স্মৃত্যাদি শাস্ত্র যেখানে শ্রুতি-বিরোধী সেখানে উহা বর্জ্জনীয়।

শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কামভাবে শাস্ত্রালোচনা করিলে যথাকালে উহার যথার্থ মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ) নিঃসঙ্গানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথা

৬ই জুলাই, মঙ্গলবার

স্থান—কাশী রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রম, স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরের বারান্দা।

সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা চারিদিকে বসে আছেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বল্‌তে লাগ্‌লেন—

যতই খারাপ সংস্কার নিয়ে আসুক না কেন, সৎসঙ্গে লোক ভাল হয়ে যায়। যেমন আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। সাধুসঙ্গ কি করে লোক? করতে কি পারে যে-সে? ঠাকুর কথা বল্‌ছেন, ভক্তেরা শুন্‌ছে—তাদের সঙ্গীরা কিন্তু কানে কানে বল্‌ছে, "চলনা, আর কত শুন্‌বে?" ওরাও উঠছে না দেখে শেষে বলছে,—"তোমরা থাক, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি।" ঠাকুর এই বিষয়টা আমাদের কাছে কি চমৎকার করেই বল্‌তেন। সৎসঙ্গের ফল ত ভাল হবেই, কারণ, একটা জীবন থেকেই আর একটা জীবনে ভাব-সংক্রমণ হতে পারে। Nothing but a round body can give a round shadow. (গোল বস্তুরই গোল ছায়া হতে পারে)। একজনের লেখা পড়ে যা হয়, তার জীবনের সংস্পর্শে আস্‌তে পার্‌লে তার চেয়ে বেশী ফল হয়।

বক্তৃতা শুনা আর বক্তৃতা পড়া কত তফাৎ! লেখাতেও আবার যে যত প্রাণ ঢেলে দিতে পারে, তার লেখা পড়ে তত ফল হয়। স্বামিজীর লেখা আর আমাদের অন্যান্য স্বামীদের লেখা! Personality (মানুষটাই) হচ্ছে আসল জিনিষ। গোটা কতক মানুষই জগৎটা চালাচ্ছে, আর সব ভেড়া। স্বামিজী পৃথিবীটা ঘুরে এসে বল্লেন, Democracy-র (গণতন্ত্রের) মাথামুণ্ড নেই—দু চার জন লোকই কাজ চালাচ্ছে। দেশ যখন কাজ চালাবার উপযুক্ত লোক দিতে না পারে, তখনই গোল্লায় যায়। আমাদের ত ধর্ম্মপ্রাণ দেশ। আমাদের দেশ বরাবর Saints produce (সাধুপুরুষ প্রসব) করে আস্‌ছে। ইতিহাসে এমন একটা সময় দেখিয়ে দাও, যখন আমাদের দেশে এটি হয়নি। এক একটা জীবন কত শত বৎসর কত লোককে চালাচ্ছে। দেখ না,—নানক, কবীর। দেখ, তুলসীদাস কতদিন থেকে এ দেশটা চালাচ্ছে।

আজ একটি মেয়ে এসেছিল,—কালনার—সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। ঠাকুরের কথাবার্ত্তা হোল। তাদের বাড়ী বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে গিছল। ওর স্বামীর ভাই বি, এ, পাশ করে গ্রামে স্কুল কর্‌ছে—নিজে কিছু টাকাকড়ি নেয় না। দেশে একটা spirit (ভাব) এসে গেছে। সময় লাগবে সত্য, কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একটা নাড়াচাড়া পড়েছে। জন-নায়করা আর এখন আগেকার মত রেখে-ঢেকে বল্‌ছে না—একটা প্রবল জন-মত থাক্‌লে শুধু গায়ের জোরে শাসন-যন্ত্র পরিচালন শক্ত ব্যাপার।

গায়ে উই পড়ায় বলিলেন,—

এ সময় সর্ব্বত্রই জীবজন্তু-পোকা ইত্যাদি খুব বেশী জন্মায়। এই জন্যই শাস্ত্রে চাতুর্ম্মাস্যের বিধি আছে—বর্ষার সময়টা চারমাস সাধুদের একস্থানে বাস কর্‌তে বলেছে। আমি ভ্রমণের সময় অনেকবার এইরূপ চাতুর্ম্মাস্য করেছি। একবার পুষ্করে ছিলাম। "পুষ্করং দুষ্করং তীর্থম্" ভারি সুন্দর স্থান—বড় একান্ত। বড় আনন্দ হোত। চাতুর্ম্মাস্যের সময় মুনিরা সকলে এক জায়গায় থেকে পাঠাদি করতেন। আবার আট মাস তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। ও সময় বের হতেন না। জীবজন্তু মারা যাবে বলে।

ইউরোপে চার্চ্চিয়ানিটী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আলোচনা ও উপসংহার

প্রোটেস্‌টাণ্টগণ বলিল,—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে বিশপ বা আর্চ্চ-বিশপগণ যে সমস্ত বিধান দিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই অযৌক্তিক, তাহাদের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, সুতরাং ভাল করিয়া বিচার বিবেচনা না করিয়া খৃষ্টান-সমাজ কি করিয়া তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে? ক্যাথলিকগণ বলিল,—সে কি কথা? পোপ বা বিশপ যে, ভগবানের প্রতিনিধি, তাঁহার কথা যে অভ্রান্ত, তাঁহাকে অবিশ্বাস করিলে যে ভগবানকেই অবিশ্বাস করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার কথা কি বিচার করিয়া দেখা চলে?

প্রোটেস্‌টাণ্টগণ উত্তর করিল—যতদিন বিশ্বাস ছিল ততদিন পোপের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু বর্ত্তমানে পোপের ব্যক্তিগত জীবন ইতর সাধারণের জীবন অপেক্ষা মোটেই উন্নত নহে,—সেই অর্থ, সেই সম্পত্তি, সেই বিলাস, সেই ব্যভিচার; সুতরাং তাঁহাকে আর ভগবানের বিশেষ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা যায় কি করিয়া, এবং তাঁহার আদেশ যে অভ্রান্ত ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হয়? যুক্তি তর্ক সহায়ে ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্যাথলিকগণ গায়ের জোর চালাইলেন, প্রোটেস্‌টাণ্টগণও বাঁকিয়া দাঁড়াইল; শেষে বহু শোণিতপাতের পর প্রোটেস্‌টাণ্ট-মতবাদই জয়লাভ করিল।

প্রোটেস্‌টাণ্টগণ খৃষ্টান-সমাজে যুক্তিবাদ বা স্বাধীন মতবাদের যে আস্বাদ দিয়াছিল তাহাই আবার কিছুকাল পরে প্রোটেস্‌টাণ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। প্রোটেস্‌টাণ্ট ধর্ম্মেরও কতকগুলি creed (নিয়ম) আছে, প্রোটেস্‌টাণ্টগণকে তাহা মানিয়া চলিতে হয়, কিন্তু খৃষ্টান-সমাজের

কতকগুলি লোক বলিল, ধর্ম্মনীতি জোর করিয়া কাহারও উপর চাপাইয়া দিলে তাহাতে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তিকে পিষিয়া ফেলা হয়, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে উহা প্রচণ্ড বাধা। কারণ, তুমি বা তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা শুনিলে আমার অমঙ্গল না হইয়া যে মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং আমি আমার জীবনকে সংশয়ের পথে চালিত করিয়া কেন বিপজ্জনক করি? অতএব আমার জীবনের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমারই উপর ছাড়িয়া দাও, আমার বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা আমি নিজের জীবন চালিত করি। এইরূপ মতবাদ, সম্প্রদায়বিশেষের, দেশাচারের, ব্যক্তিবিশেষের বা শাস্ত্রের কথা না মানিয়া নিজের নিরপেক্ষ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে চায়; কতকগুলি লোকের মতে এই ভাবে চলাই সর্ব্বতোভাবে rational পথে চলা, তাই এই মত-বাদের নাম Rationalism (র‍্যাসানালিজম্)। Rationalism তিনটি জিনিষের উপর প্রতিষ্ঠিত—freedom of thought, freedom of conscience এবং freedom of action অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারে, কিসে আপনার ভাল হইবে, তাহা প্রত্যেকেরই নিজে নিজে ভাবিয়া দেখিবার অধিকার আছে এবং নিজে ভাবিয়া নিজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর বলিয়া মনে হইবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া প্রথমে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, শেষে উহা সামাজিক ব্যাপারে নামিয়া আসিল। ধর্ম্মের ন্যায় সমাজেরও কতক-গুলি নিয়ম আছে, সমাজে থাকিতে হইলে তাহা মানিয়া চলিতে হয়, তাহা না হইলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা কিন্তু স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া একদল লোক বলিল,—সমাজে সকলেই স্বাধীন, সকলের সমান অধিকার, চিন্তায় বা কার্য্যে কেহ কাহারও বাধ্য হইয়া চলিবে না; freedom of action বা কার্য্যক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার—এই জিনিস হইতেই সাম্য-নীতির উদ্ভব। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সাম্য-নীতি ফরাসী প্রজাতন্ত্রে কিরূপে equality, fraternity, liberty, বা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই

তিনটি মূল নীতির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার আলোচনা এখানে করিতেছি।

ধর্ম্মক্ষেত্রে যখন একের আধিপত্য অস্বীকৃত হইল, তখন সমাজেও সেই ঢেউ আসিয়া লাগিল, শেষে রাজনীতি-ক্ষেত্রেও রাজার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সকলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কথা উঠিল, কাহাকেও না মানিয়া সকলে নিজ ইচ্ছামত চলিলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ব্যাপারেই স্বাধীনতা পরিশেষে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে। তারপর, আমার যাহাতে ভাল হইবে, তাহাতে অন্যের অনিষ্ট হইতে পারে, অন্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, অন্যের স্বার্থে আঘাত লাগিতে পারে, সুতরাং কাহারও কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া কিরূপে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে? রুসো প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী বলিলেন,—উচ্চ-নীচ অধিকার ও অনধিকার হইতেই সংঘর্ষের উৎপত্তি, সকলেই যদি সমান অধিকার ভোগ করে, সকলেই যদি সকলকে ভাই বলিয়া মনে করে তবে আর বিরোধ কি করিয়া হইবে? এইরূপে libertyর সহিত equality ও fraternity এই দুইটি কথা তাঁহারা জুড়িয়া দিলেন। এইরূপে বর্ত্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্রের motto বা নীতি-সূত্রের সৃষ্টি হইল। তবে ইহাও স্থির হইল, যদি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় তবে তাহা মীমাংসা করিবার জন্য সামাজিক একটি চুক্তিবাদ থাকুক—ইহাই রুসোর Social Contract Theory। এই মতবাদের মূল নীতি এইরূপ—দেশের জনসাধারণ পরস্পরের স্বার্থ রক্ষার জন্য, পরস্পর মিলিত হইয়া স্বেচ্ছায় একটি সামাজিক সমবায় (Social Contract) গঠন করিয়াছে এবং পরস্পরের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় কিছু কিছু সঙ্কুচিত করিয়া সকল বিষয় নিষ্পত্তি করিবার ভার সমবায়ের পরিচালক সমবায়শক্তি বা গভর্মেণ্টের (Government) হাতে দিয়াছে। এইরূপেই প্রথম ফরাসী-প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হইল। এবং এই ভাব ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তারপর আর একদল লোক উঠিয়া বলিল,—সমবায়শক্তি বা গভর্মেণ্ট থাকিলেই উহার পরিচালন-ভার কোন এক ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির উপর পড়িবে, তাহা হইলেই ব্যক্তিবিশেষের শাসন জনসাধারণকে মানিয়া লইতে হইবে। সমবায়শক্তি থাকিলেই শক্তির অপব্যবহার হইবে, শক্তির অপব্যবহার হইলেই পীড়ন আরম্ভ হইবে। অনেক পীড়নের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহারা বলিল,—অতএব সমবায়শক্তি তুলিয়া দাও; কোনরূপ শাসন-যন্ত্র বা গভর্মেণ্ট থাকিবে না। রাজশাসন বা Archyর বিরুদ্ধে এই মতবাদের সৃষ্টি বলিয়া ইহার নাম Anarchism (এনার্কিজম)। Anarchism বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা মনে করি, Anarchism এর মূলনীতি কিন্তু তাহা নহে। উহা এই—প্রত্যেক মানবের চিন্তায় ও কার্য্যে অবাধ স্বাধীনতা হইতে মানবসমাজের সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিবে। তাহাকে শাসন করিবার জন্য কোন যন্ত্রেরই আবশ্যক নাই। মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকিলে আপনা হইতেই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে। এইরূপ মতবাদ রুষিয়ায় প্রথম প্রচারিত হইল, কিন্তু ইহার মূলনীতি বুঝিতে বা অনুসরণ করিতে না পারিয়া বহু গুপ্ত হত্যা সাধিত হইয়াছিল।

ইহা দেখিয়া সকলেই এই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারিল না। তাহারা বলিল,—সমাজ এমন অবস্থায় কখনও আসিবে না, যখন কোনরূপ শাসন-যন্ত্রের আবশ্যকতা থাকিবে না। সুতরাং Anarchism এর theory শুনিতে খুব ভাল কিন্তু কার্য্যে উহা কখনও পরিণত হইবে না। তারপর, তোমরা যখন ভ্রাতৃত্বের কথা বলিতেছ, তখন বলা যাইতে পারে, ভ্রাতৃত্ব থাকিলেই বড় ভাই ও ছোট ভাই দুই-ই আছে। বড় ভায়ের অভিজ্ঞতা ছোট ভায়ের মানিয়া লইতে দোষ কি? বড় ভাই ঠকিয়া যাহা শিখিয়াছেন, ছোট ভাই সেই কাজ করিয়া না-ঠকিয়া, বড় ভায়ের নিকট হইতে অভিজ্ঞতা লইয়া যদি বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায় তবে আপত্তি কি? কারণ, আমি নিজে যাহা আচরণ করিয়া ঠকিয়াছি, তুমি পুনরায় তাহার অনুষ্ঠানে

অথবা শক্তিক্ষয় না করিয়া তাহার পর হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে পার, আবার অন্য একজন আমার ও তোমার উভয়ের অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষালাভপূর্ব্বক তাহার পর হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়া জীবনের পথে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে। চিকিৎসক বলিলেন,—এই অসুখে এই জিনিষ খাইতে নাই। সেখানে কি রোগী নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও সেই জিনিস খাইয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে যাইবে? সেইরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যাও যিশু ও বুদ্ধের ন্যায় মহাপুরুষদের কথা সাধারণ লোককে শুনিতে হয়। তাঁহাদের সাধনলব্ধ উপদেশ শুনিলে মানব অনায়াসে কতকগুলি বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। সেখানেও মানবসাধারণ নিজ নিজ ইচ্ছামতে না চলিয়া, বুদ্ধিমান ব্যক্তির নির্দ্দেশমত চলিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমূহ মঙ্গল সাধিত হয়। জাগতিক ব্যাপারে সকলকে সমান অবস্থায় টানিয়া আনিয়া equalityকে সার্থক করিলেও মূর্খ ও বুদ্ধিমানের মনোবৃত্তিকে সমক্ষেত্রে টানিয়া আনিবে কিরূপে? তাহা সম্ভব নহে। সম্ভব না হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মূর্খের উপর প্রভুত্ব করিবেই। সুতরাং তোমাদের liberty ও equalityর আদর্শ কখনও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

যাঁহারা Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা ইহার উত্তরে বলিলেন,—

"The traditions and customs of other people are, to a certain extent, evidence of what their experience has taught them, presumptive evidence, and as such have a claim to his deference ; but, in the first place, their experience may be too narrow ; or they may not have interpreted it rightly. Secondly, their interpretation of experience may be correct, but unsuitable to him. Customs are made for customary circumstances and customary characters ; and his circumstances or his character may be uncustomary. Thirdly, though the

customs be both good customs and suitable to him, yet to conform to custom, merely as custom, does not educate or develop in him any of the qualities which are the distinctive endowment of a human being. The human faculties of perception, judgment, discriminative feeling, mental activity and even moral preference are exercised only in making a choice. He who does anything because it is the custom makes no choice. He gains no practice either in discerning or in desiring what is best for him. * * * On the other hand, it would be absurd to pretend that people ought to live as if nothing whatever had been known in the world before they came into it ; as if experience had as yet done nothing towards showing that one mode of existence, or of conduct, is preferable to another. Nobody denies that people should be so taught and trained in youth as to know and benefit by the ascertained results of human experience. But it is the privilege and proper condition of a human being, arrived at the maturity of faculties, to use and interpret experience in his own way. It is for him to find out what part of recorded experience is properly applicable to his own circumstances and character. * * * The object towards which every human being must ceaselessly direct his efforts, and on which especially those who design to influence their fellowmen must ever keep their eyes, is the individuality of power and development."

'ON LIBERTY'—*Mill.*

অর্থাৎ—"পুরুষ-পরম্পরাগত যে সব মত ও রীতিনীতি অন্য লোকে অনুবর্ত্তন করিয়াছে, কতক পরিমাণে তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় ভাল বুঝিয়াছে বলিয়াই করিয়াছে। সেগুলি বর্ত্তমানে সকলের পক্ষেই শ্রদ্ধায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও হইতে পারে, সে সব অতি সঙ্কীর্ণ এবং তাহারা হয় ত

তাহার তাৎপর্য্য ভুলও বুঝিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা ভুল না বুঝিতেও পারে, কিন্তু হয় ত তাহাদের পক্ষে সে সব উপযোগী ছিল, বর্ত্তমানে কোনও ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী নয়। তৃতীয়তঃ, সেগুলি হয় ত ভাল এবং তার পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল পুরুষ-পরম্পরাগত ও প্রচলিত রীতি বলিয়াই তাহা যদি লোকে মানিয়া লয় এবং তদনুসারে চলে, তবে মানবোচিত যে সব গুণ ও শক্তির, যে বুদ্ধির অধিকারী হইয়া সে জন্মিয়াছে, তাহার যথোচিত বিকাশ হয় না। প্রত্যেক নীতি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিয়া বাছিয়া লইবে, এই অধিকার থাকিলেই তবে মানবের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বিকাশ হইতে পারে। প্রচলিত রীতিনীতি বলিয়াই তাহার অনুবর্ত্তন যে করে, সে বুঝিয়া বিচার করিয়া কিছুই লয না, এই শক্তির অনুশীলনও তাহার কিছু হয় না। * * * কোনও এইরূপ নীতি, অন্যরূপ নীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি-না, অতীতের জ্ঞান যে এ সম্বন্ধে কিছুই একটি পথ নির্দ্দেশ করে নাই—এ কথা বলা ঠিক নহে। প্রথম জীবনে প্রত্যেক লোককে শিখাইতে হইবে, মানবের অতীত জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কি বুঝিয়াছে এবং জীবনের কোন্ সম্বন্ধে কোন্ নীতি অনুসারে চলিলে ভাল হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু মানব তাহার শক্তির পরিণতি লাভ করিলে, পুরুষ-পরম্পরাগত অতীতের জ্ঞানকে ও সেই জ্ঞাননির্দ্দিষ্ট নীতি সমূহকে নিজের নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিবে এবং নিজের জীবনের অবস্থায়, তার বিশেষ গুণ, রুচি ও শক্তির পক্ষে যাহার যতটুকু গ্রহণ করা ভাল মনে করে তাহাই করিবে। * * * সুতরাং যাঁহারা অন্যান্য মানবের জীবন বিশেষ-কোনও দিকে পরিচালনা করিতে চান তাঁহাদের, ব্যক্তিত্বের শক্তির ক্রমপরিণতি কিসে হইতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রত্যেক মানবের সকল কর্ম্মচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে।"

মিল (Mill) মানুষের অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপদেশকে একেবারে অস্বীকার না করিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেই (Individualism) সংঘবাদের উপরে রাখিলেন। তাহা রাখুন; কিন্তু ইহা কেহই

অস্বীকার করিবেন না যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ন্যায় সংঘবাদেরও কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। চার্চ্চিয়ানিটার কথাই ধরা যাক্। চার্চ্চিয়ানিটী শেষে বিশপ ও আর্চ্চবিশপগণের খামখেয়ালীর যন্ত্ররূপে পরিণত হইলেও ইউরোপের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। তখনকার দিনে বিদ্যাদান কাজটি সমস্তই চার্চ্চের হাতে ছিল। চার্চ্চই বহু বন্য অসভ্যজাতিকে ক্রিশ্চিয়ান করিয়া, তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া সভ্য করিয়াছে। চার্চ্চের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিলেও চার্চ্চের শাসন ছিল বলিয়াই ক্রিশ্চিয়ান সমাজ একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া—চার্চ্চ না থাকিলে ইউরোপের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য দেশেরও বহু স্থানে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম এরূপ বিস্তারিত ভাবে প্রচারিত হইত না। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ নহে। সংঘ ব্যতীত জগতের কোন স্থায়ী কাজই ব্যাপকভাবে হইতে পারে না। ধরুন, Socialism, Bolshevism, বা Communism এর কথা। এই সব মতবাদই Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অবলম্বন করিয়াই উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সমানাধিকার ও স্বাধীনতা ইহারা চায়। এই মত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইহাদের এক একটি দল বা সংঘ বা organisation আছে। Organisation থাকিলেই উহার creed (নিয়ম) আছে। creed থাকিলেই উহার সভ্যগণকে উহা মানিয়া চলিতে হয়। অনেকে বলিবেন, ঐরূপ মানা স্বেচ্ছায়। কিন্তু সকলেরই 'স্ব-ইচ্ছা' একরূপ হইতে পারে না। সংঘের 'সুবিধার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজ ইচ্ছা বর্জ্জন করিতে হয়। তবে এরূপ যদি কখনো সম্ভব হয় যে, সকলের মন ঘড়ির কাঁটার ন্যায় একই দিকে চলিবে, তবে সংঘ বা আইন কানুন ব্যতীতও জগতে অনেক বড় বড় স্থায়ী কাজ হইবে। কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব হইবে না। সুতরাং Individualismএর পুরোপুরি কার্য্যে পরিণতি কখনো হইতে পারে না। তবে এইরূপ হইতে পারে,—

"ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রধান-সংঘবাদ"

জগতে যত মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া

দেখিলে মনে হয়, সংঘের ভিতর ব্যক্তির স্বাধীনতাকেই প্রধান স্থান দেওয়া বিধেয়। যদি স্বাভাবিক ভাবেই কেহ ভাল ভাবে চলিতে পারে সে ত খুব ভাল কথা, তবে যদি দেখা যায়, ভাল করিতে যাইয়া ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেহ মন্দ করিতেছে, তখন সহানুভূতি ও প্রেমের সহিত তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে, কারণ, দেখা গিয়াছে— আইনের জোরে পীড়ন চলে, কিন্তু কাহারও স্বভাব তাহাতে পরিবর্ত্তিত হয় না, প্রেমই সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বত্র জয়ী হয়। সুতরাং আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত সংঘবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেখানে পরস্পরের সাহচর্য্য করিয়া চলে, আদর্শ প্রতিষ্ঠান সেখানেই গড়িয়া ওঠে।

(সমাপ্ত)　　চন্দ্রেশ্বরানন্দ

হে পাঠক! শ্রীভগবান্ জগদ্গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্ব্বাণী,—"যত মত, তত পথ", "সর্ব্বান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে।" মুগ্ধ হইয়া মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্য চরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া, আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই।

স্বামী সারদানন্দ

দৃষ্টি-হারা

পরিচয়

[মন একটা অদ্ভুত জিনিষ। যদিও মন আমাদেরই তবুও তার সকল বৃত্তির কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আমরা নির্ণয় করতে পারি না। কি করে আমরা জাগ্রত ভূমি থেকে ধীরে ধীরে ভুলের সাগরে ডুবে যাই—কেন স্বপ্ন দেখি—কি ভাবে স্বপনের ফলাফলের সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধ আছে—ভবিষ্যৎ-ই বা মাঝে মাঝে স্বপ্নে কি করে ফুটে ওঠে, যা কখনও দেখিনি তাই বা কেন দেখা যায়—কি করে বা এক ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায়—দেশ কাল দিয়ে যে এই জগৎ আঁকা, কোন্ ইন্দ্রিয় সে ছবির কতটা সাহায্য করে—এসব রহস্যই একটা কুহেলিকা। মেটারলিংক "Sightless"এর মধ্য দিয়ে সেই রহস্যকে প্রতিফলিত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। জন্মান্ধ, শিশুকালে অন্ধ কিশোরী, শিশুকালে অন্ধ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, অপূর্ণ আঁখি, অন্ধ বোবা, অন্ধ কালা, ইন্দ্রিয়যুক্ত শিশুর দেশ-কালিক মনস্তত্ত্ব গল্পের মধ্য দিয়ে বোঝান হয়েছে। যাঁরা না দেখে প্রিয় এবং অপ্রিয় কল্পনা করেন তাঁদের অপ্রত্যক্ষ কল্পনা কেমন মিথ্যার রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, বুঝতে পারবেন। এ গল্পটা তাঁদের একটা মস্ত শিক্ষা। এক ইন্দ্রিয় হীন হলে অপর ইন্দ্রিয় কিরূপ প্রবল হয় এবং সময় সময় অপর ইন্দ্রিয়ের কাজও তারা কেমন করে কিছু কিছু করে, তাও দেখতে পাবেন। জগতে এমন ঢের উদাহরণ আছে। যাঁরা মনস্তত্ত্বের আলোচনা করেন তাদের কাছ থেকে এর অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। আমরা পাঠক পাঠিকাকে "দৃষ্টি-হারা"র প্রত্যেক ছত্রের গভীর মনস্তত্ত্বগুলি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে পড়বার জন্য অনুরোধ করি।]

—পাত্র-পাত্রী—

বৃদ্ধসাধু, তিনজন জন্মান্ধ, স্থবির অন্ধ, পঞ্চম বৃদ্ধ অন্ধ, ষষ্ঠ বৃদ্ধ অন্ধ, উপাসনা-রত তিনজন বৃদ্ধা অন্ধ, প্রাচীনা অন্ধ, কিশোরী অন্ধ, পাগল অন্ধ স্ত্রীলোক ও তাহার শিশু।

আরম্ভ দৃশ্য

প্রাচীন বন—যেন তার সীমা নাই, উপরে নিস্তব্ধ তারকিত আকাশ। তখন মধ্য রাত্রি; সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ফাটলে পরিপূর্ণ একটা বিরাট ওক বৃক্ষের নীচে কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারী একজন বৃদ্ধ সাধু উপবিষ্ট—দেহ ও মস্তক গুঁড়িতে হেলান—মৃত্যুর মত স্থির—মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই—শাঁকের মত সাদা—ওষ্ঠ নীল ও ঈষৎ খোলা—স্থির অর্থহীন চক্ষু—দৃশ্য সে আর দেখে না—মনে হয়, কোন্ অনাদি কালের সঞ্চিত সকল দুঃখ যেন অশ্রুর মধ্য দিয়া রক্তরূপে ক্ষরিত হইয়াছে। মুখের উপর শুভ্র কেশের গুচ্ছ—সেই নিরানন্দ নিস্তব্ধ বনানীর মধ্যে সে দৃশ্য সব চাইতে উজ্জ্বল—সব চাইতে করুণ। ক্ষীণ হস্ত দৃঢ়রূপে ক্রোড়ে অঞ্জলিবদ্ধ। ইঁহার দক্ষিণে ছয়জন বৃদ্ধ অন্ধ—প্রস্তর খণ্ড, ভগ্নকাণ্ড, ও পত্রস্তূপের উপর উপবিষ্ট। বাঁদিকে সেইরূপ আর ছয়জন রমণী। মধ্যে একটা উন্মূলিত গাছ ও কয়েক খণ্ড প্রস্তর। এরাও অন্ধ—তিন জন অবিরাম উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা ও ক্রন্দনে রত—একজন অত্যন্ত বৃদ্ধা,—পঞ্চম বোবা ও পাগল—তার কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু—ষষ্ঠ কিশোরী—মাথার কেশে সর্ব্বাঙ্গ ভাসান। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের একই প্রকার সাদাসিদে পোষাক। অধিকাংশেরই দুই করতলে মুখমণ্ডল ন্যস্ত, সকলেরই অঙ্গ স্থির, বৃথা অঙ্গভঙ্গি তারা ভুলিয়া গিয়াছে। দ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রগর্জ্জনের দিকে তাদের কান নাই। ক্ষিউনারেল, ইউ, সাইপ্রেস্, উইলোর ছায়া তাদের ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সাধুর পাশে একগুচ্ছ ড্যাফোডিল ফুটিয়া রহিয়াছে। অতি গভীর অন্ধকার—তবে মাঝে মাঝে পত্রান্তরালের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক ভাসিয়া আসিয়া বনানার সে অন্ধকার তরল করিতেছে।

* * *

প্রথম। তিনি এখনও আসচেন না কেন?

দ্বিতীয়। তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।

প্রথম। আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

তৃতীয়। আমিও।

প্রথম। এখনও এলেন না?

দ্বিতীয়। আমার ত কিছুই শুনচি না।

তৃতীয়। আশ্রমে ফিরে যাবার বোধ হয় সময় হয়েচে?

প্রথম। আমরা জানিতে চাই আমরা কোথায়?

দ্বিতীয়। তিনি যাবার পর থেকে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেচে।

প্রথম। আমরা জানতে চাই, আমরা কোথায়?

স্থবির। কেউ কি জানতে পারচ, আমরা কোথায়?

প্রাচীনা। আমরা যখন অনেকক্ষণ হেঁটে এসেচি, তখন নিশ্চয় আশ্রম থেকে অনেক দূরে।

প্রথম অন্ধ। মেয়েরা আমাদের ঠিক উল্টো দিকে।

স্থবির। আমরা ঠিক তোমাদের উল্টো দিকে বসে আছি।

প্রথম। দাঁড়াও, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। (সে উঠে হাতড়াতে লাগলো) তোমরা কোথায়? কথা বল, তবে ত শুনবো তোমরা কোথায়?

প্রাচীনা। এই যে এখানে আমরা পাথরের উপর বসে আছি।

প্রথম। (সামনে যেতে গিয়ে গাচে হোঁচট খেলে) আমাদের মাঝখানে কিছু রয়েচে।

দ্বিতীয়। আমাদের যে যেখানে আছে সেইখানেই থাকা উচিত।

তৃতীয়। তোমরা কোথায় বসে? তোমরা কি আমাদের কাছে আসতে চাও?

প্রাচীনা। আমরা দাঁড়াতেই সাহস করি না।

তৃতীয়। তিনি আমাদের তফাৎ করে রাখলেন কেন?

প্রথম। মেয়েদের দিক থেকে আমি প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ বৃদ্ধা তিনজন প্রার্থনা করচে।

প্রথম। এখন ত প্রার্থনার সময় নয়।

দ্বিতীয়। প্রার্থনা করতে হয় মন্দিরে গিয়ে।

(কিন্তু বৃদ্ধা তিনজন তাদের প্রার্থনা থামালে না)

তৃতীয়। আমি কার পাশে বসে ?

দ্বিতীয়। বোধ হয় আমি তোমার পাশে।

(তারা চারিপাশে হাত্‌ড়াতে লাগলো)

তৃতীয়। আমরা কেউ কাউকে ছুঁতে পারচি না।

প্রথম। তবুও পরস্পর আমরা বেশী দূ'রে নেই। (সে হাত্‌ড়াতে লাগলো, তারপর ছড়ি দিয়ে দূরত্ব ঠিক করতে গিয়ে পঞ্চম অন্ধের মাথায় আঘাত কর্‌লে, সে 'উঃ' ক'রে উঠ্‌লো যে শুনতে পায়না সেই আমাদের পাশে বসে।

দ্বিতীয়। আমি সকলকে শুনতে পাচ্চি না। কিন্তু আমরা ছিলুম ছজন।

প্রথম। দাঁড়াও আমি বের করচি। মেয়েদের জিগেস করে ব্যাপারটা জানা দরকার হয়েচে তিনজন মেয়ের প্রার্থনা এখনও শোনা যাচ্চে—তারা কি সব একসঙ্গে বসে?

স্থবির। তারা একখানা পাথরে আমার পাশে বসে আছে।

প্রথম। আমি শুকনো পাতার উপর বসে।

তৃতীয়। সেই কিশোরী কোথায় ?

প্রাচীনা। যারা উপাসনা করচে তাদের কাচে।

দ্বিতীয়। সেই পাগলী আর তার ছেলে কোথায় ?

কিশোরী। সে ঘু'মাচ্চে, তাকে জাগিও না ..

প্রথম। তুমি কত দূরে ? আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাদের সামনে বসে।

তৃতীয়। আমা'দের যতটুকু জানা দরকার, তার কিছু কিছু আমরা জানতে পারচি, এখন সাধু না ফেরা পর্য্যন্ত আমরা গল্প করি।

প্রাচীনা। তিনি বলে গিয়েছিলেন নীরবে অপেক্ষা করতে।

তৃতীয়। আমরা ত আর মন্দিরে বসে নেই।

স্থবির। আমরা কোথায় তা জানি না।

তৃতীয়। কথা না বল্‌লে আমার ভয় করে।

দ্বিতীয়। সাধু গেলেন কোথায় ?

তৃতীয়। আমাদের অনেকক্ষণ তিনি ছেড়ে গিয়েচেন।

প্রথম। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েচেন। আমার বোধ হয়, তিনি মাঝে মাঝে দেখতে পান না—কিন্তু তিনি তা স্বীকার করবেন না, ভয়—পাছে অপর কেউ এসে আমাদের অধিকার করে বসে। সন্দেহ হয়, তিনি খুব কমই দেখতে পান। আমাদের আর একজন অভিভাবক হওয়া উচিত। তিনি আমাদের কথায় কানই দেন না। এত লোক সামলাবেন কি করে? সমস্ত বাড়ীর মধ্যে তিনি ও তিনজন ভিক্ষুণী কেবল দেখতে পান এবং তাঁদের সকলেরই আমাদের চেয়ে বয়স হয়েচে। আমার বোধ হয়, তিনি আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে এসেচেন। এখন রাস্তা খুঁজে মরচেন। গেলেন কোথায়? তাঁর এরকম করে আমাদের ফেলে রাখবার কোনও অধিকার নেই।

স্থবির। বোধ হয় অনেক দূর গিয়েচেন। মেয়েদের হয়ত বলে যেতে পারেন।

প্রথম। হু—এখন তা হলে তিনি কেবল মেয়েদের সঙ্গেই কথা বলেন, কেন আমরা কি বেঁচে নেই?—এ বিষয়ে অভিযোগ করা উচিত।

স্থবির। কাকে করবে?

প্রথম। তা জানি না—কিন্তু দেখব একবার। তিনি কোথায় গিয়েচেন?—আমি মেয়েদের জিগেষ করচি।

প্রাচীনা। অনেক ঘুরে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খানিক এখানে বসেও ছিলেন—দিন কতক ধরে বোধ হচ্ছিল—তিনি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েচেন—আর তাঁর মনটাও খারাপ—সেই ডাক্তার মরার পর থেকে। নির্জ্জনে থাকেন—কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। আজ আমাদের বাইরে বেরবার জন্যে খুব তোড় জোড় করলেন—বললেন, আজ বেশ রোদ—শীতের পূর্ব্বে দ্বীপটা একবার শেষ দেখা দেখেনি। বোধ হচ্চে, এবার শীত খুব বেশী হবে—এখন থেকেই উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়তে আরম্ভ হয়েচে। তিনিও একটু ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, বলছিলেন, কদিনের ঝড়ে নদী নালা সব ভরে গিয়েচে সমুদ্দুর দেখলে ভয় করে। ঢেউএর তুলনায় তীরের

পাহাড়গুলো ছোট। তিনি বল্‌লেন, আমি একবার নিজে দেখে আসি কিন্তু আর কিছুই বল্‌লেন না—বোধ হয় ঐ পাগলীর জন্যে রুটী আনতে গিয়েচেন। বলেছিলেন, অনেক দূরে যেতে হবে—তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা কর।

কিশোরী। যাবার পূর্ব্বে আমার করমর্দ্দন করেছিলেন—সে সময় তাঁর হাত কাঁপছিল—তারপর আমায় চুম্বন করে চলে গেলেন...

প্রথম। হুঁ—

কিশোরী। আমি তাঁকে জিগেষ করেছিলুম, কি হয়েচে? তিনি বল্‌লেন, কি যে ঘটবে—তা কিছু আমি জানিনে। বোধ হয়, বৃদ্ধের রাজত্ব শেষ হয়ে এসেচে...

প্রথম। এর মানে?

কিশোরী। বুঝতে পারলুম না। বল্‌লেন, আলোক স্তম্ভের দিকে যাচ্চি...

প্রথম। এখানে আলোক স্তম্ভ আছে নাকি?

কিশোরী। হাঁ, এই দ্বীপের উত্তর দিকে। আমার বোধ হয়, আমরাও তার বেশী দূরে নেই। তিনি বলেছিলেন, স্তম্ভের জ্যোতিঃ তিনি দেখতে পাচ্চেন। তার আলো প্রত্যেক পত্রে এসে পড়েচে। আজকের মত এত দুঃখিত তাঁকে আর কখনও বোধ করিনি। আজ কদিন ধরে তিনি কাঁদতেন, কেন তা জানিনে—না দেখতে পেয়েও আমার কান্না এল—কিন্তু তাঁর এখান থেকে যাওয়া ত শুনতে পাইনি। তাঁকে আর কোন প্রশ্নও করিনি। আমি তাঁর গম্ভীর মুখে মৃদু হাঁসি শুনতে পেলুম—আর শুনতে পেলুম, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু নিমীলিত করে নীরব হয়ে গেলেন...

প্রথম। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের তো কিছু বলেননি।

কিশোরী। তিনি যখন কথা বলেন তোমরা কিছুই শোন না...

প্রাচীনা। তিনি যখন কথা বলেন তোমরা সকলে তখন গজর গজর কর।

দ্বিতীয়। যাবার সময় তিনি বলেছিলেন—বিদায়...

তৃতীয়। বোধ হয় অনেক রাত হয়েচে।

প্রথম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবার পূর্ব্বে তিনি দু তিন বার—বিদায়—বলেছিলেন। বোধ হল যেন ঘুমুতে যাচ্চেন। যখন তিনি—বিদায়—বল্লেন, তখন আমার দিকে চেয়েই বলেছিলেন। যখন কেউ আমার দিকে চেয়ে কথা বলে তার স্বরের পরিবর্ত্তনে আমি বুঝতে পারি।

পঞ্চম। হে ভগবান! রক্ষা কর।

প্রথম। ওরকম 'এঁ্যা' 'য়োঁ' কর্‌চে কে?

দ্বিতীয়। বোধ হয় যে-শুনতে পায় না।

প্রথম। থাম, এখন ভিক্ষে কর্‌বার সময় নয়।

তৃতীয়। খাবার আনবার জন্যে তিনি কোথায় গিয়েচেন?

প্রাচীনা। সমুদ্রের দিকে।

তৃতীয়। তাঁর বয়সের লোক ওরকম ভাবে সমুদ্রের দিকে যেতে পারে না।

দ্বিতীয়। আমরা কি সমুদ্রের কাচে?

প্রাচীনা। একটু স্থির হও, তা হলেই শুনতে পাবে।

(নিকটে সমুদ্রের শব্দ—পাহাড়ের দিক নিস্তব্ধ)

দ্বিতীয়। আমি কেবল তিনজনের প্রার্থনাই শুনচি।

প্রাচীনা। ভাল করে শোন, তাহলে ওর মধ্যেই শুনতে পাবে।

দ্বিতীয়। হ্যাঁ, নিকটেই কি একটা শুনতে পাচ্চি।

প্রাচীনা। ঠিক যেন ঘুমিয়েছিল, এখন যেন জেগে উঠেচে।

প্রথম। আমাদের এখানে নিয়ে আসা তাঁর খুবই অন্যায় হয়েচে। আমি ও-শব্দ শুনতে চাই না।

প্রাচীনা। তোমরা ত ভাল করেই জান যে দ্বীপটা খুব ছোট, আর আশ্রমের পাঁচালের বাইরে এলেই সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়।

দ্বিতীয়। আমি কিন্তু কখন শুনিনি।

তৃতীয়। আজ যেন বোধ হচ্চে—ঠিক আমাদের পাশেই গর্জ্জে গর্জ্জে উঠ্‌চে, এত কাচে গর্জ্জন বড় সুবিধের নয়।

দ্বিতীয়। আমিও তাই বলি। তা ছাড়া আমরা ত বাইরে আসতে চাইনি।

তৃতীয়। আমরা কখন এতদূর আসিনি। এখানে এসে আমাদের কি হোল ?

প্রাচীনা। আজ সকালটা বড় সুন্দর ছিল, শীতের পূর্ব্বের শেষ রশ্মিটুকু উপভোগ করবার জন্যে তিনি আমাদের বেড়াতে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর ত সেই সারা শীত আশ্রমে আবদ্ধ থাকতে হবে...

প্রথম। আমার বাবা, আশ্রমই ভাল।

প্রাচীনা। তিনি বলেছিলেন, তোমরা এই দ্বীপে বাস কর এর সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা উচিত। তিনি নিজেও সব দেখেন নি। এখানে নাকি একটা পাহাড় আছে—তার ওপর কেউ কখন ওঠেনি, উপত্যকা আছে—কেউ কখন নামেনি, গুহা আছে—তাতে এ পর্য্যন্ত কেউ কখন যায়নি। তিনি বলেছিলেন, কেবল ছাদে রোদ না পুইয়ে, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে রোদ পোয়ান ভাল। তিনি আমাদের সমুদ্রের ধারেও নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ; কিন্তু গেলেন একলা।

স্থবির। তিনি ঠিকই করেছেন।—বাঁচতে হবে ত ?

প্রথম। কিন্তু দরজার বাইরে গেলেও ত কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয়। আমরা কি এখন রোদ্দুরে ?

তৃতীয়। এখনও কি সূর্য্যের কিরণ আছে ?

ষষ্ঠ। আমার বোধ হয় অনেক রাত।

দ্বিতীয়। এখন আন্দাজ কটা ?

অপরে। কি জানি ? কি করে জানব ?

দ্বিতীয়। এখনও আলো আছে ? (ষষ্ঠ অন্ধের প্রতি) তুমি কোথায় গেলে ? তুমি ত একটু একটু দেখতে পাও।

ষষ্ঠ। আমার বোধ হচ্ছে এখন অন্ধকার। যখন সূর্য্যের আলো থাকে, তখন আমি একটা নীল রেখা দেখতে পাই, সেটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলুম, কিন্তু এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।

প্রথম। আমার খিদে পেলেই, আমি বুঝতে পারি রাত হয়েচে।

তৃতীয় অন্ধ। একবার আকাশের দিকে তাকাও দিকি, যদি কিছু দেখা যায় (সকলেই মাথা তুল্‌লে, কিন্তু যারা জন্মান্ধ তারা মাটীর দিকেই তাকিয়ে রইল)

ষষ্ঠ। আমরা আকাশের তলায় কিনা বুঝতে পাচ্চিনা।

প্রথম অন্ধ। আমাদের কথার প্রতিধ্বনি হচ্চে। বোধ হয় আমরা গুহায়।

স্থবির। সন্ধ্যে হয়েচে বলে বোধ হয় প্রতিধ্বনি হচ্চে।

কিশোরী। আমার বোধ হচ্চে, আমার হাতে চাঁদের আলো পড়েচে...

প্রাচীনা। আমার বোধ হয় তারা উঠেচে, আমি কানে তা বোধ করচি।

কিশোরী। আমিও...

প্রথম। আমি তাদের কোন শব্দ শুনতে পাই না।

দ্বিতীয়। আমি সকলের নিশ্বাস শুনতে পাই।

স্থবির। মেয়েরা বোধ হয় ঠিক।

প্রথম। তারাদের আমি কখন শুনিনি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়। আমরাও না।

(পত্রান্তরালে এক ঝাঁক পাখীর অবরোহন শব্দ)

দ্বিতীয়। শোন শোন, আমাদের মাথার উপর কি বুঝতে পাচ্চ?

স্থবির। আকাশে কিছু চলে গেল।

ষষ্ঠ। আমাদের মাথার উপর কি নড়চে, কিন্তু ছোঁয়ার বাইরে।

প্রথম। কিসের শব্দ কিছু বুঝতে পাচ্চি না—আশ্রমে যেতে পারলে বাঁচি।

দ্বিতীয়। আমরা কেমন জায়গায় বল দেখি?

ষষ্ঠ। একবার দাঁড়াবার চেষ্টা কর্‌লুম—চারিপাশে কাঁটা, হাত বাড়াতেও সাহস হয় না।

তৃতীয়। আমরা জানতে চাই, আমরা কোথায়?

স্থবির। জানবার কোনও উপায় নেই।

ষষ্ঠ। আমরা আশ্রম থেকে অনেক দূরে। কেন না একটুও শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্চে না।

তৃতীয়। অনেকক্ষণ ধরে শুকনো পাতার গন্ধ পাচ্চি।

ষষ্ঠ। যখন চোক ছিল তখন আমাদের ভেতর কেউকি এ দ্বীপ দেখেচে? সে কি এখন বল্‌তে পারে আমরা কোথায়?

প্রাচীনা। আমরা যখন এখানে আসি তখন সকলেই অন্ধ।

প্রথম। আমাদের ত কখন দৃষ্টিই ছিল না।

দ্বিতীয়। বৃথা ব্যস্ত হয়ে দরকার নেই। তিনি ত এক্ষণি ফিরবেন, আমরা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমরা আশ্রমের বাইরে যাচ্চি না।

স্থবির। আমরা ত আর একলা বাইরে যেতে পারি না।

প্রথম। একলা কেন, আমরা আর বাইরেই যাব না।

দ্বিতীয়। আমাদের ত আর বাইরে আসবার ইচ্ছা ছিল না, কেউ বলেও নি।

প্রাচীনা। আজ ছুটির দিন। ছুটির দিন ত বরাবরই বেরোন হয়।

তৃতীয়া। আমি ঘুমোচ্ছিলুম—তিনি আমার পিট চাপড়ে বল্‌লেন—ওঠ, ওঠ, সময় হয়েচে, সূর্য্যি উঠেচে। আমি কখনও সূর্য্যি দেখিনি, সূর্য্যি আছে নাকি?

প্রাচীনা। আমি যখন খুব শিশু ছিলুম, তখন সূর্য্যি দেখেছিলুম।

স্থবির। আমিও—সে অনেক দিনের কথা—আমি তখন কেবল শিশু—এখন সূর্য্যি ঠিক মনে করতে পারি না।

তৃতীয়। সূর্য্যি উঠ্‌লেই তিনি আমাদের বেরোবার জন্যে বলেন কেন? তার সম্বন্ধে আমাদের কারই বা বেশী জ্ঞান। আমি ত দিন দুপুর বা রাত দুপুর কিছুই বুঝতে পারি না।

ষষ্ঠ। আমার দুপুরে বেড়াতেই ভাল লাগে। সেই সময় আমার বোধ হয় খুব উজ্জ্বল। চোকও প্রাণপণে ফোটবার চেষ্টা করে।

তৃতীয়। আমার আশ্রমে বসে আগুন পোহাতেই ভাল লাগে। আজ বোধ হোল, সকালে একটা মস্ত আগুন করা হয়েছিল…।

দ্বিতীয়। উঠোনে রোদ পোহালেই ত হোত। বেশ পাঁচীলের মধ্যে, বাইরে বেরোবার জো নেই, ভয়েরও কোন-কিছুই নেই—কারণ, দোর বন্ধ। আমি সেই জন্যে সর্ব্বদা দোর বন্ধ করে রাখি—তুমি আমায় ছুঁলে কেন?

প্রথম। আমি তোমাকে ছুঁই নি। তুমি আমার ছোঁয়ার বাইরে।

দ্বিতীয়। আমি নিশ্চয় বল্‌চি, কে আমাকে ছুঁয়েচে।

প্রথম। আমরা কেউ না।

দ্বিতীয়। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

প্রাচীনা। হায় ভগবান! আমরা কোথায়?

প্রথম। অনন্ত কাল ধরে আমরা এখানে অপেক্ষা কর্‌তে পারি না।

(দূরে ঘড়ীতে ১২টা বাজিল)

প্রাচীনা। ওই ত ঘড়ী শোনা যাচ্চে। আমরা আশ্রম থেকে তা হলে কত দূরে?

স্থবির। রাত দুপুর হোল।

দ্বিতীয়। না—দিন দুপুর—কেউ ঠিক করে বল না?

ষষ্ঠ। তা ঠিক জানিনে, তবে বোধ হয়, আমরা কোন ছায়ার নীচে।

প্রথম। কিছুই বোঝা যাচ্চে না। আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম।

দ্বিতীয়। বড় ক্ষিদে পেয়েচে।

অপরে। হাঁ, ক্ষিদেও পেয়েচে, তেষ্টাও পেয়েচে।

দ্বিতীয়। এখানে কি আমরা অনেকক্ষণ আছি?

প্রাচীনা। আমার বোধ হচ্চে যেন কত যুগ কেটে গিয়েচে।

ষষ্ঠ। এইবার যেন বুঝতে পারচি, আমরা কোথায়…

তৃতীয়। যেথানে বারটা বাজল, আমাদের সেখানে যেতে হবে।

(অন্ধকারে পত্রমধ্যে পক্ষীদের কলরব)

প্রথম। শোন—শোন—

দ্বিতীয়। আমরা তা হলে একলা নেই।

তৃতীয়। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলুম কেউ আমাদের কথা লুকিয়ে শুনচে—তিনি ফিরে এসেচেন নাকি ?

প্রথম। কিসের শব্দ কিছু বুঝতে পারচি নে—কিন্তু আমাদের মাথার ওপরে·· ···

দ্বিতীয়। আর কেউ কিছু শুনতে পাচ্চ ?—তোমরা সব চুপ করে থাক।

স্থবির। শব্দটা এখনও শোনা যাচ্চে।

কিশোরী। আমি পাখা শুনচি .

প্রাচীনা। হায় ভগবান। আমরা কোথায় ?

ক্রমশঃ　　　　শ্রীপ্রভাতা দেবী

নামানুরাগ

ধর কত নাম　ওহে ভগবান্!　পূরাতে ভকত মনের সাধ,
আদরে সোহাগে　যে নামে যে ডাকে　সে নামে সে লভে সুধার স্বাদ।
নামের ভিতরে　আপন শকতি　হে নামী! নিহিত করেছ তুমি,
নাহি কালাকাল　স্মরণে রসাল　নাচে যে রসনা ও নাম চুমি।
সহজ সরল　নাম নিরমল　করুণার তব নাহিক ওর,
হোল না হোল না　অনুরাগ কণা　কপালের দোষে সে নামে মোর।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

সমালোচনা

অনাগত—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তি-স্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ডসন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। রিয়ালিস্টিক্ উপন্যাস। মানুষের ভিতর আজীবন দুঃখের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব, ত্যাগ, তপস্যা, দেশ ও সমাজসেবা তথা—স্নেহ, করুণা, ভালবাসা ও প্রেমের প্রকাশ রহিয়াছে গ্রন্থকার প্রকৃত শিল্পীর মত তাহা ফোটাইয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাসের ভিতর লালসার চিত্র জড়িত আছে বটে তবে তাহা নগ্ন-বাস্তবতা নহে এবং সেগুলির উপর সোনালী রং ফলাইয়া অপরিণত-বুদ্ধি নর-নারীর চক্ষে উহাকে সুন্দর প্রতিপন্ন করিবার হীন প্রয়াস নাই -যাহা কদর্য্য, অনৈতিক ও অভদ্র তাহাকে ঠিক সেইরূপেই দেখান হইয়াছে। ভদ্রলোকের পড়িবার মত উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আজকাল বিরল—'অনাগত'সেই অভাব পূর্ণ করিবে।

'অনিন্দিতা'—প্রকৃতই অনিন্দিতা। আপনার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ 'নরেশের' কামনাপূর্ণ প্রেম-নিবেদন ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়া বীরহৃদয়, উচ্চমনা ও দরিদ্রযুবক 'কিশোর'কে পতিরূপে মনোনীত করিয়া সে দেখাইল—নারীর সংযম কতখানি, দুর্ব্বলকে সে কত ঘৃণা করে, মহৎকে সে কত ভালবাসে। 'অনিন্দিতা'র দাদা 'মোহিত' নির্দ্দোষী 'কিশোর'কে রক্ষা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজে ধরা দিয়া, নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া দেশের কাজে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিল ; আর তাহাতে সমর্পিতচিত্ত 'প্রতিমা' তপস্বিনী 'শবরী'র মতই আজীবন তাহার দেবতার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল—ইহা বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। 'মোহিত' মহাপ্রাণ যুবক ; তবে যে, দেশের কাজে সে নিজের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিল, রাজনীতির দিক দিয়া তাহা কতখানি সমীচীন—ইহা বিচার্য্য। 'নরেশ'ও দেশকর্ম্মী, তবে শেষে 'অনিন্দিতা'র রূপে মুগ্ধ হইয়া নীচ ষড়যন্ত্রের সাহায্যে স্বার্থ-সাধনে প্রয়াসী ; 'অনিন্দিতা' তাহার নীচতা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিল। 'নরেশে'র চরিত্র ঘৃণ্য তবে পাঠকের মনের উপর একখানি করুণার ছায়া ফেলিয়া যায়। আর 'কিশোর'—সে তো চিরকিশোর! মানুষের নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও জরাখিন্ন জড়ত্বের উপর যেন তাহার কচিমুখ, বিশাল বুক, সবল বাহু ও দীপ্ত চক্ষু চির-উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের উড়িষ্যা বন্যা-কার্য্যের হিসাব

আমরা গত ১০ই ডিসেম্বর দেহুড়দা কেন্দ্রে কম্বল বিতরণ কার্য্য শেষ করিয়া উড়িষ্যার বন্যা-সেবা কার্য্য বন্ধ করিয়াছি। হাঁসপট কেন্দ্রের কার্য্যও গত ৫ই ডিসেম্বর শেষ হইয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উড়িষ্যার বন্যায় আমাদের ১০১৭৫৻১৫ খরচ করিতে হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদাদ্বারা ৫৯৬১॥/১০ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফণ্ড হইতে ২২৩৯৵৫ লইয়াও মিশনের অন্য তহবিল হইতে ১৮২৫॥১৫ ধার লইতে হইয়াছে। ইহাতে প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফণ্ডের তহবিল শূন্য হইয়াছে। এই ফণ্ড হইতে টাকা লইয়াই প্রথমে আমরা সেবাকার্য্য আরম্ভ করি; কাজেই ইহাতে টাকা না থাকিলে ভবিষ্যতে সেবাকার্য্য চালান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট নিবেদন করিতেছি যে, উড়িষ্যা বন্যার জন্য আমাদের যে ধার হইয়াছে, তাহা শোধ করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে আমরা সেবাকার্য্য চালাইতে পারি, তাহার জন্য প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফণ্ডে সাহায্য করিয়া, আমাদের দরিদ্র-নারায়ণ সেবা-কার্য্যে সহায়তা করুন।

জমা—চাঁদাদ্বারা প্রাপ্ত—৫৯৬১।/১০, দ্রব্য বিক্রী ১৪৮৶৫, প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ২২৩৯৵৫, মিশনের অন্য তহবিল হইতে প্রাপ্ত ১৮২৫॥১৫। মোট—১০১৭৫৻১৫।

খরচ—চাউল ৮৭.৪।৴.০, অন্য প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ৯৶৴৫, থলে ৯৬।০, মাল সরবরাহ খরচ—৩৩৪।১৫, যাতায়াত খরচ ২৪৫॥৴১০, সাজসরঞ্জাম ৬৯।/০, সেবকদিগের খরচ—(৯ জন সেবক) ৩৪৮।৴১০, পাচক, চাকর ইত্যাদির খরচ—৮৯৶৵০, ষ্টেশনারী ১২৶১০, পোষ্টেজ ৫১॥১৫, ঔষধ ১৪৶/০, কম্বল ১৬৬৻৫, আর্থিক সাহায্য ৪।৴৫। মোট—১০,১৭৫৻১৫।

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

সংঘ-বার্ত্তা

১। বিগত ২৯শে পৌষ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব বেলুড় মঠে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে পূজা, পাঠ, গান ও রুদ্র-যাগের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে—প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা। অপরাহ্নে—মঠ প্রাঙ্গণে সভাস্থলে স্বামিজীর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দিল্লী, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গলোর, কাশী, বেদান্তসমিতি (কলিকাতা), রেঙ্গুন, কোয়ালালামপুর, (এফ, এম, এস) প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আমরা জন্মতিথি-উৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।

২। বিগত ২রা পৌষ পূজ্যপাদ স্বামী নির্ম্মলানন্দজীর চট্টগ্রামে শুভাগমন উপলক্ষে তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত নর-নারী উপস্থিত থাকিয়া স্বামিজীর নিকট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে স্বামিজী একটি মনোরম বক্তৃতা দেন।

৩। দিল্লীতে—শ্রীশ্রী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী শর্ব্বানন্দ বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মুখে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। কৃষ্ণনগর-বাসীর আহ্বানে, স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ ও স্বামী হরিপ্রেমানন্দ তথায় গিয়াছিলেন। বিগত ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারী দুইটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিন, জনসভায় স্বামী বাসুদেবানন্দ ও স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দেব-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন, সভা হইয়াছিল স্থানীয় টাউন-হলে। স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ "সেবা ও শিক্ষা এবং তাহাদের আদর্শ" পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে স্বামী বাসুদেবানন্দ দীর্ঘকালব্যাপী সুচিন্তিত বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে

স্থর্পণখার চিত্র দেখে সীতা ভীত হয়ে পড়ায় রামচন্দ্র বলেছিলেন—অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে! চিত্রমেতৎ।—অয়ি বিয়োগভীতে! এ ছবি—তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন্ধু! তোমারও ভয়ের কোনও কারণ নেই। এই যে গোটাকতক ছোঁড়ায় মিলে নবরসিকদের নকড়া ছকড়া করচে—এর সঙ্গে তাদের family matter এর কোনও সংস্রব নেই—এ সব তাদের শিল্প-সাহিত্যের Hero Heroineদের নিয়েই হচ্ছে। তোমরা ত খুব Herbert Spencerএর ভক্ত, তাঁর কথাটা স্মরণ আছে—"আত্মরক্ষার চাইতে দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম"?—বিবেকানন্দের দলেরা এটা খুব মানে। তুমি ত বঙ্কিমবাবুর নাম করলে নাল-ঝোল খেয়ে যাও—বল যে তিনি হলেন নবীন বাংলার সাহিত্য-গুরু।—সেই গুরুরও গুরুঠাকুর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্যে চার প্যারা উপদেশ করেন, (১) স্ত্রীব প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার ওপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম; অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত। (২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীব সাধ্য নহে; কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতি-প্রীতিকে পাশব-বৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখ-সাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা—ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতি-প্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নচেৎ ইহা নিষ্কাম ধর্ম্ম নহে।

শিষ্য তখন তত পরিপক্ক হয়নি, সেই জন্যে গুরুঠাকুরের কথায় চুপ করেছিল। এখন নিজের বল বুঝতে পেরে তাল ঠুকে এসে বল্‌লে, গুরু-দেব! "যুদ্ধং দেহি।" পুরুষ যদি স্ত্রীর গয়না কেড়ে নিয়ে race খেলতে পারে, টাকার জন্যে গরিব কন্যার বাপকে সর্ব্বস্বান্ত করতে পারে, তবে স্ত্রীলোকেরা রঙ্গমঞ্চে বা মেলায় অর্থোপার্জ্জন না করবে কেন? তথা "ধনলোভে পিশাচীরা পুত্র-কন্যা বিক্রয়" নাই করবে কেন? বংশ-মর্য্যাদার ভয়ে যদি পিতা "দেবদাসে"র সর্ব্বনাশ করতে পারে, তবে সেই মর্য্যাদা ভয়ে স্ত্রীলোকও শিশুত্যাগ না করবে কেন? চরণামৃত-ধারিণী সতী ঘরে থাকতেও যদি পরদাররত পুরুষ হয় তবে "কামুকী কামাতুরা হইয়া" গৃহত্যাগ না করবে কেন? নীতি আওড়ালেই কি হয়—পালন করবে কে? গুরুঠাকুর তার ত কিছুই হদিস্ দিতে পারেন নি? ঐ যে গুরুঠাকুর আর তাঁর যে আদর্শ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, এখনকার নব্য রসিকরা তাঁকেই যে তাদের Theoryর একটা example করে তুলেচে আর গুরুঠাকুরের চারি শীল যা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করেচি—কচ্ কচ্ করে কেটে দিচ্চে। আহুদী যুগের সয়তান বাইবেল পড়েনি কিন্তু এখনকার সয়তানদের ভট্টাচার্য্য মশাইদের চাইতে শাস্ত্রে দখল যে ঢের বেশী! রুশের এক ম্লেচ্ছ নাকি একখানা dictionary করেচে তাতে বেদের কোন্ জায়গায় কোন্ শব্দ কতবার ব্যবহার হয়েচে এবং তাদের অর্থই বা কি—লেখা আছে, আর আমাদের পূজ্যপাদ পণ্ডিত মশাইরা নারায়ণের স্নানে যে কটি বেদের মন্ত্র লাগে তাও জানেন না।

তুমি কি বলতে চাও ধর্ম্ম টর্ম্ম সব উঠিয়ে দিতে হবে? আমি কি তাই বলচি? তবে তোমরা যাকে ধর্ম্ম বল—এই ধর ১নং পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস, ২নং দেব-দেবীতে বিশ্বাস ৩নং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ৪নং নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস, ৫নং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধই ধর্ম্ম প্রভৃতি পুরে

মত আর (১) কাঁন্টের Religion is morality (নীতিই ধর্ম্ম) (২) ফিক্তের, Religion is knowledge (জ্ঞানই ধর্ম্ম) (৩) সিয়ের মেকরের Religion is absolute dependence on something—(আত্মসমর্পণই ধর্ম্ম) (৪) হেগেলের Religion is or ought to be perfect freedom (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ধর্ম্ম) (৫) মোক্ষ মূলরের Religion is a subjective faculty for the apprehension of the infinite—(অনন্তকে উপলব্ধি করবার বৃত্তিই ধর্ম্ম) (৬) টেলারের Spiritual Beings (লোকাতীত চৈতন্য) (৭) মিলের Strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal (আদর্শের নিমিত্ত আন্তরিকতা) (৮) সালীর Ecce Homoতে Religion is culture (অনুশীলনই ধর্ম্ম) প্রভৃতি পশ্চিমে মত—এতে আজ কাল আর চিঁড়ে ভেজে না। মানুষ চায় সেই বৃত্তিটি যা মানুষকে দেব ও পশু থেকে পৃথক করে রেখেচে; সেটা হচ্চে—মানুষের মনুষ্যত্ব। সেটার বিকাশ ত্যাগে ও প্রেমে, বুদ্ধে ও চৈতন্যে, একীভূত ভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে। যত বড়ই Novelist হোক তার নীতির ধর্ম্ম চির কাল অ-চল রবে, যত বড়ই কবি হোক তার মর্ম্মের কথায় কেউ বেদনা বোধ করবে না, যতদিন না মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে ঐ মনুষ্যত্বের দুটো ধারার শান্তি আস্বাদ না করতে পারবে। নচেৎ চোখ বুজলেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ!

ধর্ম্মের সঙ্গে যদি সহানুভূতি না থাকে, তবে সে ধর্ম্ম অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। মনু মহারাজ বলচেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

(১২।১১৩)

যুক্তিহীন শাস্ত্রে ধর্ম্মহানি হয়। এ কথা মেনে নিলেও, সহানুভূতি-রহিত যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মও লোকে মানে না। এই দেখ না, শঙ্কর-ধর্ম্মের চাইতে যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম মানুষ অদ্যাবধি সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু সেই ধর্ম্মীরা ব্রহ্মের প্রতীক কুলি-শূদ্রদের যেমন ঘৃণা করে তেমন

আর কেউ করে না—এখন তাদের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মবাদ কে শুনবে? স্মার্ত্ত ত নস্যিতে কসে দম দিয়ে বললেন, বর্ণ-সংকর ভাল নয়,—ভগবান গীতায় বলেচেন। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর একটা ব্যবস্থা কর যাতে তাদের মধ্যে বর্ণ-সংকর না ঢোকে। পাকা গেরস্ত ছেলের দর এমন চড়িয়ে রেখেচে মেয়ের বাপ তার দিকে তাকাতেই সাহস করে না—বা এক একটা সমাজে ছেলে বা মেয়ের সংখ্যা এত কম যে প্রজাপতির তাড়নায় ব্রাহ্মণের মেয়েকে শূদ্র বর বেছে নিতে হচ্চে বা ছেলেদের নায়াব-বংশের পবিপোষণ কবতে হচ্চে। অকেজো ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়ে সত্য যুগের এক ব্রাহ্মণ জাতি এখন লাক্ কতকে এসে দাঁড়িয়েচে, বোধ হয় আর ৫০।৬০ বছর পর ব্রাহ্মণ জাতটাকে Red Indianদের মত Preserve করতে হবে। ঐলুষ কবষ, সত্যকামের মত ব্রাহ্মণ যদি সৃষ্টি না করতে পার ত ব্রাহ্মণ জাতির আর কয়েক শতাব্দীতেই ইতি।

স্মার্ত্তজী ব্যবস্থা দিলেন, বাড়ির বাইরে বেরুলেই নারীকে দুশ্চরিত্রা বলে জানবে, লেখা পড়া একেবারেই শেখাবে না, কিন্তু এমন অবস্থা-চক্রে এসে আমরা পড়েচি যে, ৫০৲ টাকার কেরাণী গোটা ছয়েক মেয়ে নিয়ে গুরুদেবের প্রথম শ্লোকটি কিছুতেই মেনে চলতে পারে না—মানতে গেলে হয় অসৎ উপায় আর নয় উপবাস। তাই ডাক্তার-কুল-ধুরন্ধর প্রথম উপায়টাই অবলম্বন করবার জন্যে নভেল লিখেচেন, আর সেকালে বাৎস্যায়নও নাকি ঐ জন্যে কলাবিদ্যে শিখে রাখবার উপদেশ দিয়েচেন—দুর্ভিক্ষাদি অসময়ে কাজে লাগতে পারে।

ব্যাপারটা কি জান? ব্যবহারিক রাজ্যে যা কিছু আইন কানুন সবই মানুষের করা। 'হিংসা ছাড়া যজ্ঞ হয় না', 'হিংসা কোরো না', 'সতীত্ব' ও 'দ্রৌপদীত্ব' প্রভৃতি মতবাদ সবই কালের ইতিহাসে লেখা আছে। যার যত দিন আয়ু সে তত কাল রাজত্ব করে। সব মতই কতকগুলো মানুষে মিলে যাতে সকলের মঙ্গল হয় এই ভেবেই করে। কিন্তু আইন করবার সময় exception গুলোর কথা একে-

যায়েই ভুল হয়ে যায়—যেমন জন্মের আইন হিসাবে বেদব্যাস একজন exception, সহানুভূতি ছিল বলে ব্যাসকে religious aristrocrat দের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল, সহানুভূতির অভাবে যবন হরিদাস যবনই রয়ে গেল, তবে এইটুকু দয়া দেখান হল যে গোলকে গিয়ে ঠিক তিনি ব্রজলালের সঙ্গে বিহার করতে পারবেন—সমাজ এ pass-port খানি তাঁর হাতে কৃপা করে তুলে দিয়েছিলেন। যিনি গোলকের অধিপতি তিনি কিন্তু বল্লেন, "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" কে যবন, কে হিন্দু?—নির্ণয় করে মানুষ—জগৎপতি নয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই।

একজন intellectual wrestler বল্লেন, আমি প্রত্যাদেশ পেয়েচি বা ব্রহ্মা বা শিব তাঁকে বলে পাঠিয়েছেন—"এর নাম কাঁটা আর এর নাম পথ।"—এই কাঁটা রাস্তায় ছড়ান রইল, তোমাদের মঙ্গলের জন্যে বলচি, সাবধান! রাস্তায় কাঁটা আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—অন্য রাস্তাই যদি না বলে দিতে পার, তবে দয়া করে রাস্তায় কাঁটাগুলো ছড়িয়ে রাখলে কেন? দোষের মধ্য দিয়ে যে নির্দ্দোষ শিশু জন্মাল তাকে যদি দয়া করে স্নেহের বক্ষে তুলে নাও তাহলে ত অনেক নরনারী নৃশংস পাপ থেকে বিরত থাকে আর Orphanage খুলে ধর্ম্মও সঞ্চয় করতে হয় না। গঙ্গাস্নান করলে যদি মুসলমান-ধর্ষণের হাত থেকে হিন্দু নারী নিস্তার পেত, তা হলে যাট কোটি হিঁদু কি আজ বাইশ কোটি হোত, না তাদেরই বংশধরেরা আজ বাপ পিতামহের প্রতিমা ভাঙত!

আর একদল বলচেন, পাপ করে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু motiveটা যেন ভাল থাকে। বাপ খেতে পায় না তাই মেয়ে অসৎ বৃত্তি নিয়েচে, ক্ষতি কি? বাঁচাটাই ত আগে। নিষ্ঠুর সমাজের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই তার এই প্রচেষ্টা, এতে দোষ কি? আরে বেকুব! তার বাপকে খেতে না দেওয়া যেমন সমাজের নিষ্ঠুরতা, মেয়েটার অসৎ উপায় অবলম্বন করাটাও ত সমাজের তেমনি নিষ্ঠুরতা। একটা নিষ্ঠুরতার উপশম করতে গিয়ে যে আর একটা নিষ্ঠুরতাকে

বাড়িয়ে দেওয়া হচ্চে—বাপ বাঁচচে বটে কিন্তু মেয়েটা ত মল! একটা নারী দশের উপভুক্ত হলে সেটা কি তার বাঁচা? একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও দশটাকে যে নারকী করা হোল তার জন্যে দায়ী কে? লেখক?—না—সমাজ? পাপটাকে পুণ্য বলে ধরবার চেষ্টা না করে লেখক যদি নভেল ছাপানর খরচটা বাপকে দিতেন তা হলে মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্যে বই লেখার দরকারই হোত না। তবে হ্যাঁ, ঐ রকম ব্যাপার না ঘটালে ঔপন্যাসিকের রোজগার হয় না। নইলে কোন্‌টা ভাল—শরীরে জঘন্য ব্যাধির সৃষ্টি করে সারা ভাল, না—রোগ না হতে দেওয়াই ভাল? সমাজের দয়ার দিকটা উদ্রেক করে বই লিখলেই ত ও-ব্যাধিটার উপশম হতে পারে। মেয়েটি যদি শিক্ষিতা হোত, গৃহস্থ কুলবধূর চাকরি করাটা যদি সমাজে পাপ না হোত, তা হলে ত শিক্ষয়িত্রী হয়ে, Nurse হয়ে, সেলাইয়ের কাজ করে, Governess হয়ে, তার বাপ মা ও পঙ্গু স্বামীকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারতো। ব্যভিচারের দ্বারা তার অভাব মেটাতে হয় না বা তাকে defend করবার জন্যে বইও লিখতে হয় না।

তুমি কি নরের দুর্ব্যবহারে প্রত্যেক নারীকে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে উত্তেজিত হতে বল? না—তা বলি না। যাঁরা পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের অযথা লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাঁদের মঙ্গলে সচেষ্ট, প্রেম ও স্নেহ বিতরণে অকাতরা, তাঁরা যথার্থই ধন্যা। তাঁরাই জগন্মাতা, উমার সাক্ষাৎ প্রতীক; তাঁদেরই সংযমে, ত্যাগে, তপস্যায়, জ্ঞানে, প্রেমে প্রাণী জগতের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ মানব-সমাজ গড়ে উঠেচে। নইলে মানুষ ও পশু দুই এক হয়ে যেত। কিন্তু সে সংযম যখন সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় তখন পতিতকে একেবারে ফেলে না দিয়ে তার মনের ব্যাধিটা সারিয়ে তুলে নেওয়াই ভাল। Orphanageএর দরজায় একটা কচি শিশুকে গোপনে ফেলে দিয়ে গেল, ও দেশ হলে কোনও অপুত্রক বাপ মা তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলে করে নিত। সকলের মত ঐ নির্দোষ শিশুরও সমাজে একটা স্থান হোত। আর যেখানে Orphanage নেই

সেখানে হত্যা অবশ্যম্ভাবী। আবার যেখানে Orphanage আছে অথচ সমাজ-শাসন অতি তীব্র, সেখানে শিশু বাঁচে বটে কিন্তু চিরকাল তার ললাটে কলঙ্কের চিহ্ন আঁকা থাকে যার জন্যে তাকে বিদ্যালয়ে, সভায়, সমিতিতে, উৎসবে, পারিবারিক জীবনে, সমাজে মাথা নীচু করে রাখতে হয়।—কেন?—কার পাপে? তাই স্বামিজী অনেক ভেবে চিন্তেই বলেছিলেন—যে জাতের ভিতর বিবাহের আদর্শ খুব উঁচু সেখানে গণিকার সংখ্যাও বেশী, আবার যে জাতের বিবাহের আদর্শ নেই সেখানে গণিকাও নেই। আমাদের কিন্তু আদর্শ বদলালে চলবে না, তবে পুরুষদের বেলায় আমরা যে সহানুভূতিটা দেখাই, স্ত্রীলোকদের বেলাও সে সম্বন্ধে ভাববার জন্যে সুধি-সমাজকে আমরা অনুরোধ করি। "পাবনায়" বিপর্য্যস্ত হওয়ার পূর্ব্বেই "গঙ্গা স্নানের" ব্যবস্থাটা হওয়া ভাল নয় কি?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(৪)

(ইংরাজির অনুবাদ)

আবু পাহাড়

১৮৯১

প্রিয় জি, এস—

মন যে দিকেই যাক্, জপ করে যাও। হরবক্সকে বোলো যেন সে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রাণায়াম অভ্যাস কোর্‌তে আরম্ভ করে * * * সংস্কৃত শিখ্‌তে খুব চেষ্টা কোর্‌বে।

তোমার প্রেমাবদ্ধ—

বিবেকানন্দ

(৫)

[জনৈক ইংরাজ শিষ্যকে লিখিত পত্র হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত]

(ইংরাজির অনুবাদ)

সুইজারল্যাণ্ড, ১৮৯৬

দুনিয়াটা একটা ছেলে-খেলা—বক্তৃতা করা, শিক্ষা দেওয়া সবই। "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ;" যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁকেই সন্ন্যাসী বলে জেনো। যেখানে দুঃখ, ব্যাধি ও মৃত্যু নিত্যই ঘটচে সেই সংসাররূপ পচা ডোবাতে আর কি কাম্য বস্তু থাকতে পারে? "যিনি সমস্ত বাসনা ত্যাগ করেচেন তিনিই সুখী।"

এই সুন্দর স্থানে, এই বিশ্রাম ও অনন্ত শান্তির মাঝখানে আমি এই ভাবের কিছু কিছু আভাস পাচ্চি। * * * ইন্দ্রিয়গণ বলবান, সাধককে তারা টেনে নাবিয়ে দেয় ; তাই কঠোর সংগ্রামশীল সাধকের মধ্যেও অতি অল্পই লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। * * * "সাধু জগৎ" "সুখী জগৎ" "সামাজিক উন্নতি" এ সবই "সোণার পাথর বাটি।" যদি ভালই হোত তবে আর সংসার বলে কেন? সূক্ষ্মকে স্থূলের মধ্যে—অনন্তকে সান্তের মধ্যে প্রকাশ করবার জন্যে আত্মা ভ্রান্তি বশে চেষ্টা কোরচেন্, শেষে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন ও মুক্ত হতে চেষ্টা করেন। এই যে পশ্চাদ্বর্ত্তন—এখানেই ধর্ম্মের আরম্ভ, আর তার সাধনা—অহং-এর নাশ—এরই নাম প্রেম। স্ত্রী পুত্র বা অপর কারুকে ভালবাসাটা প্রেম নয়। নিজের কাঁচা আমিটাকে ছেড়ে দিয়ে সকলের জন্যেই যে-ভালবাসা—তাকেই বলে প্রেম।

দুনিয়ায় শুনতে পাবে—"মানব-জাতির উন্নতি" প্রভৃতি অনেক রকমের বোকামি, কিন্তু এ সব বাজে কথায় ভুলো না। একদিকে অবনতি না হলে অপর দিকে উন্নতি হতে পারে না।

আমাদের সমাজে এক রকম, আবার অন্য সমাজে আর এক রকমের দোষ দেখবে। বিভিন্ন যুগেও সেই রকম বিভিন্ন দোষের প্রাবল্য। মধ্য যুগে ডাকাতের প্রাধান্য ছিল, এখন জোচ্চোরের দল

বেশী, কোন যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বিশেষ উঁচু থাকে না, আবার কোন যুগে ঐ আদর্শ খুব উঁচু থাকার দরুণ বেশ্যাবৃত্তি প্রবল হয়ে দাঁড়ায়, কোন সময়ে শারীরিক দুঃখ বেশী, আবার কোন সময়ে মানসিক কষ্ট তার সহস্র গুণ।

জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই। মাধ্যাকর্ষণ, আর সব রকমের মত ও বাদ কি প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই—তবে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে আর বিশেষ লাভ হোল কি? আমেরিকার আদিম অধি-বাসীদের চেয়ে তোমরা কি বেশী সুখী হয়েচ? সব জিনিষই বাজে, ভুয়ো—এইটে জানার নামই ঠিক ঠিক জ্ঞান, কিন্তু খুব কম লোকই তা জানতে পাবে। "ত্বমেবৈকং জানথ আত্মানং, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ," সেই একমাত্র আত্মাকেই জানো, অন্য বাক্য ত্যাগ কর। সমস্ত জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের পর শেষে এই জ্ঞানটা দাঁড়ায় যে, জগৎটা কিছুই নয়, সুতরাং আমাদের একমাত্র কাজ হচ্চে, সমগ্র মানব-জাতিকে সম্বোধন করে বলা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—ওঠ, জাগ, যতদিন না লক্ষ্য স্থলে পৌঁচুচ্চ ততদিন অগ্রসর হতে বিরত হয়ো না। ধর্ম্ম মানে—ত্যাগ, আর কিছুই নয়, শুধু ত্যাগ।

তোমাদের—

বিবেকানন্দ

(৬)

(ইংরাজির অনুবাদ)

লণ্ডন, ১৮৯৬

চিকাগো মহামেলার অঙ্গস্বরূপ মহাসভার বিরাট্ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে মিঃ সি, বনি যে উপযুক্ত সহকারী নিযুক্ত

---

* ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষীয় বক্তৃতা সমূহ আরম্ভ করিবার অনতিপূর্ব্বে এই খ্যাতনামা অতিথিকে দেশবাসীর সহিত পরিচিত এবং তাঁহাকে যথোচিত ভাবে অভ্যর্থিত করিবার জন্য স্বামিজী 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় (কলিকাতা) এই পরিচয় ও অনুরোধ-পত্রখানি প্রকাশ করেন। উপরোক্ত পত্রটি তাহার কতকাংশের অনুবাদ।

করেছিলেন—তিনিই ডাঃ ব্যারোজ এবং তাঁর নেতৃত্বে যে মহাসভার (ধর্ম্ম মহাসভা) অধিবেশন হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

ডাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহসিকতা, অদম্য কার্য্যকারিতা, অবিচল সহনশীলতা ও সহজ ভদ্রতা এই মহাসভাকে সাফল্য মণ্ডিত করেছিল।

বিস্ময়কর চিকাগো মহাসভা হতেই, ভারতবর্ষ—তার অধিবাসী ও চিন্তারাশি, জগৎসমক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েচে এবং এই জাতীয় কল্যাণের জন্যে সেই সভায় সকলের চেয়ে ডাঃ ব্যারোজের কাছেই আমরা বেশী ঋণী।

তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধর্ম্মের পবিত্র নাম নিয়ে, মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নাম নিয়ে আস্‌চেন এবং আমার বিশ্বাস—ন্যাজারেথের মহাপুরুষ-প্রচারিত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা অতিশয় উদার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত কোরবে। ঈশা-শক্তির বিকাশ ইনি ভারতে আনতে চান; তবে নিজের জিনিষ ছাড়া আর যা কিছু সবই ঘৃণা এরূপ অনুদার ও প্রভুত্ব-প্রিয় ভাব নিয়ে নয়; ভাইয়ের মত, ভারতের উন্নতিকামী বিভিন্নদলের সহকর্ম্মীর মত আগ্রহবান হৃদয়ে তিনি তাঁর কাজ কোর্‌তে চান। অধিকন্তু, আমাদের যেন মনে থাকে কৃতজ্ঞতা ও আতিথেয়তাই ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য; আমার দেশবাসীর কাছে এই অনুরোধ—পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্রলোককে তাঁরা এমন ভাবে গ্রহণ করুন, যেন আমাদের এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতর—ভারত যখন আর্য্যভূমি ছিল, তার ঐশ্বর্য্যের কথা যখন জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফির্‌তো—সেই অতীত যুগের হৃদয় এখনও আমাদের মধ্যে তেমনি জাগ্রত রয়েচে—একথা তিনি যেন বুঝতে পারেন।

বিবেকানন্দ

বৈদিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ঋগ্বেদীয় যুগ]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়ে আমি ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ঋগ্বেদোক্ত প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করি নাই। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাহা করিব।

১। সরস্বতী নদী

প্রথমে সরস্বতী নদীর উল্লেখ করা যাউক। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে সরস্বতীর এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।

রায়শ্চেতন্তী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতংপয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥"

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—'নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা, গিরি অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত গমনশীলা একা সরস্বতী নদী নাহুষের (প্রার্থনা) অবগত হইয়াছিলেন। ভুবনস্থ বহুল ধন প্রদান করতঃ তিনি নাহুষের জন্য ঘৃত ও দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন।' *

---

* ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ। সায়ণাচার্য্য এই ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন :—"সহস্রবৎসরেণ ক্রতুনা যক্ষ্যমানো নাহুষো নাম রাজা সরস্বতীং নদীং প্রার্থয়ামাস। সা চ তস্মৈ সহস্রসম্বৎসর পর্য্যাপ্তং পয়ো ঘৃতঞ্চ প্রদদৌ। অয়মর্থোঽত্র প্রতিপাদ্যতে। নদীনামন্তাসাং মধ্যে শুচিঃ শুদ্ধা গিরিভ্যঃ সকাশাৎ আসমুদ্রাৎ সমুদ্র-পর্য্যন্তং যতী গচ্ছতী একা সরস্বতী নদী অচেতৎ নাহুষস্য প্রার্থনামজ্ঞাসীৎ।

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, যখন ইহা রচিত বা আবিষ্কৃত হয়, তখন সরস্বতী নদী হিমালয়ের পাদমূল হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হইতেন। সেই সময়ে সরস্বতী নদীগণের মধ্যে কেবল যে শুচি বা শুদ্ধা ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি নদীগণের মধ্যে বলবতীও ("অসুর্য্যা নদীনাম্" ঋগ্বেদ ৭।৯৬।১) ছিলেন। তিনি প্রভূত জল বহন করিয়া আনিতেন ("মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা" ঋগ্বেদ ১।৩।১২)। তিনি মৃণাল খননকারীর ন্যায় প্রবল ও বেগবান্ তরঙ্গ সহকারে পর্ব্বতসানুসকল ভগ্ন করিতেন (ঋগ্বেদ ৬।৬১।২) এবং ঋষিগণ তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেন:—"হে সরস্বতি, তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। তুমি আমাদিগকে হীন করিও না। অধিক জলদ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদিগের বন্ধুত্ব ও গৃহ স্বীকার কর। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি।" (ঋগ্বেদ ৬।৬১।১৪, রমেশ-বাবুর অনুবাদ)। এই সরস্বতীকে "নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু" অর্থাৎ 'আমাদের প্রিয়তমা', "সুজুষ্টা" অর্থাৎ 'প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যক্‌রূপে সেবিতা' ("সুষ্ঠু পুরাতনৈর্ঋষিভিঃ সেবিতা"—সায়ণ) এবং "সপ্তস্বসা" অর্থাৎ 'সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনী-সম্পন্না' বলা হইয়াছে (ঋগ্বেদ ৬।৬১।১০)। অন্যত্র তিনি "অম্বিতমা" ('মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা'), "নদীতমা" ('নদী-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা') এবং "দেবিতমা" ('দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা') বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সরস্বতীর উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার যুগে সরস্বতী একটি মহতী ও প্রচণ্ড-বেগবতী

তথা ভুবনস্য ভূতজাতস্য ভূয়েৰ্ব্বহুলস্য রায়ো ধনানি চেতন্তী প্রজ্ঞাপয়ন্তী প্রযচ্ছন্তী নাহুষায় রাজ্ঞে ঘৃতং পয়শ্চ সহস্রসম্বৎসর-ক্রতোঃ পর্য্যাপ্তং দুদুহে দুগ্ধবতী দত্তবতী।" নাহুষ রাজা যে সহস্র-বৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সায়ণ তাঁহার টীকায় পৌরাণিক কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। নাহুষ রাজা যে সরস্বতীতটে সুদীর্ঘ-কালব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে।

নদী ছিলেন, এবং আর্য্যগণ তাঁহার তীরে বাস করিয়া যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন। সরস্বতী তাঁহাদের এরূপ প্রিয়তমা নদী ছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার তটভূমি ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী অপকৃষ্ট স্থানে বাস করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সরস্বতী একটি শীর্ণা ও ক্ষুদ্রকায়া নদী মাত্র। দেখিয়া মনে হয় না যে, ইনিই সেই প্রাচীন কালের প্রখ্যাতা সরস্বতী নদী। ইনি হিমালয়ের অধঃ-প্রদেশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পঞ্জাব-দেশান্তর্গত কুরুক্ষেত্র প্রদেশের নিকটে প্রবাহিত হইয়া রাজপুতানার মধ্যে বিকানীরের উত্তর ভাগে অবস্থিত মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে বিলুপ্তা হইয়া গিয়াছেন। সেই স্থান হইতে সমুদ্র এখন প্রায় পাঁচ ছয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে শত শত মাইল ব্যাপিয়া সরস্বতীর পরিত্যক্ত প্রাচীন গর্ভের একটি চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে বালুকাচ্ছন্ন। সরস্বতীর জলরাশি সেই প্রাচীন খাত দিয়া আর প্রবাহিত হয় না। সরস্বতী প্রাচীন কালের ন্যায় বেগবতীও নহেন; সুতরাং বালুকাস্তূপ ভেদ করিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে অসমর্থা। এইরূপ হইবার কারণ কি? ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনা-যুগের পরবর্ত্তী কালে জল-স্থল-সন্নিবেশের নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে স্থানে এখন মরুভূমি অবস্থিত, সেই স্থানে পুরাকালে সমুদ্র ছিল, এবং ভূকম্প বা অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণে সমুদ্রের তলভাগ উত্থিত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সম্ভবতঃ আধুনিক বিকানীর, যশল্মীর ও ভাওলপুর প্রদেশসমূহ ঋগ্বেদের যুগে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল, অথবা তাহাদের সন্নিহিত প্রদেশে সমুদ্র ছিল, এবং দৃষদ্বতী নদীর সহিত সম্মিলিত সরস্বতী নদী, এই সমুদ্রেই নিপতিত হইতেন, যাহার উল্লেখ ঋগ্বেদের ৭।৯৫।২ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় যুগের পর ভীষণ ভূকম্পের ফলে সমুদ্রের তল সমুত্থিত হইলে, বেগবতী সরস্বতী নবোত্থিত ভূভাগের বালুকাময় স্তূপ-দ্বারা প্রতিহত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে একটি

নূতন খাত খনন করিয়া ও পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া কচ্ছ সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া থাকিবেন। পরে নবোত্থিত মরুভূমির বালুকারাশি বাত্যাতাড়িত হইয়া সেই খাত পূর্ণ করিয়া দিলে, এবং নানা কারণে সরস্বতীর বেগও মন্দীভূত হইলে, তিনি সেই বালুকারাশি ঠেলিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এইরূপে বেদবিশ্রুতা ও প্রাচীন ঋষিগণ-সেবিতা বেগবতী সরস্বতী নদী কালক্রমে শীর্ণা হইয়া একটি সামান্য নদীতে পরিণত হইলেন।

২। সপ্তসিন্ধুদেশে শীতঋতুর প্রাধান্য

সরস্বতী নদী হিমালয়ের অধোভাগে অবস্থিত সিরমুর নামক প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়াছেন। প্রাচীনকালে সপ্তসিন্ধুদেশে শীতঋতুর এরূপ প্রাধান্য ছিল যে, ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে বৎসরের নাম "হিম" বা "হেমন্ত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে *। বৎসরের মধ্যে আট দশমাস কাল ব্যাপিয়া যদি হিম-ঋতুর প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে বৎসরকে উক্ত নামেই অভিহিত করা স্বাভাবিক। ঋগ্বেদের কোনও কোনও মন্ত্রে বৎসরের নাম "শরৎ"ও দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্দ্বারা এইরূপ অনুমান হয় যে, সপ্তসিন্ধুদেশের কোনও কোনও স্থানে শরৎকালের ন্যায় নাতিশীত-নাতিগ্রীষ্ম ঋতুও বর্ত্তমান ছিল †। সম্ভবতঃ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে এইরূপ ঋতুর এবং হিমালয়ের সন্নিহিত স্থানসমূহে শীতঋতুর প্রাধান্য ছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, পুরাকালে সত্যসত্যই সপ্তসিন্ধু বা পঞ্চনদদেশে দারুণ শীতঋতুর আবির্ভাব ছিল, এবং হিমালয়ের অধঃপ্রদেশসমূহও তুষারাচ্ছন্ন ও তুষারক্ষেত্রসমূহে (glaciers) পরিব্যাপ্ত ছিল ‡। সরস্বতী হিমালয়ের যে প্রদেশ

---

* ঋগ্বেদ ১।৬৪।১৪, ২।১।১১, ২।৩৩।২, ৫।৫৪।১৫, ৬।১০।৭, ৬।৪৮।৮ ইত্যাদি।

† "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্।" ঋগ্বেদ ৭।৬৬।১৬

‡ "Many parts of the Himalayas bear the records of an *Ice-Age* in comparatively recent times. Immense accumulations of moraine *debris* are seen on the tops

হইতে নিঃসৃতা হইয়াছেন, সেই প্রদেশে, এমন কি, আধুনিক রাওলপিণ্ডীর নিকটবর্ত্তী পাটোয়ার নামক সমতলক্ষেত্রেও যে তুষারক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে সমুদ্র বিদ্যমান থাকায়, সমুদ্রোত্থিত জলীয় বাষ্পরাশি

---

and sides of many of the ranges of the middle Himalayas, which do not support any glaciers at the present time. Terminal moraines, often covered by grass, are to be seen before the snouts of existing glaciers at such low elevations as 6,000 feet or even 5,000 feet. Sometimes there are grassy meadows, pointing to the remains of old silted-up glacial lakes. These facts, together with the more doubtful occurrences of what may be termed fluvio-glacial drift at much lower levels in the hills of the Punjab, lead to the inference that this part of India, at least, if not the Peninsular highlands, experienced a *Glacial Age* in the Pleistocene period." (Wadia's *Geology of India,* pp. 15-16).

"The ice-transported blocks of the Potwar plains in Rowalpindi also furnish corroborative evidence to the same effect." (*Do.* p. 245).

"There are some curious indications of a low temperature having prevailed in the Indian area at ancient epochs. (Medlicott's *Manual of the Geology of India,* Preface p. xxi).

"In the Post-Pleistocene age, a cold climate prevailed down to low latitudes." (*Quarterly Journal of the Geological Society* vol. xxxi, 1075 pp. 534, 540).

"Evidence exists of a former far greater extensions of glaciers in the Himalaya, possibly at the period during which the great glacial phenomena of Europe occurred." (*Ency. Brit.* vol. ii., p. 68, 9th Edition).

বাত্যা-তাড়িত হইয়া হিমালয়গাত্রে তুষাররূপে এবং নিম্ন সমতল প্রদেশে ভূরি বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইত। এই কারণে হিমালয়ের তুষার-ক্ষেত্রসমূহ সৌরকরে বিগলিত ও শীর্ণ হইতে থাকিলেও, নব নব তুষারপাতে আবার পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত-কলেবর হইত। সুতরাং বৎসরের মধ্যে সকল সময়ে বৃষ্টিপাত না হইলেও, তুষারক্ষেত্র হইতে বিগলিত জলধারা দ্বারা সরস্বতীর দেহ সৰ্ব্বদা পরিপুষ্ট এবং তাঁহার স্রোতোবেগও প্রবল থাকিত। বর্ষাকালে ভূরিবৃষ্টিপাত হইলে তিনি স্ফীতা ও উচ্ছলিতা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগসমূহকে জলাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন। এই কারণে বৈদিক ঋষি একটি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে সরস্বতি, তুমি অধিক জলদ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না।" (ঋগ্বেদ ৬।৬১।১৪)

যখন সপ্তসিন্ধুদেশের সান্নিধ্য হইতে "পূর্ব্ব সমুদ্র" (যাহার কথা পরে বলিব) এবং "রাজপুতানা সমুদ্র" (যাহা রাজপুতানা প্রদেশকে সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্ত্তমান ছিল) কালক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল, এবং শেষোক্ত স্থলে প্রকাণ্ড ভয়াবহ মরুভূমি উৎপন্ন হইল, তখন সপ্তসিন্ধুদেশের জলবায়ুরও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। সপ্তসিন্ধু-দেশ একটি গ্রীষ্মপ্রধানদেশে পরিণত হইল এবং তাহার উপর সমুদ্রের প্রভূত জলীয় বাষ্পরাশি সঞ্চরণ করিতে না থাকায়, হিমালয়ের অধঃ-প্রদেশে আর তুষারপাত হইত না, এবং সেই প্রদেশের তুষারক্ষেত্র সমূহও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন সরস্বতীর স্রোত তুষারক্ষেত্র-বিগলিত জলধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্দীভূত হইয়া পড়িল, এবং ভূরিবৃষ্টিপাতের অভাবে বর্ষাকালেও আর বেগবান্ রহিল না। এই কারণে সপ্তসিন্ধুদেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নবোত্থিত মরুভূমির বালুকারাশি ঠেলিয়া সরস্বতী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না এবং বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত বিশীর্ণা ও একপ্রকার বিলুপ্তাই হইয়া পড়িয়াছেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার কল্পনা-প্রসূত নহে। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বহু গবেষণা ও আলোচনার পর এই

সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ইংরাজী বিশ্বকোষে (Encyclopædia Britannica vol ii, p688 9th. Edition) এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ের একটি পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। তাহার মর্ম্ম এই যে, পঞ্জাবের সন্নিহিত সমুদ্র তিরোহিত হইলে, ঋতুরও বিপর্য্যয় ঘটে; সেই কারণে হিমালয়ের উপর তুষারপাতের পরিমাণ অল্প হওয়ায় তুষারক্ষেত্রসমূহ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, এবং বৃষ্টির পরিমাণও অল্প হইয়া পড়ে। তাহার ফলে পঞ্জাবের ও অন্যান্য স্থানের কতিপয় নদী বিশুষ্কা ও বিশীর্ণা হইয়া যায়। আমাদের সরস্বতী নদীও যে এই কারণে বিশীর্ণা হইয়া পড়েন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩। শতদ্রুনদী

অতঃপর শতদ্রু বা শুতুদ্রী নদীর কথা বলা যাউক। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক এইরূপ :—

"ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমানে অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।
সমারাণে ঊর্ম্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যাবামন্যামপ্যেতি শুভ্রে॥"

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

'হে নদীদ্বয় (অর্থাৎ শতদ্রু ও বিপাশা), ইন্দ্র তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছেন; তোমরা তাঁহার অনুজ্ঞা বা আদেশ প্রার্থনা করিতেছ এবং রথিদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ। তোমরা পরস্পরে সংগত হইয়া একযোগে প্রবাহিত হইতেছ এবং তরঙ্গদ্বারা পরিসর-প্রদেশ প্লাবিত করিয়া শোভমানা হইতেছ।'

শতদ্রু ও বিপাশা নদীদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছেন, তাহা উপরোক্ত মন্ত্রপাঠে জানা যাইতেছে। তৃতীয় মন্ত্রেও "যোনিমনু সঞ্চরন্তী" এবং চতুর্থ মন্ত্রে "অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তী" ইত্যাদি বাক্য আছে। সায়ণাচার্য্য "যোনি" বা "দেবকৃত যোনি" এই পদদ্বয়ের অর্থে 'স্থান, সমুদ্র' বলিয়াছেন। সুতরাং ঋগ্বেদীয় যুগে শতদ্রু বিপাশার সহিত মিলিত হইয়া যে সমুদ্রে নিপতিত হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উক্ত নদীদ্বয় সমুদ্রে নিপতিত

না হইয়া সিন্ধুনদীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পূর্ব্বকালে যে স্থানে সমুদ্র ছিল, সেই স্থান হইতে তাহা অন্তর্হিত হইলে এবং তৎস্থলে বালুকাময়ী মরুভূমি সমুত্থিত হইলে, বিপাশা-সংযুক্ত শতদ্রুর জলস্রোত বালুকাস্তূপ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পশ্চিমদিকে একটি নূতন খাত খনন পূর্ব্বক সিন্ধুনদীর সহিত মিলিত হয়। সুতরাং ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনা-কালে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণদিকে সমুদ্র ছিল, এবং পরবর্ত্তী সময়ে কোনও নৈসর্গিক কারণে সেই সমুদ্র অন্তর্হিত হয়, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

৪। রাজপুতানা-সমুদ্র

এক্ষণে রাজপুতানা প্রদেশের উপর প্রাচীনকালে সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। রাজপুতানার উপর পুরাকালে সমুদ্র ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন। রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর হ্রদের জল এখনও লবণাক্ত এবং এই প্রদেশে লবণের খনিও আছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রাজপুতানার পূর্ব্বভাগে আরাবল্লী (পারিযাত্র) নামক যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহা প্রত্নজীবক যুগে (Palæozoic era) অতিশয় উন্নত ছিল ; পরে কোনও পরবর্ত্তী যুগে নৈসর্গিক কারণে সেই পর্ব্বতমালা অবনমিত হইয়া যায়, এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ে তাহার পদতলবর্ত্তী সমুদ্রের তলভাগও সমুত্থিত

---

* কেহ কেহ বলেন "সমুদ্রগা" যোগরূঢ় শব্দ, তাহার অর্থ 'নদী' বা 'উপনদী' সুতরাং উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা রাজপুতানার উপর সমুদ্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু উদ্ধৃত মন্ত্রে "সমুদ্রগা" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই ; স্পষ্টই বলা হইয়াছে "অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ", অর্থাৎ 'রথিদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রের অভিমুখে যাইতেছ'। সরস্বতী নদীকেও "আসমুদ্র" বিস্তীর্ণা বলা হইয়াছে। সরস্বতী সিন্ধুনদীর সহিত কখনও মিলিত হয়েন নাই। সুতরাং এইরূপ আপত্তির কোনও মূল্য নাই।

হয় *। "রাজপুতানা-সমুদ্র" তিরোহিত হইলেও, তাহার নিম্নভূমি সমূহ সময়ে সময়ে আরব সমুদ্রের জলে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমুদ্রের আকারেই সহস্র সহস্র বৎসর বিদ্যমান থাকিত †। এখনও গুর্জ্জরদেশের সন্নিহিত কচ্ছ প্রদেশের সমুদ্রকূলবর্ত্তী ভূভাগসমূহ সময়ে সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইতেছে এবং কোনও কোনও স্থল সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইতেছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পদ্বারা প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল-ব্যাপী ভূভাগ সহসা সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হয়, এবং ৬০০ বর্গ-মাইলব্যাপী ভূমি সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যাহা ঘটিতেছে, প্রাচীনকালেও তাহা ঘটিত। ঠিক্ কোন্ সময়ে "রাজপুতানা-সমুদ্রে"র তলভাগ সমুত্থিত হইয়া শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু পৌরাণিক কিংবদন্তী পাঠ করিয়া মনে হয়, এই ভৌগলিক পরিবর্ত্তন ঋগ্বেদীয় যুগের পরবর্ত্তী কালেই সংঘটিত হইয়াছিল। মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের হিতার্থ সমুদ্রবারিশোষণ করিয়াছিলেন, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার উন্নতশৃঙ্গসমূহকে অবনমিত করিয়া দক্ষিণাপথে গমন পূর্ব্বক আর প্রত্যাগমন করেন নাই, এই পৌরাণিক উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন। ‡ মহর্ষি অগস্ত্য ঋগ্বেদীয় ঋষি ছিলেন; কিন্তু তিনিই যে ঋগ্বেদীয় যুগের পরবর্ত্তী কালেও জীবিত ছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার বংশধরগণও আপনাদিগকে অগস্ত্যনামে অভিহিত

---

* "The Aravallis are but the depressed and degraded relics of a far more prominent system which stood in Palæozoic times on the edge of the *Rajputana Sea*" (*Imp. Gaz. of the Ind. Emp.* vol. i. pp. 1-2 ; 1907).

† "Such encroachments of the sea on land, known as 'marine transgressions' are of comparatively short duration, and invade only low level areas, converting them for the time into epi-continental seas." Wadia's *Geology of India* p. 168.

‡ মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১০৩ ও ১০৪ অধ্যায়।

করিতেন, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশধরগণ আপনাদিগকে "বশিষ্ঠাঃ", মহর্ষি কুশিকের বংশধরগণ আপনাদিগকে "কুশিকাঃ", এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ আপনাদিগকে "বিশ্বামিত্রাঃ" বলিতেন, ঋগ্বেদে তাহার বহু প্রমাণ আছে *। এই কারণে অনুমান হয় যে, ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগে রাজপুতানা সমুদ্রের তলদেশ কোনও নৈসর্গিক কারণে উত্থিত হইয়া শুষ্কভূমিতে পরিণত হইলে, এবং পূর্ব্বোক্ত নৈসর্গিক কারণেই আরাবল্লী পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গসমূহও অবনমিত হইলে, অগস্ত্যবংশের অগস্ত্যনামধেয় কোনও মহর্ষি এই নবোত্থিত ভূমি ও অবনমিত পর্ব্বতশৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণাপথে গমন করেন, এবং তথায় আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অসভ্য অনার্য্যজাতিগণের মধ্যে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতার প্রচার করেন। এই প্রসিদ্ধ অগস্ত্যযাত্রার সহিত অগস্ত্য কর্ত্তৃক সমুদ্রশোষণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের † উচ্চশৃঙ্গসমূহের অবনমনের উপাখ্যান প্রচলিত হয়, এবং পরবর্ত্তী কালের পুরাণকারগণ মহর্ষি অগস্ত্যের উপরেই এই দুইটি অপ্রাকৃত কার্য্যের আরোপ করেন। বস্তুতঃ সমুদ্রশোষণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গসমূহের অবনমন, এই দুইটি ঘটনার বিষয় প্রাচীন আর্য্যগণ যে কিংবদন্তী পরম্পরাক্রমে অবগত ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যখন ঋগ্বেদে সমুদ্রের উল্লেখ আছে, তখন সমুদ্রশোষণ ব্যাপারটি যে তাহার পরবর্ত্তী যুগে সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* ঋগ্বেদ ৩।৫৩।৯, ১১, ১৩ ; ৭।৩৩।১, ২ প্রভৃতি। একজন বশিষ্ঠ বা একজন বিশ্বামিত্র ঋগ্বেদীয় যুগেও বর্ত্তমান ছিলেন, এবং ত্রেতাতে দশরথ ও রামচন্দ্রের সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণ আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস মধ্যে বিষম গোলযোগ ও বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। ঋষিগণের বংশের মধ্যে যখন যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তখন তিনিই বংশপ্রতিষ্ঠাতা আদি মহর্ষির নামে পরিচিত হইতেন। ঋগ্বেদের অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ যে রামায়ণের অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সত্যটি স্মরণ রাখিলে, আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস-রচনায় ব্যক্তি ও কাল সম্বন্ধে কোনই ভ্রান্তি উপস্থিত হইবে না।

† আরাবল্লী পর্ব্বতও বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত –

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুণানগরীতে ওরিয়েন্টাল্ কন্‌ফারেন্সের (Oriental Conference) যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে পুণার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভি, বি, কেট্‌কার মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রমাণ করেন যে, "রাজপুতানা-সমুদ্র" ও "গাঙ্গেয় সমুদ্র" (ঋগ্বেদে যাহাকে "পূর্ব্ব সমুদ্র" বলা হইয়াছে) খৃঃ পূঃ ৭৫০০ বৎসরের পরে অন্তর্হিত হয়। পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও জ্যোতিষিক গণনার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি উক্ত প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি একটি পত্রেও তাঁহার সিদ্ধান্তের মর্ম্ম আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন *। কেট্‌কার মহোদয়ের অভিমত যথার্থ হইলে, খৃঃ পূঃ ৭৫০০ বৎসরের বহু পূর্ব্বে যে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত কেটকার বলিয়াছেন যে, রাজপুতানা-সমুদ্র ও গাঙ্গেয় সমুদ্র পরস্পরে সংযুক্ত থাকিয়া সপ্তসিন্ধু বা পঞ্চনদদেশকে দক্ষিণাপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত রাখিয়াছিল। এই দুই সমুদ্রের তিরোধানের পর উক্ত দুই প্রদেশের মধ্যে স্থল সংযোগ সংঘটিত হইয়া ভারতবর্ষ একটি খণ্ড মহাদেশে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও এইমত পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ পরে করিব।

৫। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম (অপর) সমুদ্রের উল্লেখ আছে। সেই মন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথ দেবেষিতো মুনিঃ।
উভৌ সমুদ্রাবাক্ষেতি যশ্চ পূর্ব্ব উতাপরঃ॥" ঋগ্বেদ ১০।১৩৬।৫

যে সূক্ত হইতে উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সূক্তের দেবতা অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু। এই সূক্তের ঋষি বাতরশনের মুনি-পুত্রগণ, জূতিবাত,

---

* "I have proved on Astronomical evidence and Pauranic account that the Rajputana and Gangetic seas, nearly separating the Jambu-dvipa from the Punjab and the Himalayas disappeared after 7500 B.C. by the upheaval, partly volcanic, and partly seismic, of their beds."

জূতি প্রভৃতি। উদ্ধৃত মন্ত্রে বাতরশনের অন্যতম পুত্র করিক্রতের কথা বলা হইয়াছে, সায়ণাচার্য্য এই কথা বলেন। তাঁহার মতে, করিক্রত বায়ুর অশ্ব, অর্থাৎ বায়ুপথে ভ্রমণ করিবার ঘোটকস্বরূপ, অথবা তিনি কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়াই থাকেন; এই কারণে, তিনি বায়ুর সখা বা সহচর। দেবতারা (বায়ু ও সূর্য্য) তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন।

উদ্ধৃত ঋকের এই এক অর্থ। কিন্তু ইহার অন্য একটি অর্থও করা যাইতে পারে। প্রথম ঋকে কেশী দেবতার কথা বলা হইয়াছে। কেশীর অর্থ—"কেশস্থানীয়া রশ্ময়ঃ" অর্থাৎ কেশের ন্যায় রশ্মি যাঁহার আছে—তিনিই কেশী বা সূর্য্য। এই সূর্য্য বায়ু-পথে বা আকাশে ঘোটকের ন্যায় ভ্রমণ করেন, এবং তিনি বায়ুর সখা। অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি প্রখর হইলে, বায়ু বেগে বহমান হয়। আর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে দেবতারাও পাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি রশ্মিজালে মণ্ডিত হইয়া পিঙ্গলকেশযুক্ত মুনির ন্যায় শোভমান হন। এই যে সূর্য্য, ইনি পূর্ব্বসমুদ্রে ও পশ্চিম সমুদ্রে বাস করেন—অর্থাৎ তিনি পূর্ব্ব সমুদ্রে উদিত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে অস্তগত হন।

যে অর্থই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হউক, উদ্ধৃত ঋকে যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এই পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র কোথায় অবস্থিত ছিল? বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সমুদ্র বলিলে, বঙ্গোপসাগরকেই বুঝায়। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার সময়ে আর্য্যগণ কি বঙ্গোপসাগরের সহিত পরিচিত ছিলেন? যদি বঙ্গোপসাগর তাঁহাদের পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে সপ্তসিন্ধুদেশ ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহও অবশ্যই তাঁহাদের পরিজ্ঞাত ছিল। কেন না এই সমুদয় প্রদেশ অতিক্রম না করিলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে যাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদে পঞ্চাল, মৎস্য, বৎস, কোশল, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের কোনও উল্লেখ নাই। আর এত বড় যে গঙ্গা ও যমুনা নদী, দুই একবার ব্যতীত তাঁহাদেরও আর কোনও উল্লেখ নাই।

বিশেষতঃ, ঋগ্বেদীয় যুগে আর্য্যেরা গঙ্গা ও যমুনাকে বড় নদী বলিয়াই জানিতেন না। জানিলে, তাঁহারা অবশ্যই সিন্ধু ও সরস্বতীর ন্যায় তাঁহাদেরও প্রচুর স্তুতি করিতেন। যে গঙ্গা ও যমুনা নদী, এক্ষণে সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও শতদ্রু প্রভৃতি নদী অপেক্ষাও দৈর্ঘ্যে ও আকারে বড়, তাঁহাদের দুই একবার মাত্র উল্লেখ দেখিয়া কি মনে হয় না যে, ঋগ্বেদের সময়ে তাঁহারা এই দুইটি নদীকে ছোট নদী বলিয়াই জানিতেন, এবং এই দুইটি নদী যে হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়াই সমুদ্রের মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন? আর ঋগ্বেদে পঞ্চাল, মৎস্য, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি প্রদেশের অনুল্লেখ দেখিয়া ইহাও কি মনে হয় না যে, ঋগ্বেদীয় যুগে ঐ সকল প্রদেশ সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন থাকায়, তাহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না? অস্তিত্ব থাকিলে, যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল * সেই কালের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া কি উক্ত নদীদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এবং পঞ্চালাদি প্রদেশের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিতেন না? পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত বা গিরিশ্রেণী অথবা দুস্তর মরুভূমিও ছিল না। অধিকন্তু পঞ্জাব ও গাঙ্গেয় প্রদেশ প্রায় একই সমতলভূমির উপর অবস্থিত থাকায় সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ হইতে, অথবা তৎসন্নিহিত যমুনা ও গঙ্গার তট হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তদন্তর্গত নূতন দেশ ও নদ নদী-সমূহের আবিষ্কার করাও আর্য্যগণের পক্ষে দুরূহ কার্য্য ছিল না। যাঁহারা দুর্গম পর্ব্বতাচ্ছন্ন কাশ্মীর, বহ্লীক, গন্ধার, আরেকেশীয়া প্রভৃতি দেশে বাস ও যাতায়াত করিতেন এবং রাজ্যস্থাপনও করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে পূর্ব্বদিকে সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত কোশল পঞ্চাল প্রভৃতি দেশের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই, ইহা কখনও বিশ্বাস-যোগ্য নহে। তর্কচ্ছলে যদি ধরিয়াই লওয়া যায়

* ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার কাল যে তিনটি যুগে বিভক্ত ছিল, তাহা ঋগ্বেদেই উক্ত হইয়াছে। ৩।৩২।১৩, ৬।২১।৫)। এই তিনটি যুগের পরিমাণ ন্যূনকল্পে যে সহস্রাধিক বৎসর ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

যে, বৈদিক আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ইয়োরোপখণ্ড হইতে অগ্রসর হইয়া আততায়ীরূপে সপ্তসিন্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা হইলে ইহা কি কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা বহু দুর্গম পর্ব্বতমালা, নদনদী ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ দাস ও দস্যু নামধেয় "অনার্য্য"গণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার সুদীর্ঘ তিনটি যুগের মধ্যে উর্ব্বর সমতল ভূমিতে অবস্থিত পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অভিমুখে একটি পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই বা অবসর-লাভ করেন নাই? বলা বাহুল্য যে, এইরূপ তর্ক, অনুমান বা সিদ্ধান্ত একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রকৃত কথা এই যে. পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত আর কোনও দেশ ছিল না বলিয়াই তাঁহারা সেই দিকে অগ্রসর হন নাই। "পূর্ব্ব সমুদ্র" পঞ্জাবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই অবস্থিত ছিল, এবং গঙ্গা ও যমুনা সমতল ক্ষেত্রে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই এই সমুদ্রে নিপতিত হইতেন। দক্ষিণ দিকেও রাজপুতানা সমুদ্র বিদ্যমান থাকায়, তাঁহারা ঋগ্বেদীয় যুগে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করেন নাই, এবং এই কারণে ঋগ্বেদে দক্ষিণাপথের কোনও প্রদেশ, পর্ব্বত বা নদনদীর উল্লেখও নাই। পরবর্ত্তী যুগে রাজপুতানা-সমুদ্র বিশুষ্ক হইলে, তাঁহারা বিন্ধ্যপর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণাপথে আর্য্যধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকেও পূর্ব্বসমুদ্রের গর্ভ হইতে নূতন ভূমি ক্রমশঃ যেমন উত্থিত হইতে লাগিল। আর্য্যেরাও তেমনই ধীরে ধীরে সেই ভূমি অধিকার করিয়া নানাস্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার ঋগ্বেদীয় যুগের সহস্র সহস্র বৎসর পরে সংঘটিত হয়। এই নবোত্থিত দেশ যে অনার্য্যভূমি ছিল না, তাহা ইহার "আর্য্যাবর্ত্ত" নামের দ্বারাই পরিব্যক্ত হইতেছে। পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী যে দেশ, তাহাই আর্য্যগণের দেশ বা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া পরবর্ত্তী যুগে প্রথিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

---

* "আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥" মনু (২।২৪)

পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরবসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী যে দেশ, তাহাই আর্য্যাবর্ত্ত।

দৃষ্টি-হারা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ। থাম, থাম, আমি বের করচি আমরা কোথায়...আশ্রম বড় নদীর ওপারে...পুরোণো সাঁকোটা পার হয়ে আসতে হয়েচে—এখন আমরা দ্বীপের উত্তর দিকে—নদী থেকে আমরা বেশী দূরে নই—একটু স্থির হয়ে শুনলেই বুঝতে পারবে...যদি তিনি না আসেন তা হলে ওই শব্দ শুনে আমাদের নদীর ধারে যেতে হবে...দিন রাত্তির বড় বড় জাহাজ ওখান দিয়ে যায়—নাবিকরা নিশ্চয় আমাদের দেখতে পাবে—আলোক-স্তম্ভকে ঘিরে যে বন আছে—আমরা বোধ হয়—সেখানে—কি করে রাস্তা বের করা যায়...কে কে আমার অনুসরণ করবে, এস।

প্রথম। আমাদের বসে থাকাই উচিত—উঠ না, সবুর কর—সবুর কর, বড় নদীর দিক আমরা বুঝতে পাচ্চি না—আবার আশ্রমের চারিপাশে ডোবা—আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত, তিনি ফিরে আসবেন—ফিরে আসবেন—আসতে বাধ্য।

ষষ্ঠ। আমরা কোন্ দিক দিয়ে এসেচি—কেউ জান? আসবার সময় তিনি বল্‌তে বল্‌তে এসেচেন।

প্রথম। আমি তখন তাঁর কথায় কান দিইনি।

ষষ্ঠ। কেউ সে কথা শুনেছিলে কি?

তৃতীয়। এর পর থেকে তাঁর কথা ভাল করে শুনতে হবে।

ষষ্ঠ। আমাদের মধ্যে কেউ এ দ্বীপে জন্মেচো?

স্থবির। সকলেই অন্য জায়গা থেকে এসেচে, এ আমি ভাল করেই জানি।

প্রাচীনা। আমরা সমুদ্রের ওপার থেকে এসেচি।

প্রথম। পার হবার সময় আমি ভেবেছিলুম—মরে যাব।

দ্বিতীয়। আমিও তাই। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম।

তৃতীয়। আমাদের তিন জনেরই এক গাঁয়ে বাড়ী।

প্রথম। ওরা বলে—আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে, সেদিন সমুদ্রের উত্তর দিকে আমাদের গাঁ দেখা যায়। ওগাঁয়ে কোন উঁচু মন্দিরের চূড়ো নেই।

তৃতীয়। কি করে হঠাৎ একদিন আমরা এসে পড়লুম।

প্রাচীনা। আমি আর এক দিক থেকে এসেছিলুম।

দ্বিতীয়। কোথা থেকে এসেছিলে?

প্রাচীনা। সে কথা আর মনেই পড়ে না...কাউকে বলতে গেলে আমার খুব কষ্ট করে মনে করতে হয়..সে অনেক দিন...এ দেশের চেয়ে সে দেশ অনেক ঠাণ্ডা...

কিশোরী। আমি এসেচি, সেও অনেক দূরে.

প্রথম। সে কোথায়?

কিশোরী। ঠিক বলতে পারবো না...কি করে তার বর্ণনা করবো... সে যে অনেক দূর..সমুদ্রের কোন্ পরপারে...মস্ত সহর...ইঙ্গিতে বোঝাতে পারি. কিন্তু কেউ ত দেখতে পাবে না...আমি ঢের ঘুরেচি... সূর্য্য, জল, আগুন, পর্ব্বত, কত মুক, কত সুন্দর সুন্দর ফুল আমার মনে পড়ে..সে রকম এ দ্বীপে কিছু নেই..এখানে কেবল অন্ধকার আর ঠাণ্ডা...যেদিন থেকে দৃষ্টি হারালুম তার পর থেকে গন্ধ কখন শুকিনি... বাপ, মা ও বোনেদের কথা মনে আছে...খুব ছোট বলে সে জায়গার নাম আমার মনে নেই. সমুদ্রের ধারে খেলা করতুম·· যা দেখেচি সব আমার বেশ মনে আছে..বরফ ঢাকা পাহাড় একদিন দেখেছিলুম.. কেউ অসুখী হলে এখন আমি বুঝতে পারি.

প্রথম। তার মানে?

কিশোরী। স্বর শুনে বুঝতে পারি কে সুখী কে দুঃখী. যদিও সে সব বিষয়ে আর আমি চিন্তা করি না...তবুও তার স্মৃতি আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে

প্রথম। আমার একেবারেই মনে নেই...আমি...

(কতকগুলি বড় বড় পাখী কলরব করে উড়ে গেল)

স্থবির। আমার মাথার উপর দিয়ে কি গেল ?

দ্বিতীয়। তুমি কেন এখানে এলে ?

স্থবির। কাকে বলচ ?

দ্বিতীয়। আমাদের সেই ছোট বোনটির কথা বলচি।

কিশোরী। ওরা বলেছিল, সন্ন্যাসী চোক ভাল করতে পারেন ; তিনিও বলেছিলেন তুমি একদিন দেখতে পাবে ; তারপর ফের দেশে ফিরে যেতে পারবে...

প্রথম। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা দ্বীপ ছেড়ে পালাই।

দ্বিতীয়। আমাদের চিরকাল এখানে থাকতে হবে।

তৃতীয়। উনি এত বুড়ো হয়েচেন—আর সেরেচেন।

কিশোরী। যদিও আমার চোকের পাতা বোঁজা, তবুও ভিতরে আমি আলো দেখতে পাই ..

প্রথম। আমার চোকের পাতা খোলা ..

দ্বিতীয়। আমি চোক খুলে ঘুমুই।

তৃতীয়। আর চোকের সম্বন্ধে আলোচনা করে দরকার নেই।

দ্বিতীয়। তুমি ত বেশী দিন এখানে আসনি।

স্থবির। একদিন সন্ধ্যে বেলা প্রার্থনার সময় মেয়েদের দিকে একটা স্বর শুন্‌তে পেলুম। স্বর শুনে বুঝলুম, মেয়েটির বয়স অল্প—আমার ইচ্ছা হোল তাকে দেখি...

প্রথম। আমি কিন্তু কিছু লক্ষ্য করিনি।

দ্বিতীয়। সাধু কোন কিছু আমায় বলেননি।

ষষ্ঠ। তারা বলেছিল, কোন দূর দেশ থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে এসেচে...

কিশোরী। আমি নিজে কেমন তা আমি নিজেই জানি না...

স্থবির। আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। আমরা পরস্পর প্রশ্ন করি, উত্তর দিই, একসঙ্গে বাস করি, কিন্তু আমরা যে কী—তা জানি না, আমাদের হাত দুটোই চোকের কাজ করে ..

ষষ্ঠ। যখন তোমরা রোদ্দুরে দাঁড়াও তখন আমি তোমাদের ছায়া মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই...

স্থবির। যে বাড়ীতে বাস করি সে বাড়ীই দেখলুম না কখনো, তবে দেয়াল ও জানালাগুলো ছুঁতে বেশ লাগে...

স্থবির। ওরা বলে, এটা একটা পুরোণো দুর্গ...ভেতরে কেবল অন্ধকার, আর এখানে সেখানে ভাঙ্গা...কোথাও একটু আলো নেই কেবল ঐ চুড়োটা ছাড়া—যেখানে সন্ন্যাসী ঠাকুর থাকেন।

প্রথম। যারা দেখতে পায় না তাদের আলো কি হবে?

ষষ্ঠ। যখন আমি আশ্রমের বাইরে মেষ চরাই, সন্ধ্যেবেলা যখন তারা ঘরে ফেরে তখন তারা সেই চুড়োর আলোটা দেখতে পায়... তারা কখন আমাকে ভুল পথে নিয়ে যায় না।

স্থবির। এই বছরের পর বছর আমরা একসঙ্গে কাটাচ্চি, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পেলুম না! যেন আমরা একলা...না দেখলে ভালবাসা যায় না...

স্থবির। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, যেন আমি দেখতে পাচ্চি...

স্থবির। আমিও স্বপ্ন দেখি...

প্রথম। কি আশ্চর্য্য! ঠিক দুপুর রাত হলেই আমি স্বপ্ন দেখি...

দ্বিতীয়। হাত না নেড়ে স্বপ্ন দেখা যায়?

(একটা দমকা বাতাস বনের উপর দিয়ে বয়ে গেল, চারিপাশে শুকনো পাতা ঝরে পড়তে লাগলো)

পঞ্চম। কে আমার গায়ে হাত দিলে?

প্রথম। আমাদের চারিপাশে কি পড়চে।

স্থবির। ওপর থেকে আসচে ..কি তা বলতে পারি না...

ষষ্ঠ। কে আমার গায়ে হাত দিলে? আমি ঘুমোচ্ছিলুম, আমায় জাগিও না।

স্থবির। কেউ ছোঁয়নি।

পঞ্চম। কে আমার হাত ধোরলে? চেঁচিয়ে বল, আমি কানে কম শুনি।

স্থবির। আমরা নিজেদেরই জানি না, তা তোমায় কে ছুঁলে বল্‌বো কি করে?

পঞ্চম। ওরা নেবার জন্তে এসেচে নাকি?

প্রথম। ধ্যেৎ, ওর কথার উত্তর না দেওয়াই ভাল, ও একেবারে শুনতে পায় না।

তৃতীয়। বাস্তবিক, যারা কালা তা'দের মত দুঃখী আর কেউ নেই।

স্থবির। বসে বসে আর পারি না।

ষষ্ঠ। এখানে আর কত কাল থাকবো?

দ্বিতীয়। আমরা বড় তফাতে তফাতে বসেচি. একটু ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসা যাক, বড্ড ঠাণ্ডা।

তৃতীয়। আমার দাঁড়াতে সাহসই হয় না। বসে থাকাই ভাল।

স্থবির। আমাদের মাঝে যে কি আছে, তাও জানবার যো নেই।

ষষ্ঠ। বোধ হয় আমার হাত দিয়ে রক্ত বেরোচ্চে। আমি দাঁড়াতে চাই।

তৃতীয়। আমি শুন্‌তে পাচ্চি, তুমি আমার দিকে ঝুঁকচো।

(পাগলী মেয়েটি চোক রগড়াতে রগড়াতে কান্নার সুর করে সেই নিশ্চল সন্ন্যাসীর দিকে আগাতে লাগলো)

প্রথম। আবার কিসের শব্দ?

স্থবিরা। পাগলী বেচারী চোক রগড়াচ্চে।

দ্বিতীয়। তাকে আর কখন কিছু করতে শুনিনি; রোজ রাত্তিরে কেবল ওই শুনতে পাই।

তৃতীয়। ও পাগল, কথা বলে না।

প্রাচীনা। তার ছেলে হবার পর থেকে সে কখনো কথা বলেনি। বোধ হয়, যেন সর্ব্বদা ভীত...

স্থবির। এখানে ভয় করচে না?

প্রথম। কাকে বলচো?

স্থবির। সকলকেই।

প্রাচীনা। হাঁ্যা, হাঁ্যা, আমাদের সকলেরই ভয় করচে!

কিশোরী। আমাদের অনেকক্ষণ থেকে ভয় করচে !

প্রথম। এ-কথা জিগেস করচো কেন ?

স্থবির। তা জানি না ..একটা কি হয়েচে আমি ঠিক বুঝতে পারচি না...কি যেন একটা কান্নার শব্দ পাচ্চি ..

প্রথম। ভয়ের কারণ নেই, বোধ হয় সেই পাগলী।

স্থবির। শুধু তাই না, আরো কিছু আছে . আমি ঠিক বলচি, আরো কিছু আছে...ভয় লাগচে।

প্রাচীনা। মাই দেবার সময় ও কাঁদে...

প্রথম। ঐ রকম করে কেবল সেই কাঁদে।

প্রাচীনা। ওরা বলে, মাঝে মাঝে সে দেখতে পায় ..

প্রথম। কান্না জিনিষটা শোনা যায় না ..

প্রাচীনা। কাঁদতে হলে দেখতে হয় .

কিশোরী। একটা ফুলের গন্ধ পাচ্চি ..

প্রথম। আমি কেবল মাটীর গন্ধ পাচ্চি...

কিশোরী। নিশ্চয় এখানে ফুল আছে .

দ্বিতীয়। আমিও কেবল মাটীর গন্ধ পাচ্চি ..

প্রাচীনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুলের গন্ধ আমি পেয়েচি...

তৃতীয়। আমিও কেবল মাটির গন্ধ পাচ্চি...

স্থবির। মেয়েরা বোধ হয় ঠিক।

ষষ্ঠ। কোথায় ? আমি তুলব।

কিশোরী। ডাইনে। বোধ হয় ডাইনে...(ষষ্ঠ অন্ধ উঠে ধীরে ধীরে যেতে লাগলো, কখনো কখনো গাছের ঝোপে বাধা পেলেও উঠে পড়ে একেবারে ড্যাফোডিলের ওপর পা দিলে)

কিশোরী। ডাঁটা ছেড়ার শব্দ শুনতে পাচ্চি। থামো, থামো...

প্রথম। আরে ফুল নিয়ে কি হবে ? ফিরবে কেমন করে তাই ভাব।

ষষ্ঠ। আর ফিরে যেতে সাহস হচ্চে না।

কিশোরী। ফিরো না, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি (উঠে দাঁড়ালো), উঃ

বড় শীত। মাটী কি ঠাণ্ডা, পা বরফ হয়ে গেল (সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো, ড্যাফোডিলের কাছের গাছে ও পাথরে বাধা পেয়ে) এখানেই আছে, এখানেই আছে। কিচুতেই ধরতে পারুচি না। বোধ হয় তোমার পাশেই...

ষষ্ঠ। আমার বোধ হয় আমি তুলেচি।

(সে ফুলগুলি কিশোরীর হাতে দিল, মাথার ওপর রাতের পাখীর উড়ে যাবার শব্দ)

কিশোরী। আমার বোধ হচ্চে, এফুল আমি পূর্ব্বে দেখেচি...কিন্তু নাম ভুলে গেচি...ফুলগুলো ছোট কিন্তু ডাঁটাগুলি খুব চক্‌চকে। আর কখনও এদের পাইনি ..কবরের পাশে এফুল ফোটে ..

(সে ফুলগুলি চুলে গুঁজতে লাগলো)

স্থবির। আমি তোমার চুলের শব্দ শুনতে পাচ্চি।

কিশোরী। ফুলগুলো গুঁজচি...

স্থবির। দেখতে ত আর পাব না...

কিশোরী। আমি নিজেই কেমন হোল তা দেখতে পাচ্চি না.. বড় শীত করচে।

(বনে ঝড় উঠলো। সমুদ্র গর্জ্জে উঠে কাছের পাহাড়গুলোর গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো)

প্রথম। ওঃ—এ যে মেঘ ডাকচে।

দ্বিতীয়। আমার বোধ হয় ঝড় উঠেচে।

প্রাচীনা। আমার বোধ হয় সুমুদ্দুর গর্জ্জাচ্চে।

তৃতীয়। সুমুদ্দুর ?—একি সুমুদ্দুর নাকি ? তা হলে ত আমাদের পাশেই।—আমি ত চারিপাশেই শুনতে পাচ্চি—আমার বোধ হয় অন্য কিছু।

কিশোরী। আমার বোধ হচ্চে শব্দটা আমার পায়ের কাছে...

প্রথম। ওটা হোল বাতাসে পাতা-ওড়ার শব্দ।

স্থবির। মেয়েরাই বোধ হয় ঠিক।

তৃতীয়। শব্দটা যে ক্রমেই এদিকে এগিয়ে আসচে।

প্রথম। বাতাস কোত্থেকে আসে ?

স্থবির। বাতাস বরাবরই সুমুদ্দুর থেকে আসে। সুমুদ্দুর যখন আমাদের চারিদিকে ঘিরে, তখন এ আর কোত্থেকে আসতে পারে ?

প্রথম। সুমুদ্দুরের বিষয় আর ভেবে কি হবে।

দ্বিতীয়। ভাবতেই হবে, কারণ আমাদের দিকে যে এগিয়ে আসচে।

প্রথম। কি করে জানলে সুমুদ্দুর ?

দ্বিতীয়। কি করে আবার ? বোধ হচ্চে যেন জলে আমার দু পা ডুবে গেচে। এখানে আর থাকা উচিত নয়। যেন চারিপাশ থেকে ঘিরে আসচে।

স্থবির। এখন যাবে কোথায় ?

দ্বিতীয়। কোথায় তা জানি না। কিন্তু জলের শব্দ আর শুনতে পারচি না। ওঠ, চল যাওয়া যাক।

তৃতীয়। আমার বোধ হচ্চে আর একটা যেন কিসের শব্দ শোনা যাচ্চে। শোন—

(দূরে চঞ্চল পায়ের শব্দ শুকনো পাতার মধ্যে শোনা গেল)

প্রথম। কে আমাদের দিকে আস্‌চে।

দ্বিতীয়। আসছেন, আসছেন। তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসছেন।

তৃতীয়। তিনি আমাদের নেবার জন্মে ছোট ছেলের মত ছোট ছোট পা ফেলে আসচেন।

দ্বিতীয়। আজ আর তাঁকে কেউ কিচু বোলো না...

প্রাচীনা। উঁহুঁ, এ—ত মানুষের পায়ের শব্দ নয় (একটা মস্ত কুকুর তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।—নীরব)

প্রথম। কে ? কোথায় ? দয়া করে একবার এদিকে এস, আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি (কুকুর থামলো, ফিরে এসে প্রথম অন্ধর কোলের উপর পা দুটো তুলে দিল) ওঃ হোঃ আমার হাটুর উপর দাঁড়াল কেন ? একি ! একি ! কুকুর। এ যে আশ্রমের কুকুর—আয়, আয়, ওঃ ...এ আমাদের বাঁচাবার জন্মে এসেচে।

সকলে। আয়, আয়, আমার কাচে আয়।

প্রথম। আমাদের বাঁচাবার জন্যে এসেচে। ঠিক অনুসরণ করে এসেচে। শোন, আমার হাত চাটচে। যেন কত হাজার বছর পরে আমার দেখা পেলে। আনন্দে চীৎকার করচে। শোন, শোন, আহ্লাদে মরে গেল। শোন, শোন।

সকলে। আয়, আয়।

স্থবির। কার সামনে দৌড়ে গেল?

প্রথম। না, না, ও একলাই আছে। আর কাউকে শোনা যাচ্চে না। আর কারুর পথ দেখাবার আমাদের দরকার নেই। ও ঠিক আমাদের নিয়ে যাবে। আমাদের কথা ও ঠিক শুনবে...

প্রাচীনা। আমার কিন্তু ওর সঙ্গে যেতে সাহস হচ্চে না।

কিশোরী। আমারও না...

প্রথম। কেন—না? ও আমাদের চেয়ে ঢের বেশী দেখতে পায়।

দ্বিতীয়। মেয়েদের কথা কেউ শুন না।

তৃতীয়। আমার বোধ হচ্চে, আকাশে একটা কি পরিবর্ত্তন হয়েচে। আমার নিশ্বাসটা নিতে বেশ লাগচে। বাতাসটা বেশ পরিষ্কার বোধ হচ্চে।

প্রাচীনা। সমুদ্দুরের বাতাস আমাদের চারিপাশে ঝির ঝির করে আসচে।

ষষ্ঠ। আমার বোধ হয় আলো আসচে।—বোধ হয় সূর্য্য উঠচে।

স্থবির। আমার বোধ হচ্চে, ক্রমেই ঠাণ্ডা পড়ে আসচে।

প্রথম। রাস্তা আমাদের বের করতেই হবে। কুকুরটা আমায় টেনে নিয়ে যাচ্চে। ওর খুব আহ্লাদ হয়েচে। ওঃ একে আর ধরে রাখা যাচ্চে না। সব আমার পেছনে পেছনে এস। আমরা বাড়ী যাচ্চি। (কুকুরটা তাকে টান্‌তে টান্‌তে সেই নিশ্চল সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেল)

সকলে। তুমি কোথায় গেলে? সাবধান...

প্রথম। থাম, থাম। তোমরা এগিও না। আমি ফিরে যাচ্চি। একি, ওঃ হোঃ...আমি একটা কি ঠাণ্ডা ছুঁয়েচি।

দ্বিতীয়। কি বলচ? আমি আর তোমার কথা শুনতে পাচ্চি না।

প্রথম। আমি কি একটা ছুঁয়েচি—ও বাবা—এযে মুক!

তৃতীয়। কি বল্‌চো? তোমার কথাই যে শোনা যাচ্চে না—তুমি এর মধ্যে এতদূর চলে গেলে।

প্রথম। ওঃ হোঃ, ও বাবা—একি বুঝতে পারচি না...এ যে মরা মানুষ।

সকলে। মরা মানুষ? সে কি? তুমি কোথায়? কোথায় তুমি?

প্রথম। আমি নিশ্চয় বলচি, এ মরা মানুষ। মরা নইলে এমন মুক হতেই পারে না; আর এ যখন আমাদের পাশেই রয়েচে। তখন আমাদেরই মধ্যে হঠাৎ কেউ মরে গেচে। সব এক এক করে নিজেদের সাড়া দাও, যেন বুঝতে পারি কে মরলো। (পাগলী ও কালা ছাড়া সকলেই একে একে সাড়া দিতে লাগ্‌লো, যে তিনজন মেয়ে প্রার্থনা করছিল তারা প্রার্থনা থামালো) তোমাদের কারুর স্বর বুঝতে পার্‌চি না। সকলেরই স্বর একই রকম। একই রকম কাঁপচে...

তৃতীয়। দুজন কেবল উত্তর দিলে না, তারা কোথায়? (সে তার লাটি দিয়ে পঞ্চম অন্ধকে আঘাত করলো)

পঞ্চম। আমি ঘুমোচ্ছিলুম আমায় জাগিও না।

ষষ্ঠ। ও নয়। তা হলে সেই পাগলী।

প্রাচীনা। সে আমার পাশেই বসে। আমি তার নিশ্বাস শুনতে পাচ্চি।

প্রথম। তা হলে...তা হলে বোধ হয় সাধুই...তিনি বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছেন—এস, এস।

দ্বিতীয়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন?

তৃতীয়। তা হলে তিনি নিশ্চয় মরেননি।

স্থবির। কোথায় তিনি?

ষষ্ঠ। এসে দেখ। (পাগলী ও পঞ্চম ছাড়া সকলেই উঠে দাঁড়ালো তারপর হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে মৃতের নিকট গেল)

দ্বিতীয়। তিনি কি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন—একি তিনি ?

তৃতীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেচি।

প্রথম। হে ভগবান! আমাদের কি হবে ?

প্রাচীনা। বাবা, বাবা, একি তুমি—কি হয়েচে বাবা—কথা কও—উত্তর দাও—আমরা সকলেই তোমার চারিপাশে রয়েচি ..হায়! হায়!!

স্থবির। জল নিয়ে এস, জল নিয়ে এস, বোধ হয় এখনও বেঁচে আছেন।

দ্বিতীয়। চেষ্টা করে দেখ—আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাবে কে ?

তৃতীয়। আ—র সব শেষ হয়ে গেচে। বুকে হাত দিয়ে আর কিছু টের পাওয়া যাচ্চে না। শরীর একেবারে ঠাণ্ডা

প্রথম। দেহ-রাখবার আগে একটা শব্দও করলেন না।

তৃতীয়। একবার আমাদের বল্‌লেনও না।

দ্বিতীয়। ওঃ কম বয়স হয়েচে আমি জীবনে এই প্রথম এঁর মুকে হাত দিচ্চি।

তৃতীয়। (শবের গায়ে হাত বুলিয়ে) ইনি আমাদের চাইতে ঢের দীর্ঘাকৃতি ছিলেন।

দ্বিতীয়। চোক খোলা রয়েচে। হাত কোলের উপর জোড় করা...

প্রথম। কেন যে মারা গেলেন কোন কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না...

দ্বিতীয়। তিনি ত দাঁড়িয়ে নেই। পাথরের উপর বসে .

প্রাচীনা। হায় ভগবান। আমরা ত কিছুই জানি না। এতদিন ধরে অসুখ হয়েচে। আমাদের ত কিছুই বলেননি। আজ বোধ হয় বেড়েছিল। তিনি ত একদিনও তাঁর অসুখের কথা জানাননি। বিদায় নেবার সময় আমার হাত ধরে কি একটু বল্‌লেন। আমরা কিছু বুঝতে পারিনি, কিছুই বুঝতে পারিনি, এস আমরা সকলে মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। (মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে হাঁটুগেড়ে বসলো)

প্রথম। আমার হাঁটুগেড়ে বসতে সাহস হয় না।

দ্বিতীয়। কি করে হাঁটু গাড়তে হয় তা জানি না।

তৃতীয়। তিনি কি পীড়িত ছিলেন? আমাদের ত কিছুই বলেন নি...

দ্বিতীয়। যখন তিনি চলে গেলেন তখন তাঁকে কি ফিস্ ফিস্ করে বলতে শুনেছিলুম। আমি ভেবেছিলুম, তিনি কিশোরীর সঙ্গে কথা বল্‌চেন। তিনি কি বলেছিলেন?

প্রথম। তা—উত্তর দেবে না।

দ্বিতীয়। কখনো উত্তর দিও না।—তখন তুমি কোথায় ছিলে? উত্তর দাও—উত্তর দাও।

প্রাচীনা। তোমরা তাঁকে ঢের কষ্ট দিয়েচ। তোমাদের জন্যেই ত তিনি মারা গেলেন.. তোমরা পাথরে বসে কেবল থাই থাই করছিলে ...সারাদিন ধরে কেবল থাই থাই করতে। তাঁকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে শুনলুম, শেষে হতাস হয়ে...

প্রথম। তুমি ঠিক জান, তিনি পীড়িত ছিলেন?

স্থবির। আমরা কিছুই জানি না·· আমরা কখন তাঁকে দেখিনি... চোকের সাম্‌নে দিয়ে কিছু চলে গেলেও টের পাই না...তা ছাড়া তাঁর কষ্টের সম্বন্ধে তিনি কখনো অভিযোগও করতেন না.. আর এখন সব শেষ...এমন কখনো শুনিনি...এইবার আমাদের পালা...

প্রথম। আমি তাঁকে কখন কষ্ট দিইনি। কখন তাঁকে রূঢ় কথাও বলিনি।

দ্বিতীয়। আমিও না। তিনি যখনি যা বলতেন তক্ষুণি তাই করতুম।

তৃতীয়। এই পাগলীর জন্যে জল আনতে গিয়েই ত তিনি মারা গেলেন।

প্রথম। এখন কি করা যায় বল তো? কি করে বাড়ী ফেরা যায়?

তৃতীয়। কুকুরটা গেল কোথায়?

প্রথম। ও মড়ার কাচ ছাড়বে না।

তৃতীয়। ওকে টেনে নিয়ে এস। তাড়িয়ে দাও। তাড়িয়ে দাও।

প্রথম। ও মড়ার কাচ ছাড়বে না।

দ্বিতীয়। মড়ার কাচে আর কতক্ষণ বসে থাকবে? আমরা এমন করে অন্ধকারে আর মরতে পারি না।

তৃতীয়। না না, সব একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে থাক, কেউ নড়ো না—এই পাথরে বসা যাক। কে কোথায় আছ সব এস, এস।

স্থবির। তুমি কোথায়?

তৃতীয়। এই যে আমি এখানে। আমরা সব আছি ত? এস, আমার কাচে এস, হাত ধরাধরি করে বস। উঃ বড় শীত।

কিশোরী। উঃ, তোমার হাত বড় ঠাণ্ডা।

তৃতীয়। তুমি কি কোরচো?

কিশোরী। আমি আমার হাত চোকে দিয়েচি। আমার বোধ-হচ্চে আমি যেন সব দেখতে পাচ্চি।

প্রথম। কাঁদচে কে?

প্রাচীনা। সেই পাগলী কাঁদচে।

প্রথম। তবুও কি ঘটেচে তা সে এখনও জানে না।

স্থবির। আমার বোধ হয় আমাদের সকলকে এখানে মরতে হবে।

প্রাচীনা। কেউ হয় ত আসবে'কুন।

স্থবির। কে আর আসবে বল?

প্রাচীনা। তা জানি না।

প্রথম। ভিক্ষুণীরা বোধ হয় আশ্রম থেকে আসতে পারেন।

প্রাচীনা। সন্ধ্যের পর আর তাঁরা আশ্রমের বাইরে যান না।

কিশোরী। তাঁরা আশ্রমের বাইরে একেবারেই যান না।

দ্বিতীয়। আলোক-স্তম্ভের লোকেরা আমাদের দেখতে পেতে পারে।

স্থবির। তারা সেখান থেকে কখন নামেই না।

তৃতীয়। তারা দেখতে পেতে পারে...

প্রাচীনা। তারা কেবল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তৃতীয়। উঃ, বড় শীত।

স্থবির। শুকনো পাতার শব্দ শোন। আমার বোধ হচ্চে, সব বরফ হয়ে যাচ্চে।

কিশোরী। ওঃ মাটী কি শক্ত!

তৃতীয়। আমার বাঁ দিকে একটা কি শব্দ শুনলুম।

স্থবির। সমুদ্দুর পাহাড়ে ধাক্কা মারচে।

তৃতীয়। আমি ভাবলুম, কোন স্ত্রীলোক।

প্রাচীনা। ঢেউয়েতে বরফগুলো ফাটচে—আমি শুনতে পাচ্চি।

প্রথম। কাঁপচে কে? এমন কাঁপচে যে, পাথরটা পর্য্যন্ত কাঁপচে।

দ্বিতীয়। আমি আর হাত বের করতে পারচি না।

স্থবির। আমি আর একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্চি।

প্রথম। কাঁপচে কে? পাথরটা পর্য্যন্ত যে কাঁপচে।

স্থবির। আমার বোধ হয় কোন স্ত্রীলোক।

প্রাচীনা। আমার বোধ হয় ওই পাগলী সব চাইতে বেশী কাঁপচে।

তৃতীয়। সেই ছেলেটির ত আর কোন শব্দ শোনা যাচ্চে না।

প্রাচীনা। বোধ হয় মাই খাচ্চে।

স্থবির। আমাদের মধ্যে কেবল সেই দেখতে পায়।

প্রথম। উত্তরের বাতাস শুনচি।

ষষ্ঠ। আমার বোধ হয় আর আকাশে তারা নেই। এইবার বরফ পড়বে।

দ্বিতীয়। তা হলে এইবার আমাদের শেষ।

তৃতীয়। যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে আমাদের মধ্যে—তাকে তোলো।

স্থবির। আমার ঘুমের মত আসচে।

(একটা দমকা হাওয়া শুকনো পাতার উপর ঘূর্ণী সৃষ্টি করলে)

কিশোরী। শুকনো পাতার শব্দ শুনচ, কে যেন আমাদের দিকে আসচে...

দ্বিতীয়। ও বাতাস। ভাল করে শোন।

তৃতীয়। এখন কেউ আসবে না, কেউ আসবে না।

স্থবির। শীত রুদ্র মূর্ত্তি ধরে আসচে।

কিশোরী। কে যেন দূরে বেড়াচ্ছে...শুনতে পাচ্চি...

প্রথম। আমি কেবল শুকনো পাতারই শব্দ শুনচি।

কিশোরী। অনেক দূরে কে বেড়াচ্ছে...আমি শুনতে পাচ্চি...

দ্বিতীয়। উত্তরে বাতাস ছাড়া আমি আর কিছু শুনচি না।

কিশোরী। আমি তোমাদেব বলচি, কে আমাদের দিকে আসচে।

প্রাচীনা। আমি যেন কার মৃদু পায়ের শব্দ পাচ্চি।

স্থবির। মেয়েরা বোধ হয় ঠিক।

(বরফ পড়তে আরম্ভ হোল)

প্রথমা। ওঃ আমাব হাতের উপর ঠাণ্ডা একটা কি পড়লো।

ষষ্ঠ। বরফ পড়চে—রে !

ষষ্ঠ। খুব ঘেঁষাঘেষি করে বস।

কিশোরী। কিন্তু, কার পায়ের শব্দ শোন...

প্রাচীনা। ভগবানের দোহাই—একটু চুপ কব।

কিশোরী। ক্রমেই এগিয়ে আসচে, ক্রমেই এগিয়ে আসচে। শোন, শোন...

(অন্ধকারের ভেতর শিশুটি কেঁদে উঠলো)

স্থবিব। ছেলেটি কাঁদচে।

কিশোরী। দেখচে, দেখচে...বোধ হয় কাকেও ও দেখতে পেয়েচে...

(ছেলেটিকে নিয়ে সে পায়ের শব্দের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, মেয়েরা অনুসরণ করলে) আমি ওই শব্দের কাচে যেতে চাই...

স্থবির। সাবধান !

কিশোরী। ওঃ কি চীৎকারই করচে। কাঁদচ কেন ? কেঁদ না, ভয় কি ? এই ত আমরা রয়েচি। কি দেখতে পাচ্চ। ভয় নেই। কাঁদিস না। কি দেখতে পাচ্চিস। আমাদের বল্ দেখি, কি দেখতে পাচ্চিস ? .

প্রাচীনা। পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসচে।

স্থবির। আমি যেন কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলুম।

ষষ্ঠ। কোন স্ত্রীলোক নাকি?

স্থবির। একি পায়ের শব্দ?

প্রথম। বোধ হয় সমুদ্রের ধ্বনি ঐ পাতার ওপর।

কিশোরী। না না, ও ঠিক পায়েব শব্দ, ঠিক পায়ের শব্দ ..

প্রাচীন। এখনই টের পাব। ঐ শুকনো পাতাগুলো শোন।

কিশোরী। আমি শুনতে পাচ্চি। আসচে...আসচে ..আমাদের নিতে আসচে। (শিশুটিকে) কি দেখচিস বল্ দেখি?

প্রাচীনা। ও কোন্ দিকে তাকাচ্চে তারি ঠিক নেই।

কিশোরী। পায়ের শব্দের দিকেই তাকাচ্চে। যেই আমি 'দেখ্ দেখ্' বলে মুক ঘুরিয়ে দিচ্চি, ওমনি ও মুক ঘুবিয়ে আমার বুকের মধ্যে লুকোচ্চে। ও দেখতে পাচ্চে। যা হয় কিছু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌চে ..

প্রাচীনা। (এগিয়ে এসে) ওকে উঁচু করে তোল দেখি। যদি কিছু দেখতে পায়।

কিশোরী। সরে দাঁড়াও। (ছেলেটিকে উঁচু করে ধরলে) ওঃ পায়ের শব্দ যে একেবারে আমাদেব পাশেই...

স্থবির। এই যে এখানে—আমাদেরই মধ্যে।

কিশোরী। কে তুমি, কথা কও ..(গভীর নিস্তব্ধতা)

প্রাচীনা। দয়া করে কথা বল...

(সব নিঝুম)

যবনিকা

(সমাপ্ত) শ্রীপ্রভাতী দেবী

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

৮ই জুলাই ১৯২০ সাল—কাশী সেবাশ্রম সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল

স্বামী তু—ছেলেটি খুব চালাক চতুর, ১৩ বছর বয়স অথচ বিশ বছরের ছেলের মত কথাবার্ত্তা বলে। এত ছেলে দেখলুম, কিন্তু এমন বুদ্ধিমান ছেলে দেখিনি। শরীরটা বাড়্‌ছে। এই বাল্য ও কৈশোরের সন্ধির সময়টাই খুব সাবধান থাকতে হয়। আমাদের দেশে ১৩ বছরেই কৈশোর অবস্থা আরম্ভ হয়, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে আরও দেরীতে, ১৬।১৭তে আরম্ভ।

র—কুসঙ্গে পড়ে আবার অনেক সময়ে খুব কম বয়সেই এই অবস্থাটা আরম্ভ হয়।

স্বামী তু—তা আর বল্‌তে? মনে ত সূক্ষ্ম ভাবে এসব স্বাভাবিক সংস্কার রয়েছে—সৎসঙ্গের ফলে ঐ সব সংস্কার ধীরে ধীরে মন থেকে চলে গেলে তবেই বাঁচোয়া, নইলে সুবিধা পেলে ঐ সব চিন্তা ও আলোচনা এসে পড়ে, কিন্তু এসবের আলোচনা পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষেধ করে গেছেন।

একবার সংস্কার পড়ে গেলে বাঁচা দায়। যদি বুঝতে পারে ব্রহ্মচর্য্য না থাকলে কি ক্ষতি হয় আর ব্রহ্মচর্য্য থাকলেই বা কি লাভ হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম শেষ হলে পর বিবাহ করে সৎ গৃহস্থ হতে পারে।

র—যারা কুস্তি টুস্তি করে, তাদের মনটা অন্য দিকে থাকায় তারা অনেক সময় বেঁচে যায়।

স্বামী তু—হাঁ, তবে যদি যথার্থ ধর্ম্মভাব থাকে তবেই রক্ষা, কারণ; ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সম্বন্ধ। বীর্য্য স্থির না হলে চিত্ত স্থির হয় না। 'স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি'।

(অবধূত গীতা আনা হল এবং অষ্টম অধ্যায় ১১শ শ্লোক থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়া হল।)

'চিন্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং নষ্টে চিত্তে ধাতবো যান্তি নাশম্।
তস্মাচ্চিত্তং সর্ব্বতো রক্ষণীয়ং স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি ॥'

অর্থাৎ এই শরীর ধাতুর দ্বারা গঠিত ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত। চিত্ত নষ্ট হলে ধাতুও নষ্ট হয়, অতএব চিত্তকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করা প্রয়োজন। চিত্ত স্বস্থ হলে সদ্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়।

'ধাতবো' মানে কিনা বীর্য্য। বীর্য্য নষ্ট হলেই চিত্ত অস্থির হয়। তা হলে আর ইষ্টের মূর্ত্তি চিত্তে স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। ঠাকুর বলতেন, "আয়নার পারা ঠিক থাকলে তবে প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে। পারা এধার ওধার হয়ে গেলে প্রতিবিম্ব পড়ে না।" চিত্ত জিনিষটা কি ?—যেখান থেকে ভাব ওঠে, সেখানেই প্রথম ছাপ পড়ে। তা হলেই বুঝতে পারছ, যেখান থেকে চিন্তা উঠবে, সেটাই যদি কাঁপে, তবে আর কেমন করে ধ্যান হবে ?

আমরা শুধু পড়ে যাই—চিত্ত, মন, বুদ্ধি—কোনটা মন, কোনটা বুদ্ধি, কোন্‌টা চিত্ত, এসব তলিয়ে বুঝতে হয়। চিত্তে একবার খারাপ সংস্কার পড়ে গেলে বাঁচা বড় শক্ত।

গীতায় ভগবান্ তাই বলছেন—

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম ॥'

'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্'—বোঝ একবার।

'লক্ষ্যচ্যুতম্ চেদ্ যদি চিত্তমীষৎ।
বহির্মুখং সৎ নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপংক্তৌ পতিতো যথা তথা ॥'

বিবেকচূড়ামণি।

অর্থাৎ—যেমন অসাবধান হাত হতে ক্রীড়াকন্দুক (খেলার বল) কোনও সোপান-শ্রেণীর উপরের সোপানে পড়ে গেলে লাফাতে লাফাতে নীচে পড়ে যায়, তেমনি যদি চিত্ত ঈষৎ লক্ষ্যচ্যুত হয়, তবে বহির্মুখ হয়ে ক্রমশঃ পড়তে পড়তে শেষে চরম পতনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঠননং—ঠননং—ঠননং ঠঃ—অর্থাৎ কিনা একেবারে পতনের শেষ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে।

র—বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় ?

স্বামী তু—নিশ্চয়! ওজঃশক্তিবলে ব্রহ্মজ্ঞান খুলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান মানে কি ? জ্ঞান ত রয়েছেই—সেটাকে প্রকাশ করে দেওয়া বই ত নয়! বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতে পারলে চিত্ত স্বস্থ হয়, তখন জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।' কি শক্তিবলে স্বামিজী জগৎটাকে ওলট্ পালট্ করে দিলেন ? কেশব সেনের সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন—"কেশব যদি ত্যাগী হোত, তবে আরও অনেক কাজ করতে পারত।" শুধু মুখের কথায় কি আর কাজ হয় ? তুমি বলবে এক, করবে আর এক।

স্বামিজী আমাদের বলতেন, "তোমরা কি মনে কর, আমি শুধু লেকচার দিই ? I know, I give them something solid. They know that they receive something solid." (আমি জানি আমি তাদের কিছু দিলুম, তারা জানলে তারা কিছু পেলে)। নিউইয়র্কে স্বামিজী একদিন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন—সে কথা তোমায় আর কি বলবো ? কা—বলেছিল, ধ্যানের সময় নীচের কুলকুণ্ডলিনীকে যেমন উপর থেকে একটা শক্তি আকর্ষণ করে, স্বামিজীর লেকচার শুনতে শুনতে সেই রকমটা হচ্ছিল। এক ঘণ্টা লেকচারের পর কা— Announce (শ্রোতাদের জানিয়ে দিলে) করলে, এখন প্রশ্নোত্তর হবে। স্বামিজীর লেকচারের পরই প্রায় সব লোক উঠে গিয়েছিল। স্বামিজী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এর পর আর প্রশ্নোত্তর কিরে ? বক্তৃতা শুনে লোকের মনে যে উচ্চ ভাব জেগে উঠেছে ওতে যে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।" বোঝ একবার ব্যাপার। গোবিন্দ! গোবিন্দ!! কি একটা শক্তি ঠাকুর তৈরী করে রেখে গেলেন! জগৎটার চিন্তার গতি একেবারে বদলে গেল। যাকে কেউ টানতে পারে না, যে সকলকে টানে তার কতশক্তি একবার বোঝ! একজন সাধু একবার আমাকে বলেছিলেন,

"মহারাজ, আঠারহ বরীষ বেদান্ত্ রগড়তা হুঁ"—তারপর যা বল্‌লে তার ভাবটা এই—"তবু, দূ'রে মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা সেদিকে টেনে নিয়ে যায়।" মনে সংস্কার পড়ে গিয়েছিল আর কি। একবার সংস্কার পড়ে গেলে বড় কঠিন। তবে যদি এরূপ দৃঢ়তা থাকে—একবার করেছি বলে কি হয়েছে, এখন যখন বুঝেছি, আর কর্‌বো না—তা হলে হতে পারে। কত সুন্দরী, ধনবতী, বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে স্বামিজী চলে এলেন, কেউ তাঁকে আকর্ষণ কর্‌তে পার্‌লে না; বরং তিনি সকলকে নিজের দিকে টেনে আন্‌লেন। কি ব্যাপার বোঝ একবার। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কবিতা

কল্পনার কুঞ্জটিতে ভকতি পূরিত চিতে
মগ্ন কবি, দেবীর পূজায়,
অনিল বহিছে মন্দে, পুলকিত ফুল গন্ধে
হর্ষে পিক, মাঙ্গলিক গায়।
আগম বসন্ত শ্রীর, সূচিতেছে প্রকৃতির
জলে, স্থলে, ভুবন-ভবনে,
শ্যামপত্রে পুষ্প ফলে, স্বচ্ছ সরসীর জলে,
প্রস্ফুটিত পঙ্কজ-আসনে।
কে তুমি আনন্দ-উষা? পরিচ্ছন্দ ফুল-ভূষা
প্রতিভার রবি-রশ্মি-ধারে,
আবির্ভূতা লীলারঙ্গে, জ্ঞান-গঙ্গা গতিভঙ্গে,
ভরি ভাব যৌবন-জোয়ারে।

এসো বিশ্ব-আবাধিতা, ভাস্বতী অপরাজিতা,
বিধাতার মানস-নন্দিনী,
অজ্ঞান তিমির অঙ্কে, বিনাশি জড়িমা বঙ্কে
এসো সুধা, সুর-তরঙ্গিনী।
কিরণে ভুবন ভরি, এসো জ্যোৎস্না সিতাম্বরী
কুন্দ ইন্দু তুষার-ধবলা,
মলয়া ভাসিয়া আসে, অলকার ফুলবাসে,
ভালে হাসে আধ শশিকলা।
কমল কোমলকায়, পরাভবে লঘুতায়
সমীরণে, স্বপনে গঠিত,
মুরতি মরম ভৃতা, নব রসরাগ-যুতা—
মনীষার মায়া বিজড়িত।
নলিন নয়ন আগে অমলিন অনুরাগে
জাগে দৃষ্টি কল্যাণ-কোমল,
একি মূর্ত্তিমতী শোভা অপূর্ব্ব রূপের প্রভা
লাবণ্যের লীলা-শতদল।
রক্ত ওষ্ঠপুট দুটি, পুষ্পসম আছে ফুটি
ফুটিয়া কহেনি কোন কথা,
নীরব ইঙ্গিতে শুধু সঞ্চারিছে ভাব মধু
অমৃতের বিথারিণী লতা।
কুসুমে কর্ণান্তশোভী, গুঞ্জরি সৌরভ লোভী—
মধুপ শুনায় চাটুবাণী,
সোহাগে হৃদয় খুলে, কমল ধরেছে তুলে
রক্তপদ্ম-পল্লব দুখানি।
করে বীণা সপ্তস্বরা, অসীম আবেগ ভরা,
বিগলিত ললিত সংগীতে,
মানস মরাল-বধূ, স্তব্ধ হয়ে বসি শুধু
গতিহীন পদ-প্রান্তটিতে।

কবিতা সুন্দরী অয়ি, মনোজবা জ্যোতির্ম্ময়ী
অয়ি কলা-কল্প-লোক-রাণী,
এস মুগ্ধ শ্রুতিপথে, এসো ভক্ত মনোরথে,
মধুময়ী অশরীরী বাণী।
ঝঙ্কারি আনন্দ বীণা, এসো দৈব কৃপাধীনা
সাধকের সার্থক সাধনা,
নব সৌর-রূপ সমা, এস চির প্রিয়তমা,
কবি-চিত্ত-বাঞ্ছিত-বাসনা।

শ্রীনীহারিকা দেবী

মাধুকরী

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি খোলা-চিঠি

প্রণাম ও নিবেদন,

খবরের কাগজে দেখিলাম গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে রাজবন্দীদের সাহায্যার্থ যে নৃত্য-গীতের মজলিশ আয়োজনে টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভব আপনি কয়টি কথা জানেন না। প্রথম—আজ কয়েক মাস হইল রাজবন্দীদের সাহায্যার্থ একটি আবেদনপত্র প্রত্যেক খবরের কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রদত্ত এক হাজার টাকা ছাড়া আর কোনও টাকা সংগ্রহের কথা সাধারণের কেহ কিছু জানে না। দ্বিতীয়—রাজবন্দী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পরিবার-পরিজনের যে দুর্দ্দশার কথা খবরের কাগজে প্রকাশ হইয়াছে তাহা জনসাধারণের মনে তিলার্দ্ধ স্থান মুহূর্ত্তের জন্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য অনেক রাজবন্দীদের

অবস্থা তদপেক্ষা কোনও অংশে ভাল নয়। তৃতীয়—অধ্যাপক জ্যোতিষ-চন্দ্রের মর্ম্মন্তুদ পত্রে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, ধাপ্পাবাজি করিয়া দেশহিতৈষীর ভূমিকা না লইয়া আত্মপ্রসাদে যে কয়দিন কাটে তাহাই ভাল। তাই তিনি পতনে পঙ্গু হইয়াও রোগে জীর্ণ হইয়াও আরও তিন বৎসর মান্দালয়ের জেলে থাকাই শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়াছেন। চতুর্থ—প্রথম যেদিন আমি খবরের কাগজে এই মজলিশের বিজ্ঞাপন দেখি সেইদিনই "আনন্দবাজার পত্রিকায়" এই আয়োজনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পাঠাই। পঞ্চম—পরদিন দেখি বিজ্ঞাপনস্তম্ভে ঐ বিজ্ঞাপনের নিম্নে কয়টি কথা বসিয়াছে—Cause apart, Have an enjoyable evening—উপলক্ষ যাহাই হউক, একটা সাঁঝ আমোদ করিয়া যাও। ষষ্ঠ—আমার প্রতিবাদের পর আরও প্রতিবাদ "আনন্দ-বাজারে" দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে।

এই অবস্থায় ঐ মজলিশে আপনার উপস্থিতি জনসাধারণে কি ভাবে লইবে, তাহার কথা পাড়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে কি? আপনার মনে না থাকিতে পারে, আমার স্মৃতি হইতে ত কোনও দিন মুছিয়া যাইবার নয় যে, আমার যখন ৮ বৎসর বয়স, তখন হইতে ৺পিতা-ঠাকুরের সহিত আপনার ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিবার আগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য লাইব্রেরীর নানান্ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যাহা কিছু কাব্যরস মাধুর্য্য-সম্ভোগ, মহৎ চিন্তাধারাস্নান, বা ক্ষুদ্রতার গণ্ডি কাটাই-বার চেষ্টা আমার জীবনাভিনয়ে দেখা দিয়াছে, তাহার কতটা অংশ আপনার দান। আপনার সহিত তর্ক করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি-বার ছেলেখেলা করিব না। তবে ব্যথা যেখানে লাগিয়াছে, সেখান-কার রক্তের গতি লইয়াই জীবনীশক্তির বিকাশ ও স্থিতি। সেই গতিতে আজ আবিলতা পঙ্কিলতা ও বাধা যদি বোধ করিয়া থাকি, তবে তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা না চলিলেও জানান দেওয়াটা বোধ হয় অশোভন নহে। আজ এই অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র জগতের সমক্ষে প্রকাশ করা হইল যে, এদেশের রাজবন্দীদের জন্য কোনও শ্রদ্ধার সহানুভূতি সম্ভব নহে। বিনা বিচারে লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ যে

কয়জন যুবক আছে, তাহারা কয়েকটি মুষ্টিমেয় তরলমতি উন্মার্গগামী মাত্র, তাহাদের সহিত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা অর্থাগম বা অর্থব্যয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। ভিখারীকে একমুঠা চাউল দেওয়া যায়, রেল-কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিবার অবসর দেওয়া যায়, থিয়েটার সিনেমার টিকিটের জন্য মারামারি করা যায়, সাইমন কমিশন বয়কট ও হরতালের সভায় মুখর হাততালি সংগ্রহের পয়সার অভাব হয় না, কাউন্সিলের ভোট ক্রয় করিবার জন্য লোহার সিন্দুকের চাবি হারায় না, আর গরীবের ছেলে তাহার উপার্জ্জন হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মীয় স্বজনের প্রতিদিনের অন্নমুষ্টি লুপ্ত দেখিয়া রোগশোকের জ্বালাযন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইয়া, যখন সাধারণের লজ্জাসরমের চক্ষু এড়াইতে পারিল না, তখন সহানুভূতির কোনও লক্ষণ দিনের পর দিন দেখা না দেওয়ায়, সেই দুর্লভ ও দুর্নিরীক্ষ্য বস্তুটিকে আনিবার জন্য আয়োজন হইল কি? এস, কে কোথায় সুকণ্ঠ যুবক-যুবতী আছ, তোমার গানের লয়ে তোমাদেরই সমবয়সীদের বা অবরুদ্ধ লৌহপেটিকা-ভারাক্রান্তদের অবসর বিনোদন কর। এস, কে কোন্ কলাবিনোদিনী আছ, তোমার চটুল-চঞ্চল চরণবিন্যাসে দুই হাজার নয়নের বিস্ফারণে তোমার যৌবন-বন্দনা সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক। আর, এই নৃত্যগীতের বিলাস-সজ্জার ও চপল কলরবের অতি নিম্নস্তরে, যদি দেশের হীনতা, দীনতা, নির্ম্মমতা ও নপুংসকত্বের বীভৎস নরকঙ্কালের প্রতি একটু অনুগ্রহ-দৃষ্টি Cause apart রাখিয়াও পড়িয়া যায়, তবে রাজবন্দীদের পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী, পত্নী-দুহিতার নিতান্তই জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য!

যখন রাণাপ্রতাপ পরিবার-পরিজন লইয়া বনেজঙ্গলে দুর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া ভূর্জ্জপত্রে ভোজন সমাধা করিয়া মানবতার এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ রচনা করিতেছিলেন, তখন দিল্লী আগ্রার মর্ম্মর প্রাসাদের নাচদুয়ারে খোসরোজ ও নওরোজের মেলায় অনেক রাজপুত যুবক-যুবতী মিঠি-খিলি বেচিতেছিল, কিন্তু সে দোকানের আয় রাণার বা রাণার কোনও বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল

বলিয়া ত শুনা যায় না ! দ্রৌপদীর বেণীবাঁধার পণে যে ক্ষাত্রপণের বীজ বপন করা হয়, জল-সিঞ্চিত হয়, ফলিত হয়, তাহাতে ত কেহ কখনও কিছু বিসদৃশ পায় নাই। বাদলের রণসাধের পিছনে রাজোয়াড়ার নারীকুল যখন কেশপাশ কাটিয়া ধনুকের ছিলা বুনিতেছিল, সে মহীয়ান দানে কেহ ত কুণ্ঠাবোধ করে নাই। আর আজ সে সব গৌরবের অবদানকাহিনী কথা ও কাহিনী হইয়াই রহিল। Cause apart have an enjoyable evening লিখিয়াও রাজবন্দী তহবিলের সাহায্যার্থ টিকিটও বিক্রয় হইল, প্রাসাদোপম সৌধ মধ্যে কৌতূহলী লোলুপ দৃষ্টির সামনে যুবক-যুবতী যৌবনের জয়যাত্রার ধ্বজা উড়াইয়া সুদূর সন্দ্বীপের সর্পাঘাতের ও সাগরপারের মান্দালয়ের নির্জ্জন কারার দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিশ্ববীণার তার বাঁধিয়া বিশ্বজনকে মোহিত করিয়া দিল।

কবিবর, রাজবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যেদিন আপনার চরণধূলি মাথায় লইতে যাই, সেদিন আপনার গৌরবান্বিত আশীর্ব্বাণী ও স্নেহের শির-স্পর্শনে যে রাজটীকা পরিয়াছিলাম, আজ তাহা মুছিয়া গেল। আজ একাদশ বৎসর যাবৎ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া দারিদ্র্যের সেবা করিয়া যমজ্বালায় হার না মানিয়া, আধিব্যাধির মোহ কাটাইয়া যে উপমঞ্চে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম, সে মঞ্চের সমস্ত ভিত্তি আজ ডুবিয়া গিয়াছে, সে আসন আজ ধূলিতে লুটাইয়াছে, সে আত্মপ্রসাদ আজ আত্মবঞ্চনা বলিয়া ঠেকিয়াছে। বিদেশী আজ আমাদের রাজবন্দীদের অনুগ্রহের পাত্রই দেখে, আর আমার স্বদেশী পাত্রমিত্র প্রমাণ করিয়াই দিলেন যে, তাহারা অনুগ্রহের পাত্রই বটে। একদিন মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বা উষার অরুণ আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে তাই চারিদিকে আমরা ভৈরোর উদাত্ত সুরের আলাপের ললিত বিভাসের আগমনীর ঝঙ্কারের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম; কিন্তু আজ দেখিতেছি রাত্রি অতি গভীর;—তাই পোড়াবাজারের মাঠে যুবতী-সেবিত চায়ের পেয়ালার পাশে কেলনারের মদের গ্লাস শোভা পায়, চৌরঙ্গীর নটশালায় "কুটিল নয়ন ছলের বাঁধনের" জন্য কিশোরীদের ব্যাপৃত থাকিতে

হয়, আর বিদ্যাস্থানে সাগর ঢেউএর ঝাঁপান নাচে আবাহন করিতে দেশ খাম্বাজের আবাহন গীতি-মুখরিত হইয়া উঠে। তাই যদি সত্য হয়, তবে হে আমার চির অভাবগ্রস্ত, দৈন্য পীড়িত গৃহস্থ দেশবাসী, ঘুমাও, ঘুমাও, রাত্রি বড় গভীর!

বিনীত—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ,
কলিকাতা

২। রাজবন্দী-সাহায্যভাণ্ডারে "নৃত্য-গীত ও জল্সার" প্রতিবাদ

(কতিপয় দুঃস্থ রাজবন্দীর নিবেদন)

দুঃস্থ রাজবন্দীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি "ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে" ভদ্র যুবক-যুবতীগণ দ্বারা নৃত্য-গীতাদি আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়াছেন। রাজবন্দিগণকে সাহায্য করিতে যাঁহারা স্বতঃই অনিচ্ছুক, অন্ততঃ আমোদ প্রমোদের প্রলোভনেও তাঁহারা কথঞ্চিৎ মুক্তহস্ত হইতে পারেন, উদ্যোক্তাদের মনের ভাব সম্ভবতঃ ইহাই।

অবশ্য একথা সত্য যে, অধিকাংশ মুক্তিপ্রাপ্ত অথবা অন্তরীণে আবদ্ধ রাজবন্দীরা এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ রাজরোষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এবং অনেকের দারিদ্র্য অপরিসীম। দেশবাসী সম্মিলিতভাবে সাহায্য না করিলেও সহৃদয় বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে কেহ কেহ দু-মুঠা অন্ন পাইয়াছেন। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত যেখানে সাহায্য প্রদত্ত হয়, সেখানে দৈন্য অপমানিত হয় না।

কিন্তু রাজবন্দীরা তাঁহাদের সাংসারিক দুঃখকষ্টের জন্য কদাচিৎ সাধারণের দ্বারস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য আছে, এত বড় অভিমান ও দাবী তাঁহারা রাখেন না। দেশবাসী তাঁহাদের জন্য কতটুকু ব্যথা অনুভব করে, ভিক্ষার পরিমাণ ও প্রকার দিয়া তাহা পরিমাপ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহাদের কোন দিন হয় নাই;

তথাপি শ্রদ্ধেয় জননায়কগণ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি হয় নাই,—কেননা জননায়কগণ দেশবাসীর শ্রদ্ধার দানই চাহিয়াছিলেন।

দারিদ্র্য, লজ্জার বিষয় নহে—বিশেষতঃ রাজবন্দিগণের দারিদ্র্য কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বতঃই কুণ্ঠা হয়। আর যদি সে সাহায্য শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ের সম্পর্কবিহীন কৃপার দান মাত্র হয়, তাহা হইলে বুঝি বা সাহায্য গ্রহণের লজ্জা মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে। দেশবাসী যদি শ্রদ্ধায় সাহায্য না করিতে পারেন, তাহা হইলে আমোদ-প্রমোদের প্রলোভনে সাহায্য করিয়া রাজবন্দিগণের দুর্দ্দশাকে অধিকতর শোচনীয় করিবেন না,—এ অনুনয় আমরা অতি দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি।

রাজবন্দিগণ এতকাল যে ভাবে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছে, অতঃপরও সেইভাবে তাহা সহ্য করিবার বলের অভাব তাহাদের হইবে না; কিন্তু এরূপ লজ্জাকর উপায়ে সংগৃহীত অর্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা আরও কঠিন। সুতরাং আমাদের বিনীত অনুরোধ এই ভাবে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া রাজবন্দিগণের দারিদ্র্যকে অবমানিত করিতে দেশবাসী বিরত হউন।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—১২ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৪

৩। রাজবন্দীদের সাহায্যার্থ নৃত্যগীত

("আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদককে লিখিত)

আপনি যে আপনার কাগজে জাতীয় জীবনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কেশবচন্দ্র, আনন্দমোহন, শিবনাথ, কালীচরণ, বিবেকানন্দ ও অশ্বিনীকুমারের যুগ অতীত হইয়াছে। এখন আর্ট, সৌন্দর্য্য ও বাস্তবতার নামে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহাতে আমরা প্রাচীনতন্ত্রের লোক অনেকে বেদনা ও লজ্জা অনুভব করি। কোনও প্রকার আমোদের প্রলোভন দেখাইয়া সৎকার্য্যের জন্যও

অর্থ সংগ্রহ করা আমি সঙ্গত মনে করি না। সৎকার্য্যটি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে না পারে, আমোদের নামে লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহাতে মহৎ অনুষ্ঠানটিকে খাটো করা হয়, অপরদিকে মানুষকেও খর্ব্ব করা হয়। কিন্তু এই আমোদে যদি আবার আমাদের কন্যাস্থানীয়া, ভগ্নীস্থানীয়া নারীগণকে উপস্থিত করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, তাহা জাতীয় জীবনের কলঙ্কের কথা। বর্ত্তমান সময়ে যে স্রোত আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ তাহাতে যেরূপ ভাবে উৎসাহ দিতেছেন, তাহাতে এই স্রোত কোথায় যাইয়া পৌঁছিবে, কে বলিতে পারে? উদ্দেশ্য ভাল হইলেই হয় না, উপায়ও নির্দ্দোষ হওয়া প্রয়োজন। "আগুন লইয়া খেলা করিও না"—দেশসেবক ভক্ত অশ্বিনীকুমার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের কল্যাণীয়া বালিকাগণ যে সকল স্থানে আমোদ প্রদর্শন করেন, সেখানে নানা শ্রেণীর এত লোক কেন সমবেত হয়? সে কি মহৎ কাজের সাহায্যের জন্য? দেশের নেতৃবর্গের এখন চিন্তা করিবার সময় হইয়াছে,—দেশকে কোন্ পথে চালিত করিতে হইবে। এই শ্রেয়ের পথ—এই প্রেয়ের পথ, এই জীবনের পথ—এই মৃত্যুর পথ;—ভারতের পুত্রকন্যাগণ কোন্ পথে যাইবে? আপনারা যে অনেকের বিরাগভাজন হইয়াও দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের পুত্রকন্যাগণের কল্যাণের জন্য লেখনী চালনে অগ্রসর হইয়াছেন, এ জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ভগবান আপনাদের এই ধর্ম্ম-সংগ্রামে সহায় হউন।

শ্রীললিতমোহন দাস
২১০।৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
"আনন্দবাজার পত্রিকা"—১৮ই মাঘ, ২৮-১-২৮

৪। বেদনার উপরে অপমান

গত ২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতাবাসী বাংলা দেশের দুর্ভাগ্যদগ্ধ ললাটে এক দুরপনেয় কলঙ্ক-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

তাহারা প্রমাণ করিয়াছে, রাজবন্দীদের জন্য কাহারও আন্তরিক সহানুভূতি নাই! তাহারা দেখাইয়াছে, রাজবন্দীদের দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার পরিবর্ত্তে শুদ্ধান্তঃচারিণী নারীদের নৃত্য গীত উপভোগ করিয়া পুলকিত হইবার বাসনাই সকলের হৃদয়ে প্রবল;—তাহারা বুঝাইয়া দিল মানুষের হৃদয়ের স্বর্গীয় করুণাধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাই আজ নির্য্যাতিত পদদলিত আর্ত্তজনকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির জন্য কঠিন পাষাণস্তর খনন করিতে হইবে।

গবর্ণমেন্ট এই বন্দীদিগকে যে-ভাবে নির্য্যাতন করিতেছেন, তাহা সহ্য করা যায়,—কারণ সেই সহিষ্ণুতায় একটা মাহাত্ম্য আছে,—একটা গৌরব আছে। কিন্তু আজ তাহাদের স্বদেশবাসী তাহাদিগকে যে অপমান করিল, তাহার যন্ত্রণা যে আরও ভীষণ! বন্দীরা উপবাসী আছে,—নিদ্রার সুখ তাহাদের নাই,—মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে,—তাহারা সঙ্গিহীন একাকী দূর দেশান্তরে আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ক্রোড় হইতে চিরভ্রষ্ট। এত দুঃখের মধ্যে আজ কি তাহাদিগকে তাহাদের অন্তঃপুরিকা মাতা ভগ্নীদের লজ্জা-সম্ভ্রম-বিক্রয়লব্ধ-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? ছিঃ—ছিঃ তার পূর্ব্বে এই বাংলা দেশ কেন রসাতলে যায় না?

আমরা দেখিয়াছি, সেদিন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সম্মুখে রাজপথ রোধ করিয়া শত সহস্র মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, সেই মোটরবিহারীরা কি ধনী নয়?—আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, প্রত্যেক মোটর হইতে দুই টাকা করিয়া লইলেও সেই মুহূর্ত্তে দেড় হাজার টাকা চাঁদা আদায় হইত! কিন্তু তা নয়,—লোকে আমোদ চায়,—বন্দীর দুঃখে কার প্রাণ কাঁদে?

আমরা জানি, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কলিকাতা হইতে থিয়েটারের দল যাইয়া অর্থ শোষণ করিতেছে। তথাপি স্বীকার করি বাংলা দেশ দরিদ্র!—বাঙ্গালী যদি দরিদ্র হও,—তবে থাক্, বন্দীর ভাণ্ডারে অর্থদান করিও না। তাহাতে নিন্দা নাই। কিন্তু মাতা ভগ্নীদের মানসম্ভ্রম বিক্রয় করিয়া দেশকে অধঃপাতে দিও না।

কংগ্রেসে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জন্মগত অধিকার হইতে এই বন্দিগণ বঞ্চিত। স্বাধীনতার বেদীমূলে এই বন্দীরা আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। রাজবন্দী ভাণ্ডারের প্রবর্ত্তক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও বাংলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই স্বাধীনতার উপাসকগণের সম্মান কিরূপে রক্ষা করিবেন,—তাহাই আমরা দেখিব। বাঙ্গালী কুলমহিলার লজ্জাশীলতা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, আমরা আশা করি রাজবন্দী ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন।

আমরা শুনিতেছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সেই বৃহস্পতিবারের ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের নৃত্য গীতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন। কুলমহিলাদিগকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়া তাহাদের নৃত্য গীতাভিনয় উপভোগ করা রবীন্দ্রনাথের পুরাতন অভ্যাস। তাঁহাকে আমরা বহু বার নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু আমরা সুভাষচন্দ্রের নাম শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছি। তিনি নিজে রাজবন্দী ছিলেন,—বন্দীর দুঃখ ও আত্মমর্য্যাদা তিনি যেমন বুঝেন, এমন আর কেহ নয়। বাংলা দেশ তাঁহাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যদি এইরূপ গর্হিত কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে তাঁহাকে আর কেহ সম্মান করিবেন না।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ রবীন্দ্রনাথের নিকট একখানি খোলা চিঠি দিয়াছেন। কতিপয় দুঃস্থ রাজবন্দী "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, বন্দীদের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা এ দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

আমরা আশা করি, বাংলা দেশের জনসাধারণ কলিকাতার লোকের এই অপমানজনক কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিবে।

সেদিন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বন্দীদের সাহায্যের নিমিত্ত যে আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সহযোগী "বাংলার কথা" তাহার নাম দিয়াছেন, "রসের আসর"। সহযোগী উহার যে বর্ণনা করিয়াছেন,

তাহাতে বন্দীদের প্রতি সমবেদনার লেশমাত্রও দেখা যায় না। তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে, দর্শকেরা সেখানে কি হৃদয় লইয়া কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিল। আমরা সে বর্ণনা পাঠ করিয়া লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছি। বন্দীদের জন্য দুঃখবোধ দূরে থাক,—নিজের দেশের পুর-মহিলার সৌন্দর্য্য, শালীনতা ও নারীত্ব লইয়া যাহারা এরূপ অশ্লীল কটাক্ষ করিতে পারে, তাহারা কি মানুষ? আমেরিকায় মিস্ মেয়ো অজ্ঞতা হেতু অথবা অসূয়ানিবন্ধন ভারত নারীকে যে অপমান করিয়াছিল, তাহাতে সমগ্র দেশ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় লোক নিজের অন্তঃপুরের মাতৃস্থানীয়া ও ভগিনীস্বরূপা মহিলাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য লইয়া যে ঘৃণিত ইঙ্গিত করিয়াছে, তাহাতে কাহারও প্রাণে কি ব্যথা লাগে না? আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সামান্য একটুখানি অংশ ১৫ই মাঘের "বাংলার কথা" হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কিন্তু সবার শেষে—

"রঙিয়ে গেল হৃদয় গগন সাঁঝের রঙে"

"শ্রীমতী—র অস্পষ্ট সাগর নৃত্য! সাগরের যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু তরঙ্গ আর তরঙ্গ—ছোট বড় মাঝারি। কখনো তাহারা তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, কখনো পুলকভরে লুটাপুটি করিতেছে, আবার কখনো বা উচ্ছলিত আবেগে শিহরিয়া উঠিতেছে! শ্রীমতী—সুষ্ঠু দেহবিভঙ্গ ও সুচারু চরণছন্দের মধ্যে ইহার যে আলেখ্য ফুটাইয়া তুলিলেন, তাহা একেবারে অনুপম! তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরের ছন্দের যে আলোড়ন খেলিয়া গেল, তাহা শুধু চোখ দিয়া দেখিবার নয়,—অন্তর দিয়া অনুভব করিবার জিনিষ! গানের বাণীকে বাদ দিয়া গতির মধ্যে তাহার ছন্দরূপকে ফুটাইয়া তুলিতে তিনি যে দক্ষতা দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। নবনৃত্যকলার রেনেসাঁসে শ্রীমতী—র নাম অবশ্যই অন্যান্য পুরোবর্ত্তিনীদের মধ্যে স্থান লাভ করিবে।"

"বাংলার কথা"র পরিচালক ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী।

ইহা স্বরাজীদের সংবাদপত্র। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুও তাহার পশ্চাতে আছেন। ইঁহারা বন্দীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া সকলে জানেন। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া বন্দীদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। তাঁহারাই অর্থ সংগ্রহের জন্য নাচগানের মজলিস বসাইয়াছিলেন। এখন দেখুন, তাঁহারা কি প্রকার মন লইয়া সেই নৃত্যগীত দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমরা জানি ব্যভিচার কেবল শারীরিক ব্যাপার নহে;—মনের মধ্যে ইহার প্রকাশ আরও ভীষণ! যাহারা বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির ছলে, আর্টের দোহাই দিয়া নারীর সম্বন্ধে এরূপ অশ্লীলভাব চিন্তা করিতে পারে,—আবার তাহাদের সেই দূষিত চিন্তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে সাহাসী হয়,—তাহাদিগের উপযুক্ত শাস্তির কথা ভাবিতে গেলে মনে হয়, যে-যুগে নারীর অবমাননাকারীকে প্রকাশ্য রাজপথে কশাঘাত করা হইত, অথবা মৃত্তিকায় অর্দ্ধ প্রোথিত করিয়া ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দ্বারা দংশন করান হইত, সেই যুগের লোকেরা বুঝি আমাদের অপেক্ষা সভ্য ছিল।

"সঞ্জীবনী" ২৬এ মাঘ, ১৩৩৪

৬। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র মন্তব্য

সংসারানভিজ্ঞা বালিকাদিগকে দোষ দিয়া কোন লাভ নাই। সহজবিশ্বাসী বালিকা ও যুবতীরা 'জনহিতকর কার্য্য করিতেছি'—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়াই এ সকল ব্যাপারে অগ্রণী হয়—পরিণত মনের দূরদৃষ্টি এবং বিচারবুদ্ধি তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু এই যে ধারা আরম্ভ হইয়াছে,—তাহা যে সমাজের পক্ষে সকল দিক দিয়াই কল্যাণের নহে, ইহা এই সময় অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের উৎসাহদাতাদের সর্ব্বাগ্রে বুঝা আবশ্যক, বিবিধ হিতকর কার্য্যে সাহায্যের অছিলায়, ভদ্রঘরের কুমারীবৃন্দকে লইয়া মাঝে মাঝে যে নৃত্যগীতাদির আয়োজন হইতেছে—সংযমশীলতার তটবন্ধনে তাহা কতদিন বাঁধা থাকিবে? দশ রকম রুচির লোক একত্র হইবার সুযোগ পায়

যেখানে—সেখানে ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ, যে কোন মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে। নারী-স্বাধীনতা চাহি—কিন্তু তাহা প্রাচ্য প্রথাতেই হওয়া উচিত। ফিরিঙ্গিয়ানার বাহুল্য দেখিলেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা না করিয়া পারা যায় না।

৯। ভদ্রঘরের থিয়েটার

আজকাল ভদ্রঘরের কুমারী বা বিবাহিতা মেয়েদের নাচ গান, অভিনয়, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবার একটা রেওয়াজ চলেছে। কলকাতায় এমনি অভিনয় মাঝে মাঝে হচ্ছেই। এমনি ধারার অভিনয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে অনেক হোমরা চোমরা পুরুষ ও মেয়েও দেখতে পাই।

কয়দিন হয় এমনি ধারা মেয়ে-পুরুষে মিলে এম্পায়ার থিয়েটারে 'আলিবাবা'র নৃত্য চলেছে। এর প্রডিউসার কে একজন মধু বোস। অভিনয় কচ্ছেন মিস্ সুনীতা রায়, মিঃ এস হালদার, মিঃ কুনাল সেন, মিঃ ডি ঘোষ প্রভৃতি। একি 'নব বৃন্দাবনে'র দলই 'আলিবাবা'য় মেতেছেন কিনা বোঝা গেল না। মর্জ্জিনা, ফতিমা প্রভৃতি সেজে মিস্-রা যথন নাচ গান ও অভিনয় কলা দেথান তথন বোধ হয় সুন্দর মানায়!

গুজব শুনেছিলুম এই 'আলিবাবা' অভিনয়ে গোখলে মেমোরিয়ালের মেয়েরাও যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু সংবাদপত্রে কোন ওয়াকিব হাল পত্র-প্রেরক জানিয়েছেন যে, এতে গোখলে মেমোরিয়ালের মেয়েরা যোগ দিচ্ছেন না, তবে এ অভিনয় হতে যে অর্থাগম হবে তা ঐ মেয়ে বিদ্যালয়ের সাহায্যে যাবে।

প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের ও কিশোরীদের অভিনয় কলা, নৃত্যপটুতা দেখিয়ে অভিনয়কে মনোজ্ঞ ও অর্থকরী করবার চেষ্টা কেউ কেউ দেখছেন। যে সব ভদ্রঘরের মেয়েরা এতে যোগ দিচ্ছেন তাঁদের

নিজেদেরও অভিনয়ের লীলার মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে—আর মেয়েদের অভিভাবকদেরও যে সম্মতি আছে তা বোঝা যাচ্ছে !

*

এই রকম ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্য থিয়েটার যে রকম ঘন ঘন চলছে আর তাতে রবীন্দ্রনাথ, সরলাদেবীর মত লোকও যখন পাণ্ডা হচ্ছেন তখন মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই দলের জন্য আলাদা রঙ্গালয় তৈরী হতে পারে কিম্বা প্রকাশ্য কোন সম্ভ্রান্ত রঙ্গালয়েও কেউ যোগ দিতে পারেন। বাংলার সমাজ-জীবন ও চলিত প্রথার কাছে এ একটা মহা সমস্যার কথা !

*

পাশ্চাত্যে কুমারী নারীর অভিনয়, স্বামী স্ত্রীতে অভিনয়, কিম্বা বিবাহিতা নারীর একক অভিনয় চলিত ব্যাপারই হয়ে গেছে, অনেক অভিনেত্রী বড় ঘরের ঘরণীও হচ্ছেন। কিন্তু তাদের সমাজ ও আমাদের সমাজ অনেক বিভিন্ন, তাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীরও আমাদের সঙ্গে মোটেই মিল নেই বল্লেই চলে।

*

এ ধরণের অভিনয়ে সমাজে উজান চলবে—না ভাটি ধরবে, জীবনে বড় আনন্দের সন্ধান বেশী মিলবে—না নিরানন্দ গভীর হবে ; তা দর্শক ও অভিনেত্রীরা চিন্তা করতে পারেন।

*

সহযোগী "আনন্দবাজার" লিখেছেন—"হিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্যের জন্য ভদ্রঘরের যুবতী ও বালিকাগণের নৃত্য-গীতির ব্যবস্থা করা রেওয়াজ হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাদায়, বন্যাদায়, সর্ব্বপ্রকার সুযোগেই, এই শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি রাজবন্দী সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্যও ঐ প্রকার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে। ইহাতে বহু রাজবন্দী মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বালিকাগণের নামের তালিকাদ্বারা সাধারণের মনকে প্রলুব্ধ করিয়া

অর্থ সংগ্রহ করার বিরুদ্ধে ইঁহারা যে ভাবে প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। আধুনিকতার দোহাই দিয়া, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের পক্ষপাতী, অগ্রসর ও উন্নতিশীল তরুণ-তরুণীদের দয়ার ক্ষেত্র তো বহু বিস্তৃত, অতএব ভরসা করি তাঁহারা অনিচ্ছুক রাজবন্দী-দিগকে, নৃত্যগীতলব্ধ সাহায্য গ্রহণের দায় হইতে অব্যাহতি দিবেন।"

এ সম্বন্ধে সহযোগী 'সঞ্জীবনী' এর চেয়েও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

আনন্দবাজার লিখেছেন—"কন্যাদায় বন্যাদায় সর্ব্বপ্রকার সুযোগেই, একই শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।" এই ব্যাপারে শুনছি নেপথ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আছেন, আর প্রকাশ্যে আছেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। দিলীপবাবু তাঁর দলবলসহ এমনি অভিনয় লীলা মাঝে মাঝে দেখিয়ে শুনিয়ে থাকেন বটে তবে সুভাষবাবুর নাম বোধ হয় আগে কখনো শোনা যায়নি।

"হিন্দু"—২য় বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা

৮। অন্তঃপুরে দুর্নীতির প্রসার

পল্লীবাসা লিখিতেছেন,—"মাতৃমন্দিরে"র সুরুচির অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটার হলে বাঙ্গালী মহিলাগণ রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা" পুস্তকখানির যে অভিনয় করিয়াছিলেন, সহযোগী তাহা সমর্থন করিয়াছেন। অথচ "সঞ্জীবনীর" মত অত বড় উদারতন্ত্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপাসকও উহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। ভদ্রঘরের কন্যা বধূরা প্রকাশ্য থিয়েটারে নটীদের মত নাচিয়া গাহিয়া সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করিতেছেন। এ চিত্রে যতই অভিনবত্ব থাকুক, ইহা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। সমাজদেহ পাপের বিষে বিসর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও সকলে সাবধান হউন!

"সঞ্জীবনী"—২৬শে মাঘ

৯। অপূর্ব্ব নারীমঙ্গল

আজকাল এদেশে নারীমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। অবশ্য পুরুষরাই ইহার প্রধান উদ্যোগী। সঙ্গে সঙ্গে উদারনীতির উপাসিকা নারীরাও ইহাতে যোগ দিয়াছেন। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্ম। তথাকথিত হিন্দুই হউক বা ব্রাহ্মই হউক, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য, যাঁহারা নারীদের মঙ্গলের জন্য এত উৎকণ্ঠিত, তাঁহারা নিজেদের মঙ্গলসাধনে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যাহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, তাহারা আবার অন্যের সিদ্ধিসাধনে সহায়তা করিবে কি? যে নিজে সাঁতার শিখে নাই, সে কি করিয়া অন্যকে সাঁতার শিখাইতে পারে? ফলে, এদেশে নারীমঙ্গলের যে সব অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। কলিকাতার দক্ষিণে—ভবানীপুরের পোড়া-বাজারে —'কিং কার্ণিভালে'র আখড়ায় সম্প্রতি যে নারীমঙ্গল প্রদর্শনী বসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল সেন নামক এক ভদ্রলোক তাহা দেখিয়া আসিয়া "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় লিখিয়াছেন,—

"পোড়াবাজারে যে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে, তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। নারীমঙ্গলের চিহ্ন সামান্যই পরিলক্ষিত হইল। যে সমস্ত বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়াছি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বর্ণনা করিতে চাহি না। সব চাইতে যাহা আমাকে পীড়া দিয়াছে তাহা এই,—বালিগঞ্জ ও ভবানীপুরের কয়েকটি ভদ্রপরিবারের বয়স্ক ছেলে ও মেয়েরাই দেখিলাম 'কার্ণিভাল গ্রাউণ্ড'কে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। ইতর, ভদ্র, মুসলমান, হিন্দুস্থানী সকলের মুখেই ঐ সকল বাড়ীর মেয়েদের—বিশেষ করিয়া একটি সুরূপা যুবতীর—সম্বন্ধে রসিকতা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আমি নিজে নিজে সমস্ত ঘটনা সঠিক জানিবার জন্য একটি ষ্টলে চা খাইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, কোনো বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা (এক মহিলাও তাঁহাদের একজন) চা, কেক্ ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছেন। বারবনিতা সঙ্গে লইয়া মত্ত লোকেরা সেখানে চা খাইতেছে, কুৎসিত

রসিকতা ও অঙ্গভঙ্গী করিতেছে এবং চায়ের দোকানের মেয়েদের সম্বন্ধে অবাধে আলোচনা চালাইতেছে। একটি ষ্টলে তিনজন ভদ্রলোক চা খাইতেছিলেন, একটি কোটপ্যাণ্টধারী ছোকরা তাঁহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কিছু দেব?' তিনি বলিলেন, 'না থাক'। ছোকরাটি বলিলেন, 'ও! মেয়েদের না পাঠিয়ে দিলে বুঝি কিছু খাবেন না?' এই বলিয়া তিনি তাঁহারই সম্পর্কিত কোনো মহিলাকে সেখানে ডাকিয়া দিলেন। একটি ষ্টলে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খাওয়ার পর বিল পাইয়া পাঁচ টাকার একটি নোট দিলেন, তাঁহাকে বাকী পয়সা ফেরত দিতে গেলেন অপর একটি মহিলা। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একগাল হাসিয়া বলিলেন, "লিয়ে যান, লিয়ে যান।" এই সব কাণ্ড যখন ভদ্রসমাজেই চলিতেছে, তখন আর আমাদের সভ্য হইবার বাকী কি? আমি বৃথা দুঃখ করিতেছি হয় ত। মনের দুঃখে চায়ের ষ্টল হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, এক্‌জিবিসনের লোকসংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইতেই দেখি, ষ্টলের মহিলারা (বোধ হয় ষ্টল বন্ধ করিয়া) বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের পিছনে তিন স্তরের লোক। এক স্তর এঁদেরই সম সমাজের কয়েকটি ছোকরা। দ্বিতীয় স্তর, সাধারণ ভদ্রলোক এবং তৃতীয় স্তর গুণ্ডা শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান।"

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

"বঙ্গবাসী"—১৪ই মাঘ, শনিবার ১৩৩৪

১০। বেথুন কলেজে নারীর ব্যায়াম

প্রতি বৎসর ১২ই ডিসেম্বর "এম্পায়ার ডে" উপলক্ষে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল ছাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গত ১২ই ডিসেম্বর রুশিয়ার এক নারীর ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। সভাস্থলে শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন, উক্ত নারী যেরূপ পোষাক পরিয়া দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের

নর-নারীর নিকট শ্লীলতাবিহীন বলিয়াই গণ্য হয়। তিনি গ্রীস দেশের উলঙ্গ নর নারীর ছবি দেখাইয়া নিজেও সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়াছিলেন। উলঙ্গ নর-নারীর ছবি প্রদর্শন করাতে ছাত্রীগণ অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করে, এবং দুই চারি জন ব্যতীত অপর সকলেই সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

"সঞ্জীবনী"

সমালোচনা

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা (প্রথমভাগ) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পি এইচ-ডি। এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সকলেরই পড়া উচিত; তবে বঙ্গীয় যুবকগণকে বিশেষ ভাবে পড়িতে অনুরোধ করি।

তাম্বুল বণিক—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত। তাম্বুলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস। এই সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে দৃষ্ট হয়।

হাডুডুডু—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ। বালক ও কিশোরগণ ইহা পড়িলে হাডুডুডু খেলার অনেক নূতন কৌশল শিখিতে পারিবে।

ধ্রুব ভারত—স্বামী বেদানন্দ (ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ)। কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমাবেশ।

ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা— শ্রীরামচন্দ্র দত্ত। সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের পাঠ্য। গোঁড়ামি নাই।

আর্য্য সমাজ কাহাকে বলে?—অনুবাদক শ্রীরমেশ-চন্দ্র দত্ত, এম-এ। "আর্য্যসমাজ-কেয়া হায়" নামক হিন্দি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

আত্মোন্নতি—শ্রীভুবনমোহন দাস, এম-এ। গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—মুক্তি প্রতিপাদন।

বালিকা জীবন—বঙ্গমাতা প্রণীত। বহিখানি চমৎকার। সকল বালিকার হাতে হাতে ইহা থাকা উচিত।

নচিকেতা—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা-সংবাদ বালকদের উপযোগী করিয়া নাটকে লিখিত। বেশ হইয়াছে। ইহা অভিনীত হইলে বালকগণ শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই পাইবে।

The path to Parfection by Swami Ramkrishnananda. তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ—হইতে প্রকাশিত। বহিখানি আকারে ছোট হইলেও অপূর্ব্ব। কাগজ ও ছাপা ভাল।

সংঘ-বার্ত্তা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসব

বিগত ১৩ই ফাল্গুন বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অতি প্রত্যূষ হইতে ষ্টীমার, নৌকা, ট্রেন, বাস্ ও প্রাইভেট গাড়ীতে ভক্ত সমাগম আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণ বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় বিশ সহস্র ভক্ত নরনারী ভগবানের প্রসাদ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। মিঃ বি, কে, দত্ত (আহিরীটোলা) চা ও সরবৎ, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু এবং ইটিলী—শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়ের ভক্তগণ সিগারেট ও পান তামাক খাওয়াইয়া সকলের শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন। মৃদঙ্গ সহযোগে বৈঠকী গান, আঁতুলের কালী-কীর্ত্তন, দক্ষিণারঞ্জন বাবুর ও বরানগর পার্টির কনসার্ট, বৌবাজার—মদন বড়াল লেনের ও হাবু (দত্ত) বাবুর কীর্ত্তন-ঝঙ্কারে মঠ-ভূমি আনন্দমুখরিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চিত্রকরের নানারূপ বাজি, আকাশে যেন মায়া-কানন সৃজন করিয়াছিল। সর্ব্বোপরি—প্রায় দুই লক্ষ নরনারীর মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিয়া কর্ম্মিগণ যেভাবে সমস্ত দিন বিপুল উদ্যমে কাজ করিয়াছিলেন—তাহা দেখিবার জিনিষ।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের সাময়িক মিলন এবং ভক্তি ও কর্ম্মের একীভূত ধারা কবে সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইবে ?

সরিষা আশ্রমে পারিতোষিক বিতরণ

গত ২৯শে জানুয়ারী সরিষা (ডায়মণ্ড হার্‌বার্‌) শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমে বালক-বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী বিজয়ানন্দ ও স্বামী পবিত্রানন্দের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সময়োপযোগী সুললিত বক্তৃতায় পল্লীবাসী ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও সমারোহে ৺সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে। সরস্বতী পূজার দিনের বিদ্যালয়ের দৃশ্য বায়স্কোপে ফিল্মে ছবি তোলা হয়; সেইটি আবার বিসর্জ্জনের দিন বিদ্যালয়ের মেয়েদের দেখান হয়। সেই সঙ্গে একটি ছোট মেয়ের দুষ্টামীভরা খেলার ছবি ও কৃষ্ণ-সখা সুদামার ছবিও প্রদর্শিত হয়। ছোট মেয়েদের এইগুলি বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। দেবী-মূর্ত্তির পরিকল্পনা অতি সুন্দর হইয়াছিল, যেন সাধক-হৃদয়ের ধ্যানের ছবি মূর্ত্ত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের শ্রীপঞ্চমীর একটি বিশেষত্ব এই যে, এইটি মেয়েদের বাণী পূজার উৎসব; পূজারিণীও তাঁহারাই, পুরোহিতের মধ্যস্থতাও এ-পূজায় তাঁহারা গ্রহণ করেন না। আর একটি বিশেষত্ব,—ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে বালিকাগণের যুক্তহৃদয়ের আনন্দোৎসব দেবী সরস্বতীর অর্চ্চনায় পূজাকে সত্য-সত্যই প্রাণবন্ত করে। পূজার দিন বৈকালে ছাত্রীগণের সমবেত সঙ্গীত, বাণী বন্দনা, স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে সঙ্গীতে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী, কিছু কিছু অভিনয় ও ছোট মেয়েদের ড্রিল প্রভৃতি হইয়াছিল। এগুলি বাস্তবিকই চিত্তমুগ্ধকর হইয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে

বেসক্! বন্ধু, বেসক্!—এত কথা কাটাকাটির পর—যেনাস্য পিতরো যাতাঃ!—বাপ দাদার ধর্ম্ম ছাড়তে পারবো না! বলি, বাপ দাদা যদি বদ খেয়ালী করে যায় তা হলে সেটাও কি বাইবেলের obedient ছেলের মত পালন করে যেতে হবে? ওটা আর কারুর বাপ দাদার ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু আমাদের বাপ দাদার ধর্ম্ম যে নয় সেটা তিন সত্যি করে বলতে পারি। ধীবর কন্যার মহামহিম পুত্র ব্যাসের মহাভারতখানা পড়লেই ও-সমস্যা বিলকুল খোলসা হয়ে যায়। তুমি ত খুব বিবেকানন্দ ভক্ত! বৈঠক খানায় নগদ বার আনা পয়সা খরচ করে তাঁর মস্ত ছবি টাঙিয়ে রেখেছ! তিনি যে বলচেন—যেনাস্য-পিতরো-ধার্ম্মিকদের গতি হচ্ছে—পচে খসে পোকা পড়ে মরা। ঐ বাপ দাদার ধর্ম্ম আমাদের এমন কাওয়াজ করিয়ে দিয়েছে যে আমরা সকলে এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই; ফলে প্রাণপাখী গ্যাচে উড়ে—ঘুরচে কতকগুলো রক্তমাংসের যন্তোর, ঠ্যাঙালে হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। তবে রক্ষে এই যে, এই বাপ দাদাগুলো আমাদের আসল বাপ দাদা নয়—ওগুলো হচ্চে পিরামিডের মমি-ভূত, আমাদের বাপ দাদার মূর্ত্তি ধরে এসে আমাদের আষ্টে পিষ্টে শিকলি দিয়ে বেঁধে গ্যাচে। আমাদের আসল বাপ দাদারা যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্রষ্টা, সত্যবাদী হলে গণিকাপুত্রকেও উপনীত করতো, যুদ্ধে অগ্নি-বাণ বরুণ-বাণের ব্যবহার জানতো, ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিরত হলে তাদের বলতো অনার্য্য, ক্লীব; তারা কি "য পলায়তি স জীবতি"—এরূপ অপূর্ব্ব অহিংস মত আবিষ্কার করতে পারে,

না "দূরমপসর রে চাণ্ডাল"—বলে বেদান্ত প্রচার করতে পারে? কিংবা স্বর্ণমুদ্রার চাকচিক্য দর্শন করতঃ প্রমুদিত অন্তকরণে অতি গোপনে ও অতি সন্তর্পণে, অতি বড় কাট্‌ঠোকরা পণ্ডিতও সহসা ultra-liberal হয়ে সব রকমের সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হতো? অথচ দরিদ্রের এতটুকু দোষ পেলে তাকে একঘরে করে, একেবারে তার সাত পুরুষ পর্য্যন্ত যমরাজার জেলখানায় পাঠিয়ে দেবার রায় বের করতো?—কিংবা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নটাদের নরকস্থ করে, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে তাদের গলায় মালা পরিয়ে দিতো? ঐ সব ভণ্ডদেরই ত স্বামিজী মহারাজ বলেছিলেন, অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত পাঁজি পুঁথি শুদ্ধ আটল্যানটিকে ডুবিয়ে দিতে। ঐ হাজার বছরের মমিগুলো হচ্চে আবার আমাদের দেশের সমাজনেতা—যার জন্যে আজ নেতৃত্ব আর hypocrisy এক জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েচে। মিথ্যাচার religious aristocratগুলো বুঝতে পারছে না, কেন দেশের লোক বৈশ্য গাঁধিকে 'মহাত্মা' উপাধি দিলে। ওরাই ত দেশটাকে একটা "চলমান-শ্মশান" করে তুলেচে, শিল্প হয়ে পড়েচে একটা মিউসিয়ম, ধর্ম্মপুরাণগুলো কতকগুলো আজগুবি "ঠাকুর মার ঝুলি", ইতিহাস যেন "অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন"। তাই স্বামিজী বলচেন যে, যেদিন ঐ "অতীতের কঙ্কালচয়" ভারত রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় হবে সেই দিনই বেরুবে নূতন ভারত—"লাঙ্গল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলেমালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, মুদির দোকান থেকে, ভুনিওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে, ঝোড় জঙ্গল পাহাড় থেকে।" যেদিন এই ভবিষ্যৎ ভারত বেরুবে, "অমনি কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী (আগামী) ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ গুরুজী কি ফতে'" বিশ্বকে কম্পিত করবে! যার চোক আছে সে অদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি সম্পাত করুক, দেখুক আজ নরের রথে পুনরায় সারথী নারায়ণ, যে রথের ঘর্ঘর শব্দের বিজয় অভিজান সহস্র মিলের চক্রধ্বনিকে বিনম্র করে তুলেচে, যার মঙ্গল পাঞ্চজন্য অযুত ড্রেডনটের গভীর নিঃস্বনকেও স্তব্ধ করে ফেলেচে, কোটি কামানের হুহুংকার আজ শৃগাল ক্রন্দনে পরিণত! যার কান আছে সে শুনুক!

কিন্তু ভায়া ! স্বামিজী ত ব্রাহ্মণদেরই আদর্শ বলেছেন। তিনি বলেচেন সমস্ত জাতটাকে ব্রাহ্মণ করে ফেলতে।—এ কথা আমরাও মানি। আদর্শ ব্রাহ্মণই হিন্দুর আদি পিতা। বেদনিন্দুক বুদ্ধকেও একথা স্বীকার করতে হয়েচে।

ঝায়িং বিরজমাসীনং কর্তকিচ্চং অনাসবং

উত্তমথং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ॥

(ধম্মপদ ব্রাহ্মণ বগ্‌গো, ৪

যিনি ধ্যানশীল, রজোমুক্ত, একাকী অবস্থিত, কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী, পাপবিমুক্ত অর্হৎ পদপ্রাপ্ত এরূপ লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

ধিব্রাহ্মণস্‌স হন্তারং (ঐ ৭)—যে ব্রাহ্মণকে প্রহার করে তাহাকে ধিক্।

ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো (ঐ ১১)—জটা বা গোত্র বা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না।

আমরা যাদের অনুবাদ করছিলুম তা ঐ বক-ধাম্মিকদের। তারপর দেখ উপনিষদে কি আছে—

ঋষি বলচেন—

ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি—বজ্রসূচী উপনিষদ বলবো।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি—বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।

বেদবচনানুরূপং—কারণ এ বেদবচনের অনুরূপ।

শিষ্য জিগেস্ করচেন—

জীবো ব্রাহ্মণ ইতি—জীবই কি ব্রাহ্মণ ?

ঋষি। ন—না।

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈক রূপত্বাৎ—অতীত, অনাগত চাণ্ডালাদি বহুবিধ দেহ জীব ধারণ করেছে এবং করবে ; কিন্তু সকল দেহেতেই জীব এক রকমেরই থাকে।

কর্ম্মবশাদনেকদেহ সম্ভবাৎ—কারণ পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফল হেতু তাকে নানা দেহ ধারণ করতে হয়।

শিষ্য। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি—তা হলে দেহই কি ব্রাহ্মণ ?

ঋষি। ন—না।

পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ—কারণ সকল দেহই একই পঞ্চভূতে তৈরী।

জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাৎ—কারণ সকল দেহেই জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণ সমান ভাবে আছে।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ইতি—স্মৃতি যে বলছেন, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ ?

ঋষি। নিয়মাভাবাৎ—এ রকম কোনও নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না।

পিত্রাদি শরীর দহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদি দোষ সম্ভবাৎ—দেহটা ব্রাহ্মণ হলে মৃত-পিতার দেহ অগ্নিসংস্কার করলে পুত্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হতো।

শিষ্য। তর্হি জাতি ব্রাহ্মণ ইতি—তা হলে জাতটাই কি ব্রাহ্মণ ?

ঋষি। ন—না।

জাত্যন্তরজন্তুষনেক জাতি সম্ভবা মহর্ষয়োবহবঃ সন্তি—কেন-না নানা জাতি ও জন্তু থেকে ঋষিরা জন্মেছেন।

ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যকায়াম্, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ—ঋষশৃঙ্গ মৃগী থেকে, কৌশিক কুশ থেকে, জাম্বুক শৃগাল থেকে, বাল্মীক বল্মীক থেকে, ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যা থেকে, গৌতম খরগোসের পিঠ থেকে, বশিষ্ঠ উর্ব্বশী থেকে, অগস্ত কলসী থেকে জন্মেছেন, শাস্ত্রকারেরা এই রকম বলছেন।

শিষ্য। তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি—তা হলে শাস্ত্রীয় জ্ঞানই কি ব্রাহ্মণের লক্ষণ ?

ঋষি। ন—না।

ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থ দর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি—কারণ ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অনেক পরমার্থদর্শী, অভিজ্ঞ এবং পণ্ডিত আছেন।

শিষ্য। তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি—তবে কি কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় ?

ঋষি। ন—না

সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাবব্ধ-সঞ্চিতাগামি-কর্ম্ম-সাধর্ম্ম্য দর্শনাৎ—কারণ সকল প্রাণীতেই তার প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মই প্রকাশ পায়।

শিষ্য। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি—তা হলে কি ধর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয় ?

ঋষি। ন—না।

ক্ষত্রিযাদযো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি—কারণ হিরণ্যদাতা ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা জাতিতে আ ছে।

শিষ্য। তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম—তা হলে ব্রাহ্মণ বলতে কি বুঝবো ?

ঋষি। কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি গুণক্রিয়া হীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষ রহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত স্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্প মশেষ কল্পাধারমশেষভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডা-নন্দ স্বভাবাপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদি সম্পন্নোভাব মাৎসর্য্য তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহংকারাদিভিরসংস্পৃষ্ট-চেতা বর্ত্ততে এবমুক্ত লক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ—যিনি আত্মাকে অদ্বিতীয় জাতিগুণ ক্রিয়াহীন, জন্মাদি ষড়ূর্ম্মি, কামাদি ষড়ভাব প্রভৃতি দোষ রহিত এবং সত্য, জ্ঞান আনন্দ স্বরূপকে হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন, কামরাগাদি দোষ বর্জ্জিত, শমদমাদি সম্পত্তি ষট্‌ক সম্পন্ন লক্ষণযুক্ত যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ।

এখন শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ মানে কি বুঝতে পারচ দাদা ? ও সব স্মৃতি টিতি চলবে না। শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত মনু মহারাজ কি বলচেন জান—

শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয় ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ। (২।১০

বেদকে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে জানবে।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। (২।১৩)

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুদের শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

তার পর ব্রাহ্মণদের সব চাইতে যিনি বড় champion আচার্য্য শঙ্কর, তিনিও ঐ কথায় সায় দিয়েচেন—বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশ প্রসঙ্গঃ (ব্রহ্মসূ ২।১।১ ভাষ্য)—বেদ বিরুদ্ধ হলে স্মৃতিকে ত্যাগ করবে। ধর্ম্ম শাস্ত্রের authority জৈমিনীও এ কথা স্বীকার করেচেন—বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদ সতি—হ্যনুমানম্ (জৈমিনী সূ, ১,৩,৩)—শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হলেই স্মৃতি অগ্রাহ্য এবং অনুমানও অগ্রাহ্য।

কি ব্যাপার জান ? Printing এর কৃপায় শ্রুতিদেবী এখন ঘরে ঘরে উঠে সকলের জ্ঞান চক্ষু খুলে দিচ্চেন। আগে কতকগুলো অভিজাত নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্যে অধিকারবাদ প্রচার করে—যাকে আজকাল আমরা Press-Act বলি। ঐ অধিকারবাদ-Act-এর ফলে স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধু'দের কাছ থেকে 'ত্রয়ী' proscribed হয়ে গ্যালেন। Proscribed কথাটাকে আগে বলতো—"ন গোচর" অর্থাৎ যেন শুনতে না পায়। শুনলেই কানে সীসে ঢেলে দেবে, সে কালের Police Commissioner মনুমহারাজ এ ordinanceটি ঢাঁটরা পিঠে জারি করেন।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সব দেশেরই মস্তিষ্কের শৃঙ্খল ঝনঝনিয়ে খুলে পড়ে গেল—স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটলো। জড়ত্বের জমাট অন্ধকার গলতে লাগলো। There is no darkness but Ignorance—এটা হল ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির উপদেশ। স্বাধীন চিন্তা আনতে পাশ্চাত্যের মনীষীদেরও কম কষ্ট পেতে হয়নি। সেক্ষপীর যখন, Tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything, দেখছিলেন তখনও ইউরোপ কেতাবী জ্ঞানকেই একমাত্র জ্ঞান বলে জানতো। কতকগুলো উদাহরণ দিচ্চি—

একদিন বিখ্যাত Naturalist ফেবার (Fabre) ভোর থেকে আরম্ভ করে একখানা পাথরের ওপর বসে একটা পাহাড়ের গায়ে কীট-পতঙ্গদের সহজাত-জ্ঞান এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। তিন জন চাষার মেয়ে কাজে যাবার সময় তাঁকে Good day জানিয়ে

গেল। তার পর যখন তারা সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরচে, তখনও তাঁকে সেখানে বসে কীট পতঙ্গদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করতে দেখে করুণ বিদ্রূপে বলে উঠলো—pe'caire! নিরীহ বেচারি!

১৫৯১ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও পিসার হেলা স্তম্ভের ওপর থেকে দুটো পাথর (একটা আর একটা থেকে একশো গুণ অধিক ভারি) ফেলে যেদিন দেখালেন যে, সেই উঁচু জায়গা থেকে একই সময়ে তারা মাটিতে পড়ে, সেদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমস্বরে বলে উঠলেন,—

"This meddlesome man Galileo must be suppressed. Does he think that by showing us that a heavy and a light ball fall to the ground together he can shake our belief in the philosophy which teaches that a ball weighing one hundred pounds would fall one hundred times faster than one weighing a single pound? Such disregard of authority is dangerous, and we will see that it goes no further."

গ্যালিলিওর গতিরোধ করতেই হবে। নইলে আমাদের পুরাণো পুঁতি পাতা সব অবজ্ঞাত হয়ে পড়বে। এত বড় একটা সত্য অবিষ্কারের জন্য, বুড়ো বয়সে church তাঁকে গারদে পাঠিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আমাদের দেশের আর্য্য ভট্টের মতের (পৃথিবী গোল এবং নিজের মেরুর ওপর ঘোরায় দিন রাত্রি হয়) বিরুদ্ধেও ঠিক এমনি আন্দোলন হয়েছিল।

ফ্যারাডে যেদিন লণ্ডনে Royal Institution এর এক বক্তৃতায় প্রচার করলেন যে, তারের পাশে চুম্বক ধরলে তারের মধ্যে বিদ্যুতের সঞ্চার হয়, সে দিন এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

"But, Prof. Faraday, even if the effect you explained is obtained, what is the use of it?"—

অধ্যাপক ফ্যারাডে আপনার এই প্রমাণের ফল কি? তিনি একটু রসিক ছিলেন, উত্তর দিলেন, "Madam, will you tell me the use of a new born child?"—নবজাত শিশুর দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় আমাকে বোঝাতে পারেন?

ফ্যারাডের সম্বন্ধে আর একটা গল্প আছে, লিকি তাঁর Democracy

and Libertyতে লিপিবদ্ধ করে গ্যাচেন। গ্ল্যাডষ্টেশনের মত লোকও ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "But, after all, what use is it ?" এ সব করে কি হবে ? ফ্যারাডে উত্তর দিয়েছিলেন, "There is every probablity that you will soon be able to tax it"—তুমি শীঘ্রই এর থেকে অনেক ট্যাক্স আদায় করতে পারবে।

ব্যাপার কি জান দাদা, কেউ খাটতে ইচ্ছুক নয়। খেটে খুটে করে দাও, আমরা পাতা-পেতে বসে মজা ওড়াই। মনুষ্যত্বের মধ্যে, মানুষ প্রথমে ব্যাভিচার বা পাগলামী দেখে ; কিন্তু যেই সেটা প্রতিপন্ন হয়ে যায় তখনি গড্ডালিকা বলে ওঠে, "বলেছিলুম না আগে আমি এ কথা"। All wish to know, but few the price will pay (Juvenal)—জ্ঞান-রত্ন যোগাড় করতে চান সকলেই কিন্তু দাম দিতে কেউ রাজি নন। বিনি পয়সায় বা পরিশ্রমে, একটা Tip দিয়ে যত দিন না সেটা তাঁদের আয়ত্ত হয়, ততদিন তাঁরা থাকেন তার পরিপন্থী, আর লম্বা গলা করে ডাক ছাড়েন প্রাচীন, প্রাচীন। ও প্রাচীন টাচীন ঢের শোনা গ্যাচে। ও হল মরার লক্ষণ। Slave mentalityর উৎপত্তি হচ্চে fossilised brain থেকে। সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, দর্শন-বিজ্ঞান বল, শিল্প-সাহিত্য বল—নতুন কিছু করেচ ত অমনি মামুলি-মস্তিষ্কেরা হুক্কা হুয়া করে উঠবে—জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, নরক একেবারে গুলজার হয়ে উঠলো।

বাঁচতে গেলে তিনটে জিনিষ দরকার,—

"There are the three voices of Nature. She joins hands with us and says Struggle, Endeavour. She comes close to us, we can hear her heart beating, she says Wonder, Enjoy, Reverse. She whispers secrets to us, we cannot always catch her words, she says Search, Inquire. These, then, are the three voices of Nature, appealing to Hand, and Heart, and Head, to the Trinity of our Being (Prof. J. Arthur Thomson).—

প্রকৃতি বাঁচবার জন্যে আমাদের সর্ব্বদা তাঁর তিনটে আদেশ জানাচ্চেন—অবিশ্রাম দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করবার জন্যে কাজ করে যাও, তাঁর সৌন্দর্য্য বিস্ফারিত নেত্রে দেখ, উপভোগ কর ও ভক্তি কর, জগৎ-রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা কর। জীবনের এই ত্রিত্বই হচ্চে বাঁচবার উপায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আজ আমরা যে মহাপুরুষের স্মৃতি-উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই সর্ব্বলোকবরেণ্য জগদ্‌গুরুর অলৌকিক জীবন কাহিনীর বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা করা আমার মত অক্ষমের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। দেশ বিদেশে আজ তাঁহার মহিমার কথা কে না জানে, সুদূর বিদেশে অগণ্য বিদেশীদের মধ্যেও তাঁহার গৌরবান্বিত মহিমা কার্য্য করিতেছে। ধনী, দীন, সকলেই তাঁহার নামে ভক্তি নম্র চিত্তে অবনত হইতেছে। যে নামের গুণে এই অসীম শক্তিশালী বিরাট রামকৃষ্ণ-সংঘ গড়িয়া উঠিয়া পাপী, তাপী, রোগ, শোক, দুঃখ-কাতর অসহায়ের আশ্রয় স্বরূপে দাঁড়াইয়াছে, আজিকার স্মরণীয় দিনে দুঃখতাপহারী সে নাম এ দীন কণ্ঠে একবার উচ্চারণ করিয়া ধন্য হইব—এইমাত্র আকাঙ্ক্ষা করি। আরও জানি, যখন প্রকৃত প্রাণের আবেগে ভক্ত-মণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন তখন তিনি নিজেই তথায় আবির্ভূত হন। আজিও ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া এতগুলি জীবন যেখানে একত্র হইয়াছে সেখানে দয়াল ঠাকুর স্বয়ং আবির্ভূত না হইয়া পারিবেন না। তিনি যে আমাদের করুণার সাগর ছিলেন!

তিনি জীবনে একাধারে ভক্ত ও ভগবান রূপে লীলা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজিও লীলাময় এ ক্ষুদ্র কণ্ঠে তাঁহার নাম তিনি নিজেই

শ্রীহট্ট—শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি-উৎসব-সভায় লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

কীর্ত্তন করুন এবং অলক্ষিত আবির্ভাবের অনুভূতির দ্বারা আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ ও জীবন ধন্য করুন, এই প্রার্থনা করি।

এ ভারতভূমি চিরদিন রত্নপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্মরণাতীত যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত কত কত ধর্ম্মবীরগণ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবাসীকে পবিত্র করিয়াছেন তাহাব ইয়ত্তা নাই। জনহিতার্থ তাঁহারা স্ব স্ব মোক্ষচিন্তা দূরে ফেলিয়া সংসারী ত্রিতাপ-ভীত আত্মার উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। অতীত কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ অনেকানেক মহাপুরুষের কথা জানা যায়, যাহারা মানবের চিত্তের উৎকর্ষের জন্য যত প্রকার উপকরণ আবশ্যক তাহা প্রচুর পরিমাণে আহরণ পূর্ব্বক মানব-সমাজের জন্য অমূল্য রত্নভাণ্ডার সজ্জিত করিয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মনীতি ও সমাজ তাঁহারা এরূপ ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কত বিদেশী ভ্রমণকারী পরিব্রাজকরূপে আসিয়া, কত জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থিরূপে আসিয়া, বিস্মিত নেত্রে এই ধর্ম্মজ্ঞানোন্মত সমাজ দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সেই অতীত যুগের মহাত্মাগণ জন-মানব-সংস্পর্শ-হীন নির্জ্জন গিরিকন্দরে অবস্থান করিয়া জগতের হিতার্থে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বহু শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন; এবং তাহার প্রভাবে সমগ্র দেশে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, প্রত্যেকের মধ্যে এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম ও জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কালক্রমে সেই সকল মহাত্মাগণের তিরোধানের পর, দেশে বেদোক্ত আত্মতত্ত্বের অনুশীলন লোপ প্রাপ্ত হয় এবং সমাজে ধীরে ধীরে জড়বাদ ও বাহিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম আচারের ভিতর প্রবেশ করে। প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা তিরোহিত হইয়া বাগাড়ম্বর পূর্ণ অহমিকা তাহার স্থান অধিকার করে, এবং সমাজে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়।

ইতিমধ্যে যুগ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইল এবং কালের গতি অনুসারে পুনরায় লোকের কেবল শূন্যগর্ভ বাহিক অনুষ্ঠানের প্রতি

বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল ও সে পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হইবার যে স্বাভাবিক ক্ষুধা প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে অন্তর্নিহিত ভাবে সুপ্ত রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিল। যে জ্ঞানের দ্বারা সহস্র বৎসরের হৃদয়ের অন্ধকার এক নিমেষে দূর হইয়া হৃদয় সূর্য্যালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মানব-সমাজ সেই জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমাজ বিধি-নিষেধ ও জড় ক্রিয়াকাণ্ডের নাগপাশে আবদ্ধ, এ ক্ষুধা নিবৃত্তির তাহার শক্তি ছিল না। তখন শিশু হৃদয়ে যেরূপ প্রথম আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইলে সে বুঝিতে পারে না যে, তাহার হৃদয় কি চায়, কি পাইলে অন্তরের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতে পারে, না বুঝিয়া কেবল এক আকুল উন্মাদনায় অধীর হইয়া উঠে, দেশে সেই অবস্থা উপস্থিত হইল।

সেই সময়কালে সমুদ্র পার হইতে অক্লান্তকর্ম্মী খৃষ্টভক্তগণ আসিয়া অমিত উদ্যমে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দেশের লোক পিপাসার্ত্ত হইয়া ঐ একেশ্বরবাদ নবধর্ম্মের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিল এবং কেহ কেহ জ্ঞানশূন্য হইয়া হৃদয়ের বুভুক্ষা নিবৃত্তির জন্য এই নবধর্ম্মের প্রচারকগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। অসংখ্য রত্নরাজীর আকর স্বরূপ যে হিন্দুধর্ম্ম বহুশত বৎসর ধরিয়া জননীর মত, বহু জাতির, বহু ধর্ম্মমতের আশ্রয় দিয়া পালন ও পোষণ করিতেছিল, সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণকেই মান ও মর্য্যাদা দিয়া নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল—সেই ধর্ম্ম ও সমাজ মধ্যে এইরূপে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল।

তখন চারিদিকে দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ দেশের এই দুরবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই দুর্দ্দমনীয় স্রোতমুখে বাঁধ দিবার জন্য তাঁহারা নানাভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার সাধন পূর্ব্বক নানারূপে সমাজের সম্মুখে ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে নব নব ধর্ম্মমতের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই আপনাপন পথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এক হিন্দুধর্ম্ম বহুধা বিভক্ত হইয়া খণ্ডখণ্ড রূপে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। নানা সম্প্রদায় নানাদিকে বিরুদ্ধবাদিগণকে পরাজয় করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল।

ধর্ম্ম জগতের এই সঙ্কটের ফলে মানব-সমাজ এক অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া ধন্য হইল। ধর্ম্মবিপ্লব দ্বারা জগতের উপকার ও উন্নতিই হইয়া থাকে।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত! তখনই আমি আপন দেহ সৃষ্টি করি এবং স্বধর্ম্মবর্ত্তী সাধুগণের রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।"

সুতরাং যখনই ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই, কৃপারূপে ভগবান আপনি আসিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ সেই সময়ে যখন পথভ্রান্ত মানবকুল আর্ত্তদীন আত্মা লইয়া পথ খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করিতেছিল—সেই শুভক্ষণে জগতের হিতার্থে ভগবান রামকৃষ্ণ নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; এবং অদূর ভবিষ্যতে যে মহামহীরুহ সমস্ত জগতে সুশীতল ছায়াদানে এক অপূর্ব্ব শান্তি প্রদান করিবেন তাহার আভাস দানের দ্বারা শিশুবয়সেই মাতা পিতা ও আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে বিস্ময়ান্বিত ও পুলকিত করেন। বাল্যকালেই তাঁহাকে ভগবৎগুণ গানে তন্ময়, সর্ব্বজীবে দয়াবান ও সাংসারিক বিষয়ে নির্লিপ্ত দেখা যাইত। এই আপনা ভোলা অনিন্দ্য সুন্দর বালকের নাম পিতা 'গদাধর' রাখিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন প্রকৃতই গদাধর পুত্ররূপে তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে তাঁহার গৃহে আগমন করিয়াছেন। কিশোর বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতা গমন করেন এবং ইহার কিয়ৎকাল পরে জানবাজারস্থ রাণী রাসমণি দেবী স্থাপিত কলিকাতার

পাঁচমাইল উত্তরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীমাতার মন্দিরে সহকারী সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন। কালীমাতার সেবা করিতে করিতেই তাঁহার জগন্মাতার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ক্রমে দিবানিশি এই ভাবে তন্ময় হইয়া উঠেন; এবং কালীবাড়ী মধ্যস্থিত সাধনপীঠ পঞ্চবটীতে আমলকী বৃক্ষতলে অনবরত সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। ফুল ফুঠিলে যেমন কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না, ভ্রমরেরা আপনি আসিয়া জুটিতে থাকে, সেইরূপ এই হৃদয়-পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাধন পথের সাহায্যকারিগণ আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর একে একে তন্ত্র ও বেদোক্ত সকল প্রকার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সময়ে গুরু তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণকালে 'রামকৃষ্ণ' নাম লাভ করেন এবং বেদান্ত মতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতে 'পরমহংস দেব' বলিয়া খ্যাত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলা বুঝিবার ক্ষমতা এখনও আমাদের হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। বাহিরে শিশুর মত সরল, আনন্দময়, ভিতরে বেদ বেদান্ত তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রের মূর্ত্ত প্রতীক্; আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কি ভাবে নানা মত ও নানা পথের সহজ-বোধ্য সমন্বয় হইতে পারে, তাহা নিজ জীবন দ্বারা জগতে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিয়া সংসার-পথ-বিভ্রান্ত-জনগণকে "ক্ষুরস্য ধারা" যে পথ তাহা সরল ও সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিয়াছে এবং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী প্রভু প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে তাহা প্রকৃতই উপলব্ধি হয়। তিনি শাস্ত্র প্রচলিত প্রত্যেক সাধন-প্রণালীতে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গুরু তোতাপুরীর নিকটে যখন তিনি বৈদান্তিক প্রণালী মতে সাধন করেন তখন গুরু যাহা আয়ত্ব

করিতে চল্লিশ বৎসর সাধনা করিয়াছিলেন তিনি তিন দিনেই তাহাতে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। এই অমানুষী ক্ষমতা দর্শন করিয়া তোতাপুরী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান।

তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সহজ সরল অমৃতময় উপদেশ সমূহ আপামর সাধারণ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে অথচ সর্ব্বশাস্ত্র তাহার ভিতরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। ত্যাগী গৃহী সকলেই সমভাবে তাঁহার উপদেশে উপকৃত হইয়াছেন। এক কথায় তিনি সকল মতের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। "এক পুকুরে পৃথক পৃথক ঘাটে বিভিন্ন লোকে যদি জল নেয় এবং পৃথক ভাষায় জল শব্দ উচ্চারণ করে, তাতে কি জলের পৃথকত্ব বুঝায়?" বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও বিভিন্ন পথ লইয়া আবহমান কাল হইতে যে তর্ক চলিতেছে এক কথায় তাহার কি সহজ সরল সুন্দর মীমাংসা! তাঁহার শ্রীমুখের এক একটি বাক্য যেন অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করা এক একটি অমৃত ফল তুল্য! বৃথা বাক্য কখনো সে মুখ হইতে বাহির হয় নাই, কেবল মুখের কথায় নয়, আদর্শ মহাপুরুষ প্রতি-উপদেশ তাঁহার নিজের জীবন দ্বারা প্রত্যক্ষ করাইয়া গিয়াছেন।

মুমুক্ষুগণকে বলিয়াছেন, কাম-কাঞ্চন ত্যাগই আসল ত্যাগ। সেই কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া তিনি যাহা দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের ধারণা করিবারও ক্ষমতা নাই। তিনি নিজ বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে মা আনন্দময়ীর রূপ দর্শন করিয়া ভক্তি বিহ্বল চিত্তে প্রণাম করিয়াছেন। টাকা পয়সা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করা মাত্র হস্ত সঙ্কুচিত হইয়াছে। মা আনন্দময়ীরূপে ত্রিজগৎ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। জগন্মাতার চিহ্নিত প্রিয় সন্তান মা ছাড়া কিছুই জানিতেন না।

তিনি একাধারে ভক্ত ও ভগবানরূপে লীলা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তরূপে বালকের ন্যায় মা মা করিয়া জগজ্জননীর কাছে আব্দার করিয়াছেন। আবার সোঽহং ভাবে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এ ত কাহিনী নয়, গল্প নয়, এ ত বেশীদিনের কথা নয়,—যে সকল ভাগ্যবান তাঁহার সাহচর্য্য দ্বারা,

সেবার দ্বারা জীবন ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা এখনো এ পৃথিবীতে দেহধারণ করিয়া আছেন। তিনি আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের, ইহা অপেক্ষা আশার বিষয় আর কি হইতে পারে ?

স্বামী বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্ররূপে ব্যাকুল ও পিপাসার্ত্ত আত্মা লইয়া তাঁহার ত্রিলোক বাঞ্ছিত শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়া সেই পরম বন্ধুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন সে জিজ্ঞাসার কি মধুময় উত্তরই লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন! "হাঁ তাঁহার দেখা পাওয়া যায় তাঁহার সহিত কথা কওয়া যায়, যেমন তুমি আর আমি। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, চেষ্টা করিলে তুমিও দেখিতে পাইবে।" আমি সেই জগদতীত অনন্ত বস্তুকে জানিতে পারিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়াছি—একথা আর কে বলিতে পারিয়াছে, মানব দেহ ধারণ করিয়া এ সাহস-বাক্য কে উচ্চারণ করিতে পারে ?

আজ যে এই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ দৃঢ় পদে দাঁড়াইয়াছে—ইহার মূলে মুষ্টিমেয় কৌপীনসম্বল সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মচারীর প্রাণপূর্ণ সাধনা ভিন্ন আর কোন সম্পত্তি ছিল না। ইঁহারা কিসের আশায় কোন্ অভয় মন্ত্রে বলীয়ান হইয়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সংকল্প হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন ? বীরগণ কিসের প্রেরণায় ইহসংসারের মান মর্য্যাদা সুখ-ভোগের মায়ার বন্ধন পলকে ছিন্ন করিয়া জগতের পথে কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া জীবের দুঃখ মোচনের এই মহান সংকল্প, মহান আদর্শ লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ?—সেই মন্ত্র আর কিছুই নয় ঠাকুর রামকৃষ্ণের শক্তি। তিনি ইঁহাদিগের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া জগতের কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাপন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া জাগতিক সমস্ত বন্ধন, সমস্ত ভীতি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের বীরত্বের অন্ত নাই, সাহসের অন্ত নাই, তাই আচণ্ডালে প্রেমের ও দুঃখ দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবের প্রতি সেবার সীমা নাই!

প্রভু রামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে আমাদের সন্তানগণ দলে দলে প্রভুর

পতাকা তলে আসিয়া মিলিত হউক—তাঁহার কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হউক। ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, আপনারা জগতে বীর বলিয়া পরিচিত হউন—ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কামনা নাই।

সেই অলৌকিক অতি-মানুষিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষের জীবন সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা এবং বর্ণনা করা উভয়ই আমার মত অক্ষমের পক্ষে সাধ্যাতীত বিষয়, তথাপি আজিকার দিনে ভক্তমণ্ডলি-সেবিত, সর্ব্বশোকসন্তাপহারী সে শ্রীচরণে শ্রদ্ধানত হৃদয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

শ্রীপ্রাণদাসুন্দরী দাস

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(৭)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

C/o. ই, টি, ষ্টার্ডি, স্কয়ার
হাই ভিউ, ক্যাভারস্থাম, রিডিং
১৮৯৬

প্রিয়—

লণ্ডন সহরটা যেন জন-সমুদ্র—যেদিকে চাও কেবল মানুষের মাথা, যেন দশ পনরটা কলকাতা এক সঙ্গে। এখানে নামার পূর্ব্বে এমন বন্দোবস্ত করতে হয়, যেন নামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ এসে তাকে নিয়ে যায়—নইলে এই গোলোক-ধাঁধায় তার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। যাই হোক্ কা—কে বোলো যেন সে এক্ষুণি রওনা হয়। যদি সে শ— এর মত দেরী কোরে আসে—তবে তার এসে কাজ নেই।

অমন গড়িমসি কোরলে হবে না। এ সব কাজ কোরতে হলে প্রবল রজোগুণ (কর্ম্ম-প্রবণতা) চাই। সমস্ত দেশটা তমোতে ডুবে যাচ্চে, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা চাই প্রথমে রজোগুণ, সত্ত্ব পরে আসবে। সত্ত্বগুণ এখনো দূরে—বহু দূরে।

তোমাদের স্নেহের

বিবেকানন্দ

(৮)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

বোষ্টন

২৩শে মার্চ্চ, ১৮৯৬

প্রিয় অ—

* * * সম্প্রতি যাদের আমি সন্ন্যাস দিয়েচি, তাদের মধ্যে সত্যই একজন স্ত্রীলোক, বাকী সব পুরুষ। ইংলণ্ডেও আমি আর কয়েকজনকে সন্ন্যাস দেব, তারপর তাদের ভারতে নিয়ে যাব। এই সব 'সাদা মুখ' হিন্দুদের চাইতে সেখানে বেশী প্রভাব বিস্তার কোরবে; তা ছাড়া তাদের কাজ করবার শক্তিও বেশী। হিন্দুরা তো মৃত। একমাত্র আশা—ভারতের নীচজাত, আভিজাত্য সম্প্রদায় শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে তো মরে গ্যাচে। * * *

আমার ভাষা সহজ বলে আমার কাজ এত সফল হয়ে উঠচে; আচার্য্যের মহত্ত্ব তাঁর ভাষার সরলতার ওপর নির্ভর করে।

* * * আগামী মাসে ইংলণ্ড যাচ্চি। আমি অত্যধিক পরিশ্রম করেচি, আমার ভয় হয়—এই দীর্ঘ পরিশ্রমে আমার স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে না যায়! তোমাদের কাছ থেকে সহানুভূতি আমি কিছুমাত্র চাই না; আমি এইজন্যে লিখচি যে, তোমরা আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশা কোরো না। যতদূর সম্ভব ভাল করে কাজ করে যাও। আমার দ্বারা বড় বড় কাজ হবার এখন আর বেশী আশা নেই। সাংকেতিক লিখন-প্রণালীতে আমার অনেক বক্তৃতা যে

লিখে নেওয়া হচ্চে তাতে আমি খুব খুসী। চারখানি বই-এর উপকরণ এখন প্রস্তুত। লোকের কল্যাণের জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেচি, এই জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত; কাজ শেষ করে যখন গিরিগুহায় গিয়ে বসবো তখন বিবেকের কাছে আমার আর কোন জবাব দিতে হবে না।

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

বিবেকানন্দ

বৈদিক ভারত

(ঋগ্বেদীয় যুগ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ-সমূহের বিস্তারিত আলোচনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬। পূর্ব্বসমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ

সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বহু প্রমাণ আছে। যথা :—

(ক) "উষা যখন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী মহান্ সূর্য্য জলের স্থানে বা সমুদ্রে উৎপন্ন হয়েন।" (ঋগ্বেদ ৩।৫৫।১)

মূলমন্ত্রটি এই :—

উষসঃ পূর্ব্বা অধযদ্ ব্যুষুর্মহদ্বিজজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।"

সায়ণাচার্য্য তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন :—"পূর্ব্বা উদয়কালাৎ প্রাচীনা উষসো যদ্ যদা ব্যুষুঃ ব্যুচ্ছন্তি অধ তদানীং অক্ষরং ন ক্ষরতীত্য-ক্ষরং অবিনাশ্যাদিত্যাখ্যং মহৎ প্রভূতং জ্যোতি র্গো উদকস্য পদে স্থানে সমুদ্রে নভসি বা বিজজ্ঞে উৎপদ্যতে।"

সায়ণাচার্য্য অবিনাশী সূর্য্যের উদয় সমুদ্রে বা "আকাশে" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "গোস্পদে" এই বাক্যের অর্থ "উদকের স্থানে বা সমুদ্রে"ই সুসঙ্গত। পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে না পারিয়া সায়ণাচার্য্য "সমুদ্রে নভসি বা" এই অর্থও করিয়াছেন কিন্তু তাহা সুসঙ্গত নহে।

(খ) "সূর্য্য উজ্জ্বল বারির'শির উপর আরোহণ করিয়াছেন; তিনি উজ্জ্বল-পৃষ্ঠ অশ্বগণকে রথে যোজন করিবামাত্র জ্ঞানী উপাসকগণ পোতের ন্যায় তাঁহাকে জলের উপর দিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। বারি-রাশি তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া অবনত হইয়াছে।" (ঋগ্বেদ ৫।৪৫।১০)

মূল মন্ত্রটি এই :—

"আ সূর্য্যো অরুহচ্ছুক্রমর্ণো যুক্ত যদ্ধরিতো বীতপৃষ্ঠাঃ।
উদ্রা ন নাবমনয়ন্ত ধীরা আশৃন্বতী রাপো অর্ব্বাগতিষ্ঠন্॥"

উদ্ধৃত ঋকে "শুক্রমর্ণঃ" এই বাক্যের অর্থ উজ্জ্বল বারিরাশি। সূর্য্য উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করিবামাত্র তাঁহার রথে উজ্জ্বলপৃষ্ঠ হরিৎ অর্থাৎ অশ্বগণকে যোজন করিলেন। আর বারিরাশির উপর পোতকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেইরূপ জ্ঞানী উপাসকগণ মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আকাশে উত্তোলিত করিবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

(গ) "যে সহস্রশৃঙ্গ (অর্থাৎ সহস্রকিরণ-বিশিষ্ট) বৃষভ (সূর্য্য) সমুদ্র হইতে উদ্গত হইতেছেন, সেই অভিভবকারীর সাহায্যে আমরা জনগণকে নিদ্রিত করিব।" (ঋগ্বেদ ৭।৫৫।৭)

মূল মন্ত্রটি এই :—

"সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ।
তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ত স্বাপয়ামসি॥"

সায়ণাচার্য্য টীকায় বলিয়াছেন—"সহস্রশৃঙ্গঃ সহস্রকিরণো বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা যঃ সূর্য্যঃ সমুদ্রাদম্বুধেঃ সকাশাৎ উদাচরৎ উদাগচ্ছতি" ইত্যাদি। উদ্ধৃত মন্ত্রে সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উদয়ের কথা সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে।

(ঘ) "মেঘসকল যেরূপ সমস্ত ভুবনকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ দেবতারা স্বতেজে সমস্ত ভুবনকে পূরিত করিলেন, এবং সমুদ্রের মধ্যে নিগূঢ় সূর্য্যকে প্রাতঃকালে উদয়ের জন্য প্রকাশিত করিলেন। (ঋগ্বেদ ১০।৭২।৭)

মূল মন্ত্রটি এই :—

যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্বত।

অত্রা সমুদ্র আ গূঢ়মা সূর্য্যমজভর্ত্তন॥

সায়ণাচার্য্য টীকায় লিখিয়াছেন :—"অত্র সমুদ্রে অপ্সু আগূঢ়ং নিগূঢ়ং সূর্য্যং প্রাতরুদয়ায় আজভর্ত্তন আহৃতবন্তঃ।"

আরও বহু মন্ত্র আছে। আপাততঃ তাহাদের উল্লেখ না করিয়া এই স্থানে একটি কথা পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিব। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্ত্তী সাহিত্যে সূর্য্যের" উদয়াচল" ও "অস্তাচলের" উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীনতম ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সূর্য্য সমুদ্রের গর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছেন, এবং সমুদ্রের গর্ভেই অস্তগত হইতেছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণ সূর্য্যকে সপ্তসিন্ধু দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইতে দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তাঁহারা সমুদ্রকেই সূর্য্যের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণ যেন স্বচক্ষে সমুদ্র হইতে সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাইতেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে এই "উদয়-সমুদ্র" নিশ্চিত বঙ্গোপ-সাগর ছিল না; কারণ ঋগ্বেদীয় যুগে আর্য্যগণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বাস করিতেন না, পরন্তু সপ্তসিন্ধুদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। সুতরাং যে সমুদ্র হইতে তাঁহারা সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিতেন, তাহা সপ্ত সিন্ধুদেশের (পঞ্জাবের) অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই অবস্থিত ছিল। এই সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও বিশিষ্ট প্রমাণ-সমূহ আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষার উদয় হয়, এবং উষার আবি-

র্ভাবের পূর্ব্বে রাত্রিশেষে অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাব হয়। রাত্রিশেষে আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া যে জ্যোতিঃ পূর্ব্বাকাশে উদ্ভাসিত হয়, তাহাই অশ্বিদ্বয়। * ঋগ্বেদের ১।৪৬।২ মন্ত্রে ইহাঁদিগকে "সিন্ধুমাতরঃ" বলা হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ "সমুদ্রই যাঁহাদের মাতা" অর্থাৎ যাঁহারা সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া উদিত হন। এই সূক্তের অষ্টমী ঋক্ এইরূপ :—

"অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ।
ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥"

সায়ণাচার্য্য টীকায় লিখিয়াছেন :—"হে অশ্বিনৌ, বাং যুবয়োর্দ্দিবস্পৃথু দ্যুলোকাদপি বিস্তীর্ণ মরিত্রং গমনসাধনং নৌরূপং সিন্ধূনাং সমুদ্রাণাং তীর্থে অবতরণ-প্রদেশে বিদ্যতে ইতি শেষঃ। রথশ্চ ভূমৌ গন্তুং বিদ্যতে।" ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই :—"হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ নৌকা বা পোত সমুদ্রের অবতরণ-ঘাটে রহিয়াছে; সমুদ্র হইতে স্থলে উঠিয়া ভূভাগের উপর গমন করিবার জন্য তোমাদের রথও প্রস্তুত রহিয়াছে।"

অশ্বিদ্বয় বিস্তীর্ণ অর্ণব-পোত-যোগে সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া সপ্তসিন্ধুদেশের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন; ঘাটে পোত ভিড়িয়াছে। এক্ষণে পোত হইতে স্থলে উঠিয়া তাঁহারা অভিলষিত স্থানে গমন করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদের রথও প্রস্তুত রহিয়াছে। মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিমহোদয় সমুদ্রের ঘাটে যে দৃশ্য প্রত্যহ স্বচক্ষে অবলোকন করিতেন, তাহাই যেন অশ্বিদ্বয়ের আগমন-সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। অর্ণবপোত সমুদ্রের ঘাটে লাগিলে, পোতারোহী ধনবান ব্যক্তিগণ তটে উঠিয়া যেরূপ বিবিধ রথ ও যানাদি দ্বারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেন, অশ্বিদ্বয়ও সেইরূপ যেন পোতারোহণ

* ঋগ্বেদের ১০।৬১।৪ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ :—"যখন কৃষ্ণবর্ণ গাভী লোহিতবর্ণ গাভীদিগের মধ্যে মিশাইয়া গেল, অর্থাৎ যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমাভা দৃষ্ট হইল, তখন, হে দ্যুলোকের পৌত্র অশ্বিদ্বয়, তোমাদিকে আমি আহ্বান করি।" ইত্যাদি। উষোদয়ের পূর্ব্বকালটিই অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাবের কাল, তাহা বুঝা যাইতেছে।

করিয়া সপ্তসিন্ধু দেশের পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তী সমুদ্রের তটে উপস্থিত হইতেন, এবং স্থলে উঠিয়া রথযোগে আপনাদের গন্তব্য স্থানে গমন করিতেন। পূর্ব্ব সমুদ্র ও সমুদ্রের ঘাট যে মন্ত্ররচয়িতা ঋষির আবাস-স্থানের অনতি-দূরে অবস্থিত ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই সমুদ্র "পূর্ব্ব সমুদ্র" ব্যতীত অন্য কোনও সমুদ্র হইতে পারে না। কারণ, অশ্বিদ্বয় পূর্ব্বদিকেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন, এবং ঐ দিক্ হইতেই সপ্তসিন্ধুদেশে আগমন করিতেন। পূর্ব্বদিকে স্থলভাগ থাকিলে ঋগ্বেদে অর্ণবপোত যোগে তাঁহাদের আসার উল্লেখ আবশ্যক হইত না।

অন্য একটি মন্ত্রে (ঋগ্বেদ ৫।৭৫।৮) অশ্বিদ্বয়কে "শুভস্পতী" অর্থাৎ "জলের অধিপতি" বলা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য টীকায় এই শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন :—"শুভস্পতী উদকস্য স্বামিনৌ।" পূর্ব্বসমুদ্রের জল-রাশি ভেদ করিয়া তাঁহারা সমুত্থিত হইতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহা-দিগকে "শুভস্পতী" বলা হইয়াছে।

উষাও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া থাকেন। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে তাঁহার উদয় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্দ্ধেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ।"

(ঋগ্বেদ ৫।৮০।৫)

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের টীকা এইরূপ :—"এষোষাঃ শুভ্রা ন শুভ্রবর্ণা নির্ম্মলা স্বলঙ্কৃতা যোষিদিব তন্বোঽগানি বিদানা প্রজ্ঞাপয়ন্তী স্নাতী স্নানং কুর্ব্বানা উর্দ্ধেবোন্নতেব স্নানাদুত্তিষ্ঠন্তীব নোঽস্মদর্থমস্মাকং পুরুতো বা দৃশয়ে সর্ব্বেষাং দর্শনায়োদস্থাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশ্যুত্তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ "এই শুভ্রবর্ণা উষা সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় যেন নিজ দেহ প্রকাশিত করিয়া স্নান হইতে উত্থিতা হইয়া আমাদের সম্মুখে সকলের দর্শনের নিমিত্ত উদিত হইতেছেন।"

এই মন্ত্রে ঋষিমহোদয় উষাকে "স্নাতী" অর্থাৎ যেন (সমুদ্রজলে) স্নান করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে দেখিতেছেন। উষা যে স্থান হইতে পূর্ব্বা-কাশে উত্থিত হইতেছেন, সেই স্থানে জলরাশি না থাকিলে "স্নান করিয়া উঠিতেছেন" এই বর্ণনায় কোনও সার্থকতা থাকিত না।

পূষন্ বা পূষাদেবও সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (১০।৯২।১৩) ইঁহাদেরও "অপাং নপাৎ" অর্থাৎ "জলের পুত্র" বলা হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া সূর্য্য আকাশে উদিত হইতেন বলিয়াই তিনি "অপাং নপাৎ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

উষাও ঋগ্বেদে (১০।১০।৪; ১০।১১।২) "অপ্যা যোষা" ও "অপ্যা যোষণা" অর্থাৎ জল হইতে উদ্ভূতা নারী বলিয়া উক্তা হইয়াছেন। ইনি আদিত্যের (সূর্য্যের) ভার্য্যা। সূর্য্যও "অপ্সু গন্ধর্ব্বঃ" (১০।১০।৪) অর্থাৎ জল হইতে জাত গন্ধর্ব্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অবশ্য সায়ণাচার্য্য ইহার টীকায় বলিয়াছেন:—"অন্তরিক্ষে স্থিতঃ গন্ধর্ব্বঃ আদিত্যঃ" এবং "অপ্যা যোষা"র টীকায় "অপ্যা অন্তরিক্ষস্থা সা প্রসিদ্ধা যোষা আদিত্যস্য ভার্য্যা" বলিয়াছেন। কিন্তু "অপ্" শব্দের অর্থ জল বুঝিলেও কোনও দোষ হয় না, কারণ "অপ্" শব্দের প্রকৃত অর্থই "জল", "অন্তরিক্ষ" নহে। উষা ও সূর্য্য উভয়েই সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সমুদ্রের জল হইতে উদিত হইতেন, তাহা ঋগ্বেদীয় যুগের আর্য্যগণ দেখিতেন ও জানিতেন। এই কারণে উষাকে "অপ্যা যোষা" এবং সূর্য্যকে "অপ্সু গন্ধর্ব্বঃ" বলিয়া বর্ণনা করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল। প্রাচীনকালে এই সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহা যদি সায়ণাচার্য্য জানিতেন, তাহা হইলে "অপ্" শব্দের অর্থে "অন্তরিক্ষ" না বলিয়া তিনি নিশ্চিত "সমুদ্র"ই বলিতেন।

যাহা হউক, ঋগ্বেদে এইরূপ বহু মন্ত্র আছে, যাহাদের আলোচনা দ্বারা সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বলিয়াছেন যে, অত্যাধুনিক যুগে (Pleistocene age) সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে আসাম দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ একটি সমুদ্র ছিল। সেই সময়ে হিমালয় হইতে নিঃসৃত

* *Memoirs of the Geo. Surv. of India* vol. XLII Part 2, p. 119.

Wadia's *Geology of India*, P. 248: "In the

গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, সদানীরা প্রভৃতি নদী, এবং বিন্ধ্য-পর্ব্বতশ্রেণী হইতে নিঃসৃত চর্ম্মণবতী নদী (চাম্বাল) ও শোণনদ প্রভৃতি তাহাদের জলরাশি এই পূর্ব্ব সমুদ্রে ঢালিয়া দিত। এই সমস্ত নদনদী কর্ত্তৃক আনীত বালুকা ও পলী মাটি পূর্ব্ব সমুদ্রের গর্ভে নিপতিত হইয়া বহুসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তাহার তলদেশ ক্রমশঃ পূর্ণ ও নূতন ভূমি রচিত করিতেছিল। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ওল্ডহামের (Oldham) মতে এই পূর্ব্ব সমুদ্র হিমালয়ের পাদমূলে প্রায় ১৫,০০০ ফীট্ অর্থাৎ প্রায় তিন মাইল গভীর ছিল। * নদনদী কর্ত্তৃক আনীত বালুকা ও পলী-মাটি দ্বারা এই তিন-মাইল-গভীর সমুদ্র পূর্ণ হইতে যে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার সময়েও যে এই সমুদ্র বিদ্যমান ছিল, তাহা দেখা যাইতেছে। কিন্তু সম্ভবতঃ, তখন তাহা তত গভীর ছিল না। তত গভীর না থাকিলেও, তাহা যে সেই সময়ে "সমুদ্র" নামে অভিহিত ছিল, এবং তাহার উপর ধন-লাভার্থী বণিক্‌গণের পোতসমূহ যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেই সময়ে "রাজপুতানা সমুদ্রে"র সহিত এই সমুদ্রের সংযোগ থাকাও সম্ভবপর। সংযোগ না থাকিলে, ঋগ্বেদীয় যুগেই সপ্তসিন্ধুনিবাসী আর্য্যগণ দক্ষিণাপথে গমনাগমন করিতে পারিতেন। কিন্তু ঋগ্বেদে দক্ষিণাপথের কোনও উল্লেখ না থাকায়, এইরূপ অনুমান হয় যে, রাজপুতানা সমুদ্র ও পূর্ব্ব সমুদ্র উভয়ে পরস্পরে সংযুক্ত থাকিয়া সপ্তসিন্ধুদেশকে দক্ষিণাপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ রাখিয়াছিল। যাহা

Pleistocene period, the most dominant features of the geography of India had come into existence, and the country had then acquired almost its present form, and its leading features of topography, *except that the lands in front of the newly upheaved mountains (the Siwalik ranges) formed a depression which was being rapidly filled by the waste of the highlands."*

* *Memoirs of the Geo. Surv. of India* vol. XLII Part 2, p. 66.

হউক, ঋগ্বেদীয় যুগে সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের বিদ্যমানতা ঋগ্বেদের মন্ত্র-সমূহ দ্বারা এবং আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণেরও অভিমত দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

৭। অপর বা পশ্চিম সমুদ্র

এক্ষণে "অপর" বা পশ্চিম সমুদ্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের ১০।১৩৬।৫ মন্ত্রে যে "অপর সমুদ্র" বা পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ আছে, সেই সমুদ্র কোথায় অবস্থিত ছিল ? আধুনিক সিন্ধুপ্রদেশ (the province of Sind) প্রাচীনকালে সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। এই সমুদ্র উত্তর দিকে ৩০° ডিগ্রী ল্যাটিটুড (Latitude) পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। যে স্থানে পূর্ব্বকালে সমুদ্র ছিল, তাহা এখনও "সিন্ধু-সাগর" নামে অভিহিত হয়। সম্ভবতঃ এই সমুদ্রই ঋগ্বেদের "অপর সমুদ্র" ছিল, কিংবা আরব-সমুদ্রও পশ্চিম সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকিবে। কারণ আধুনিক বেলুচিস্থানেও আর্য্যগণ বাস করিতেন, ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সপ্ত-সিন্ধুদেশের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, এই তিনটি দিকে তিনটি সমুদ্র ছিল, এবং এই সমুদ্র-ত্রয় পরস্পরে অবিচ্ছিন্নরূপে সংযুক্ত থাকিয়া সপ্ত-সিন্ধুদেশকে দক্ষিণাপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ রাখিয়াছিল। কিন্তু ঋগ্বেদে "চতুঃ সমুদ্রাঃ" বা চারিটি সমুদ্রের উল্লেখ আছে। তিনটি সমুদ্রের পরিচয় পাওয়া গেল ; চতুর্থ সমুদ্রটি কোথায় অবস্থিত ছিল, অতঃপর তাহার আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পল্লীর নববর্ষ

মাগো !

আজি কি তোমার তুলসী ঝারায় ঢালোনি জল ?
'ফলদান' ব্রত নাওনি ? আজি তো দিলে না ফল !
নাহি আলপনা শূন্য আঙ্গিনা মরুর মত,
নব বরষের প্রথম দিবসে নিলে না ব্রত ?

নাহি বাজে শাঁখ অন্নদানের থালা যে খালি !
অতিথির পাতে ঘৃত ও পায়স দিলে না ঢালি ?
'শান্তি' নিলে না বরষের শুভ মাগিয়া আজি,
ফুল ঝরে গেল, শূন্য রহিল তোমার সাজি ।

ভালে চন্দন পরিলে না আজ, অলক পাশে,
আগেকার মত পূজার জবাটি নাহি যে হাসে ;
জলছত্রের মঞ্চের পরে কলসী নাহি
তৃষিত পথিক বিস্ময়ে হোথা রয়েছে চাহি ।

আজিকার দিনে ভিখারী তোমার দুয়ার হতে
ব্যর্থ আশায় বিরস বদনে ফিরিছে পথে ।
'পুণ্যি পুকুরে' জল কেন নাই ? তুলসী তলে
'সাঁঝ সেজুতির' ঘৃতের দেউটি কেন না জ্বলে ?

পল্লীর মাতা, পল্লীর বধূ, কেমন ধারা !
নব বরষের ব্রত উৎসব করেছ সারা ?

ওগো ও পথিক ! সুধায়োনা কথা সরম লাগে
পূজার প্রদীপ নিভায়েছি মোরা পূজার আগে ।

বুড়া বটতলে জল দিতে গিয়ে পলায়ে আসি
পথে ওই কারা করে কানাকাণি নিঠুর হাসি।

সন্ধ্যা আঁধারে ভয় পাই হেরি আপন ছায়া,
সারা গৃহখানি ঘেরি যেন আসে মরণ মায়া।
প্রদীপ নিভায়ে আপনার ঘরে শ্মশান রচি,
শঙ্খ বাজেনা—পাছে কেহ ভাবে বাঁচিয়া আছি।

ব্রত-পার্ব্বণ হয়ে গেছে শেষ—মরণ আছে,
ডাকি দিনমান তবু নিষ্ঠুর আসে না কাছে!
কম্পিত করে তুলে হেরি সাঁঝে আরসী খান,
সতী ধরমের গরবের টীকা হল কি ম্লান!

কোথায় মানব? দানবের মাঝে বসতি নিতি,
সর্ব্বনাশের দেখি যে স্বপন দিবস রাতি।
প্রাণহীন দেহ বহিয়া বেড়াতে মরি যে লাজে
নব বরষের ব্রত উৎসব কিসের কাজে?

শান্তির কথা কহিছ পথিক? শাস্তি লাগি,
পল্লীর মাতা, পল্লীর বধূ মরণ মাগি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

মার্কিণ মহিলা কবি ও স্বামী বিবেকানন্দ

* * * এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা আমেরিকার মহিলা কবি এলা হুইলার উইল্‌কক্সের (Ella Wheeler Wilcox সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে চাই, তাঁহার সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং সে পরিচয় তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই।

মার্কিণ কবি মিসেস এলা হুইলার উইলকক্সের নাম এদেশে নিতান্ত অজ্ঞাত নয়, অনেকেই তাঁহার রচিত কবিতা বাল্যে ও কৈশোরে পড়িয়াছেন, তাঁহার Poems of Cheer, Poems of Pleasure ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ সুকুমারমতি কিশোর কিশোরীর সমূহ উপযোগী। উন্নত চিন্তা তাহাদের সরল ছন্দের ঝঙ্কারের-মধ্য দিয়া বহুজনের জীবনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় পবিত্র কর্ম্ম ও সাধু চিন্তার কথা কাব্যে বলিয়াছেন, তাহাতে কিশোর অবস্থায় জীবনের উপর একটা কল্যাণের রেখা পড়িয়া যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। চিকাগো ধর্ম্মসভার পর স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া সাধারণের মধ্য দিয়া যোগশিক্ষা দিতেছিলেন তখন এই মহিলা কবি তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। মিসেস্ উইলকক্স আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া সে কথা বলিয়াছেন।

যেবার চিকাগো সম্মিলনী ও ধর্ম্ম-মহাসভা হয় তাহার পর বৎসর স্বামিজী নিউইয়র্কে আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। মিসেস্ উইলকক্সের স্বামী তখন ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে বড়ই বিব্রত ছিলেন, তাঁহার মনের অবস্থা তখন বড় ভাল ছিল না, কিন্তু সব দিক বজায় রাখিতে গেলে মনস্থির করিতে হয়, এই কারণে সে সময় তাঁহার প্রভূত সাহসের প্রয়োজন ছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে আহারাদির পর অপ্রত্যাশিতরূপে মিসেস্ উইলকক্সের নামে একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত, স্বামিজী কবে ও কোথায় বক্তৃতা দিবেন তাহা উল্লেখ করিয়া

একজন অপরিচিত ব্যক্তি কবিকে জানাইয়াছেন—"আপানার কবিতা পড়িয়া আপনার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে মনে হয় আপনার এ সব বিষয় জানিবার ও বুঝিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ আছে।" পত্রখানি তিন জায়গা ঘুরিয়া ও ঠিকানা বদল হইয়া আসিয়াছে। যখন এই সংবাদ আসিল তাহার এক ঘণ্টা পরেই অতি নিকটে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; হাতে বিশেষ কোনও কাজ না থাকায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সেই বক্তৃতা শুনিতে গেলেন।

সন্ন্যাসী বেশে সজ্জিত গৈরীক উষ্ণীষ শিরে বিবেকানন্দ ধীর পদক্ষেপে বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহারা বক্তৃতা গৃহে উপস্থিত হইলেন। আসন তখন বড় শূন্য ছিল না, ঘর প্রায় লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। বক্তা যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে গম্ভীর স্বরে বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার কথাগুলি দম্পতীর মন স্পর্শ করিল, বক্তৃতা শেষে স্বামী বলিলেন, "আমরা ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জানি, ইনি যে তার চেয়ে অনেক বেশী জানেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আরও একবার শুনিতে হইবে।"

তারপর বহুদিন বহুবার এই দম্পতী স্বামিজীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অমৃতময় বাণী শুনেন, আধ্যাত্মিক জগতের যে সত্য তাঁহাদের কাছে এতদিন আবৃত ছিল তাঁহাদের সম্মুখে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দিনের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে অফিসের শত কাজকর্ম্ম ফেলিয়াও উইলকক্স স্বামিজীর কথা শুনিতে আসিতেন। তিনি বলিতেন, "এই লোকটি আমাকে পার্থিব বিষয় কর্ম্মের তুচ্ছ গণ্ডগোলের উর্দ্ধে নিয়া যান, জীবনকে জড়ভাবে দেখা যে কত হেয়, প্রকৃত পক্ষে জীবন যে চৈতন্যময়, তাহা আমি ইঁহার প্রসাদে ও শক্তিতে উপলব্ধি করিতে পারি; তখন আমি নব বলে বলীয়ান্ হইয়া আবার জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে পারি।" তিনি স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোভাব সহকর্ম্মীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

মনঃসংযমের একটা স্বাভাবিক শক্তি অনেকের মত মিসেস্ উইল-

কক্সেরও ছিল; ঘরে হয় ত অনেক লোক—কেহ কথা বলিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ নাচিতেছে—নিজের ভাবে বিভোর হইয়া তিনি নিজের কাজ করিয়া যাইতেন, তাঁহার কাব্য-রচনা বা গ্রন্থ পাঠ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিত; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে কি ভাবে যে মনকে সংযত করিতে হয় ও একাগ্র করিতে পারা যায় সে শিক্ষা তাঁহার স্বামিজীর নিকটে হয়। স্বামিজীর নিকটে তিনি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া মনঃসংযম বা যোগ অভ্যাস করেন। স্বামিজী শিক্ষাদান কালে বলিতেন, যোগের মূলসূত্র ধরিতে পারিলে শুধু যে আত্মসংযমের শক্তি আসিবে তাহা নয়, দৃশ্যাদৃশ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে আধো আলো আধো ছায়ায় ঘেরা দেশ আছে তাহাও জানিবার এবং আয়ত্ত করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। প্রতিদিন যোগ বিষয়ে স্বামিজীর উপদেশ শুনিবার পর একাকী ১৫ মিনিট কি আধ ঘণ্টা নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেন, মন চাহিত ছুটিয়া যাইতে, সংযমের রাস টানিয়া তাহাকে বাগ মানাইবার চেষ্টা করা হইত, একমাত্র ঈশ্বর-চিন্তা বিনা, জগন্নিয়ন্তার চিন্তা বিনা অন্য সকল চিন্তা সে সময়ে মন হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহারই প্রীতিবারিতে নিজ আত্মা ধৌত ও পবিত্র করিতে চাহিতেন। মিসেস্ উইলকক্স লিখিয়াছেন, এই ভাবে যতবার চলিয়াছেন, প্রত্যেক বারেই নূতন শক্তি ও পরম শান্তি লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। এইরূপে যখন যোগ অভ্যাস বা শিক্ষা করিতেছিলেন তখন এক রাত্রে মিসেস্ উইলকক্সের জীবনে একটা ঘটনা ঘটে, তাঁহার মনে একটা প্রেরণা আসে, সে প্রেরণার ফল তাঁহার Illusion নামে কবিতা। নিজের হাত তাঁহার যেন সেদিন বশে ছিল না, যেন আর কাহারও রচনা—আর কাহারও কথা শুনিয়া তিনি নিজের কলমে লিখিয়া চলিয়াছেন, আর কেহ যেন তাঁহার কলম ধরিয়া লিখিয়া চলিয়াছে। এমন অবস্থা তাঁহার আর কখনও হয় নাই; তাঁহার নিজের লেখা কবিতা কতই ত লিখিয়াছেন, আর কখনও অন্তরে গাঁথা হইয়া যায় নাই,—নানা অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই কবিতাটি বহুদিন অপ্রকাশিত

ছিল, কোনও মাসিক পত্রিকাই এই নূতন ধরণের সৃষ্টিটি গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করিতে সম্মত হয় নাই।

আজকাল যে সকল মনীষী পাশ্চাত্য জগতের চিন্তানায়ক তাঁহাদের জীবন-কথা জানিতে পারিলে পাশ্চাত্যের উপর স্বামী বিবেকানন্দের বা প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব পূর্ণতর ভাবে জানিতে পারা যাইবে। ভবিষ্যতে যাঁহারা স্বামিজীর জীবন-চরিত লিখিবেন তাঁহারা যেন একথা একেবারে ভুলিয়া না যান; আর যাঁহারা পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্য আদর্শের আলোচনা করিতে চাহিবেন, ইহা তাঁদেরও দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামিজী ত শুধু আমাদের—শুধু ভারতের নহেন, তিনি জগতের। অভয়ের কথা জগৎকে শুনাইতে গিয়া তিনি আমেরিকা ধর্ম্ম-সভায় যে বীরবাণী উচ্চারণ করেন তাহার হুঙ্কারে কতশত দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহসের ও শক্তির সঞ্চার হয়, কতশত নর-নারীর দৃষ্টি-ভূমি আমূল পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যায়, তাহার সন্ধান আমরা পাইও না, রাখিও না। তাঁহার কর্ম্ম-জীবন যে কয় বৎসর বিদেশে কাটাইয়াছিলেন, সে কয় বৎসর তিনি অক্লান্ত ভাবে নরনারী-নির্ব্বিশেষে সাদা কালোর বিচার না করিয়া মুক্ত হস্তে জ্ঞান বিতরণ করেন, একদিকে অন্তর্গূঢ় দেশ-প্রেম, অন্য দিকে জীবমাত্রে চৈতন্যের বিকাশ এই জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উন্মেষের চেষ্টা, ভাবুক, পণ্ডিত—রসিক ও সাধকের লক্ষ্য করিবার মত।

আর একটি কথা। ঘাত প্রতিঘাত সংসারের নিয়ম, তুমি যদি আমাকে আঘাত কর তবে সে আঘাতের প্রতিঘাত হবেই। পাশ্চাত্য প্রভাব যদি প্রাচ্যের উপর কাজ করিয়া থাকে প্রাচ্য প্রভাবও তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে পাশ্চাত্যের উপর কাজ করিবে—এরূপ ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঈদৃশ ভাব-সংঘাত নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় না। বহুপথে পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহ আমাদের জীবন স্রোতে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা যদি জগতের সম্মুখে ভিখারী না থাকিয়া দাতার আসন পরিগ্রহ করি তবে দেখিব

যে, মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদেরও দিবার বস্তু আছে; যে অমৃত জ্ঞান অধ্যাত্মবিদ্যার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে আমরা অধিকারী, সেই জ্ঞান সেই বিদ্যা জগৎ আমাদের নিকট হইতে শিখুক, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষেরা একথা বারম্বার বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজে যাঁহারা মনস্বী তাঁহারা এই প্রাচ্য ভাবপ্লাবনে কিছু আলোড়িত হইয়াছেন ইহার পরিচয় পাইতেছি। সাধারণ লোকে অবশ্য এই ভাবে ভাবিত হয় নাই সেরূপ সম্ভাবনাও কিছু নাই, কারণ রাজনৈতিক ও অন্য বহুবিধ কারণে আমাদের দেশ বিদেশী ভাব-স্রোতের যেরূপ অনুকূলতা করিতেছে, পশ্চিমে সেরূপ হইবার কথা নয়। তথাপি ইংরাজ কবি "এ, ই" মার্কিণ চিন্তাবীর এমার্সন এবং নব চিন্তাধারার প্রবর্ত্তক র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্‌ডো ট্রাইনের রচনায় প্রাচ্য আদর্শ লক্ষ করিবার বিষয়।

(বিচিত্রা, ফাল্গুন, ১৩৩৪) শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

খাসীয়া ও সিন্‌টেং জাতি

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আব্‌হাওয়া

খাসীয়া ও সিনটেং জাতির আবাসভূমি খাসীয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়। নাত্যুচ্চ নাতিনীচ সুন্দর পর্ব্বতশ্রেণী, কোথায়ও বৃক্ষপত্রহীন প্রস্তরময় শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, কোথায়ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাদিপূর্ণ হিংস্র জন্তুর বাসস্থান ভীষণ অরণ্য, কোথায়ও শ্যামল শস্যপূর্ণ মাঠ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রাম সমূহ, আবার কোথায়ও ঝিল্লীমুখর উপত্যকাভূমিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তররাশি সংঘাতে বিক্ষুব্ধ নদীগর্জ্জন, বর্ষা ঋতুতে নবধারাপুষ্ট জলপ্রপাতের দৃশ্য, শীতকালে কমলা বাগানের সৌন্দর্য্য,

খনিজ ধাতবদ্রব্যের আকরভূমি নানা রঙ্গীন পাহাড় সমূহ, সর্ব্বোপরি বলিষ্ঠ, কর্ম্মপটু, পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষের সাবলীল পর্ব্বতারোহণ-অবরোহণ, সদা প্রফুল্ল তাহাদের মুখশ্রী, রবিবাসরীয় উপাসনায় আহ্বানকারী শৃঙ্গে শৃঙ্গে, প্রতি গ্রামে গ্রামে ঘন্টানিনাদ,—দর্শকের মনে যুগপৎ আনন্দ, ভয়, বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করে।

চেরাপুঞ্জীর ভুবনবিখ্যাত বর্ষাগম, মৌস্‌মাই প্রপাতের সৌন্দর্য্য, শিলংএ Hydro-elctricএর কাজ, খাসীয়া নৃত্য ও কৃত্রিম বাণ-যুদ্ধ, জৈন্তিয়া পাহাড়ে নরটিয়াং গ্রামে দুর্গাপূজা ও সেখানকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড Monolith এবং প্রস্তর-সেতুগুলি নিতান্তই দর্শনীয় ও উপভোগ্য। একই জেলায় জলবায়ুর বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শীত কালে শিলং, জোয়াই, লাইট্‌লাং কট্‌ প্রভৃতি জায়গায় যেরূপ দুরন্ত শীত, শ্রীহট্টের দিকে খাসীয়া জৈন্তিয়া পাহাড়ের স্লোপ্‌গুলিতে সেরূপ নহে। জৈন্তিয়া পাহাড়ে ছোট বড় হ্রদসমূহ পর্ব্বতশৃঙ্গ বেষ্টিত থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায়। প্লারদেশ (Jowai & Surroundings)—বিস্তৃত উপত্যকাসমূহ শোভিত, চাষ আবাদে পূর্ণ ও ছোট ছোট পর্ব্বতে ঢেউ খেলান। হাজার দুহাজার ফিট উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রাস্তা চলিয়াছে, নীচে সিন্‌টেং (Synteng) স্ত্রীপুরুষ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। দূর হইতে পাহাড়ের আনাচে কানাচে তাহাদের খুব সুন্দর দেখায়। ২।৩।৪ হাজার ফিট উপরের সব গ্রামই স্বাস্থ্যকর। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৬৪০০ ফিট উচ্চ। যাতায়াতের সর্ব্বত্রই সুবিধা রহিয়াছে। চেরাপুঞ্জীর নিকট কয়লা, তামা, পিত্তল ও লোহার আকর এবং সেলার নিকট কেরোসিন তৈলের উৎস আছে। কয়লা শিলংএ বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

উৎপত্তি

এই দুই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না; খাসীয়া জাতির ইতিবৃত্ত-লেখকদের ভিতরও এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কোনও কোনও শিক্ষিত খাসীয়া ভদ্রলোকের বিশ্বাস, তাঁহারা আর্য্যজাতির

বংশধর, খস্‌জাতির উল্লেখ মহাভারতে রহিয়াছে। ইহাই মহাভারতের “নারীরাজ্য” (A state having Matriarchate system of government) এইরূপ কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চান। সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা ভাষার কোনও কোনও শব্দের সহিত খাসিয়া শব্দের সাদৃশ্য তুলনা করিয়া নিজেদের আর্য্যজাতির বংশধর বলিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান। E. T Gordon সাহেবের মতে এ সব কিছুই নহে, তিনি লিখিয়াছেন—উহারা “মন্ আনাম্” জাতির বংশধর। ইহাদের নাম, ভাষা ও চেহারার সঙ্গে Burmeseদেরও সৌসাদৃশ্য আছে। এই দুইটি মতই সত্য বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ ইহারা আর্য্য-জাতির সংস্রবে ও কতকটা সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। উহাদের ভিতর অনেক পরিবার “Jaid Lykhar” বা আর্য্যজাতির বংশধর। এই বিষয় অনুসন্ধান করিলে আরও নূতন তথ্য বাহির হইতে পারে। সম্প্রতি খাসীয়া-ঐতিহাসিকদের ভিতর সে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ

মাংস-প্রধান-আহার প্রিয় খাসীয়া ও সিন্‌টেং জাতির ভিতর পান-দোষ খুব প্রবল। শূকরমাংস ইহাদের খুব প্রিয়। শীতপ্রধান দেশে অনেকেই গোমাংস খায়। কুক্কুট ও হরিণের মাংসও সুলভ। গোমাংস ভক্ষণ অনেক গ্রামেই নিষিদ্ধ। অবশ্য খ্রীষ্টানেরা সর্ব্বত্রই গোমাংস খাইতে পারে কেবল নরটিয়াং গ্রাম ছাড়া, সেখানে খ্রীষ্টানদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হয় না। খাসিয়া ও সিন্‌টেংদের আহার বিহার অতি সাধারণ ভাবে সম্পন্ন হয়। শূল্য মাংস ও শুক্না মাছই ইহারা সচরাচর খায়; শাক্‌সবজি, দুধ, ঘি খুব কম খায়। আহারে হিন্দুদের মত শুচিতা রক্ষা করিতে ইহারা জানে না। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ও বর্ত্তমানে খ্রীষ্টানদের অনুকরণে খাওয়া দাওয়া হয়।

পুরুষদের পোষাক বাঙ্গালী হিন্দুদের মত। মাথায় পাগড়ী এই

দুই জাতি সম্মানের চিহ্ন মনে করে; আজকাল হ্যাট্‌কোটও চলিতেছে। যে যে স্থানে উহারা হিন্দু-সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেখানেই তাহার কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছে। মেয়েদের ভিতর হিন্দুরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলারা এই সব দেশে পর্য্যটনে আসিলে বা কোনও কিছু উপলক্ষে এখানে বসবাস করিলে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইত। মেয়েদের পোষাক সবই ইয়োরোপীয়দের অনুকরণে। খাসিয়া ও সিন্‌টেং মেয়েরা সকলেই সেমিজ ও ফ্রক্ ব্যবহার করে, উপরে ওড়্‌নাও জড়াইয়া লয়। শতাব্দাব্যাপী ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টীয় মিশনরী সভ্যতার সংস্রবে আসায় খাসিয়া ও সিন্‌টেং মেয়েরা সাধারণ শিক্ষা (general education) ও বিলাসিতার দিকে এখন খুবই ঝুঁকিয়াছে। প্রায় ২॥ লক্ষ লোকের ভিতর ৩০।৪০ জন ছাত্র ও ৮।১০ জন ছাত্রী B. A.; M. A. পাশ করিয়াছে। পূর্ব্বেকার সামাজিক রীতি নীতি এখন দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এমন কি খাঁদা নাক মুখও এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। ঘর বাড়ী ইয়োরোপীয় ও বাংলা ফ্যাসানে তৈয়ারী হইতেছে। আহার, বিহার, শিক্ষা ও ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই উহারা আমূল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র

খাসিয়া ও সিন্‌টেং জাতির ভিতর একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা নাই। এদেশের মেয়েরাই প্রকৃতপক্ষে বিবাহ করে, কারণ বর নিজ পিতা-মাতার গৃহত্যাগ করিয়া কনের বাড়ীতে থাকে। এক ব্যক্তির চারিটি মেয়ে থাকিলে এইরূপে স্বামীসহ তাহারা চারিটি বাড়ীতে থাকিবে। বিবাহ-প্রথা অনেকটা গান্ধর্ব্ব মতের। বহুবিবাহ নাই তবে উপযুক্ত কারণ থাকিলে এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী অথবা এক স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। মেয়েরা বিশেষ কোনও কারণে স্বামী ত্যাগ করিলে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য তাহারা আর অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। বিনা কারণে স্ত্রীত্যাগ করিলে স্ত্রী ও

সন্তানাদির ভরণপোষণের জন্য পুরুষদের এককালীন অর্থদণ্ড দিতে হয়। পরিণত বয়সেই বিবাহ হয়। মেয়েদের সাধারণতঃ ১৫।১৬ ও পুরুষদের ২৫।২৬ বিবাহের বয়স। সংখ্যার অনুপাতে মেয়েই অধিক। সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার।

সিন্টেং জাতির বিবাহিত জীবন আরও আশ্চর্য্য রকমের। স্বামী দিনের বেলায় স্ত্রীর বাড়ীতে কখনও যায় না, যাওয়া লজ্জাজনক। শুধু রাত্রে স্ত্রীর সহিত থাকে। সারাদিন নিজের বাড়ীতেই কাজকর্ম্ম করে। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে খোরাক পোষাক কিছুই দিতে হয় না। বিবাহে সাধারণতঃ দুইদিন মেয়ে পুরুষে মিছিল করিয়া যায়—একদিন কনের বাড়ীতে, আর একদিন বরের বাড়ীতে। বিশিষ্ট বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সম্মুখে বিবাহিত জীবনে অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাদি করান হইলে প্রীতি ভোজনান্তে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়। একই বংশে বিবাহ দুই জাতির পক্ষেই নিষিদ্ধ।

মৃতব্যক্তির শবদেহ দাহ করা হয়, অবশ্য খ্রীষ্টান ছাড়া। মৃত বা মৃতার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ও জিনিষপত্র সাধারণতঃ পুড়াইয়া ফেলাই বিধি। কোথায়ও কোথায়ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অনুকরণে ১৪ দিন পরে শ্রাদ্ধাদির মত একরূপ অনুষ্ঠান হয়। রাজা ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মৃতদেহ সিন্দুকে পুরিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত (২০।৩০ বৎসর) রক্ষা করা হয়। শেষে অস্থিগুলি উঠাইয়া দাহ করা হইলে উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। ইহাদের ভিতর সাধারণতঃ জাতিভেদ প্রথা নাই। কোন কোন বংশে থাকিলেও, কোনও উপলক্ষ ঘটিলে সকলে একত্র আহার করিতে পারে। কোনও কাজকেই খাসীয়া ও সিন্টেং স্ত্রীপুরুষ ছোট বলিয়া মনে করে না, বরং স্বাধীনভাবে যে কোনও কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করাই তাহারা শ্রেয়ঃ মনে করে। এই দুইজাতির ভাষাতে অতি সামান্য প্রভেদ আছে।

এই ছোট ছোট দুইটি জিলাতে প্রায় ১৫ জন রাজা ও ১২ জন 'দলুই' বা সর্দ্দার আছে। সকলগুলিই বৃটিশ সরকারের মিত্ররাজ্যের মত। একমাত্র সেলা (Shella) ষ্টেটটি সম্মিলিত-রাষ্ট্র বা

Confederacy। এখানে প্রতি তিন বৎসর অন্তর অধিকাংশ ভোটারের সম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সকলেই ভোট দিতে পারে। অপরাপর রাজ্যগুলিও সেলার মত নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা উপভোগ করিতেছে, কিন্তু এতদ্ব্যতীত সবই গভর্ণমেণ্টের সম্মতি সাপেক্ষ। অনেকগুলি গ্রাম বৃটিশ সরকারকে খাজনা দেয় ও মামলা মোকর্দ্দমা সরকারই বিচার করেন। কোনও ব্যতিক্রম না ঘটিলে বৃটিশ সরকার তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। ভাগিনেয়ই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়।

অতি অল্পেই সন্তুষ্ট, মহাকর্ম্মঠ এই জাতি। ইহাদের অধিকাংশই দুনিয়াদারী বুঝে না। নানা জাতির সহিত সংমিশ্রণে ও বহু ভাব-ধারার উপপ্লাবনে ইহাদের ভিতর অনৈসর্গিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। জানি না, এ স্রোত ইহাদের কোথায় লইয়া যাইবে। সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিয়া কোনও জাতি বাঁচিয়াছে, ইতিহাস ইহা বলে না; যাহাদের দাঁড়াইবার নিজ ভিত্তি আছে ও অন্যের ভাব-ধারা আকণ্ঠ পান করিয়াও হজম করিবার শক্তি আছে, জগতে তাহারাই বাঁচে, তাহারাই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়।

শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্ম

খাসীয়াদের ভিতর নানারূপ রূপকথা শোনা যায়। তাহারা বলে, অতি প্রাচীন কালে তাহাদেরও লিখিত পুস্তকাদি এবং জ্ঞান বিদ্যা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু জলপ্লাবন বা অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণে তাহাদের সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে খাসীয়া ও সিন্‌টে জাতির শিক্ষার ভার অধিকাংশই Welsh Presbyterian Mission এর হাতে। প্রকৃত খাসীয়া ও সিন্‌টেং জাতি নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষের নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষার ধারা গাথার আকারে এখনও অব্যাহত রাখিয়াছে। শক্তিশালী সংঘবদ্ধ মিশনরী-দের চেষ্টা ও প্রচারের ফলে এসব অনেকাংশেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কারণ উহা সময়ে সংগ্রহ করা হয় নাই। যাহারা অন্যের জাতীয়

জীবনের বৈশিষ্ট্যে ও কার্য্যকারিতায় বিশ্বাসী নহে তাহারা কি করিয়াই বা সাগ্রহে, শ্রদ্ধার সহিত, আপাতঃহেয়-প্রতীয়মান সমাজ-ধর্ম্মের ভিতর হইতে জীবনের বীজগুলি কুড়াইয়া লইবে? তাহারা জানে না, প্রত্যেক উন্নতিকামী জাতির স্বাভাবিক গন্তব্য পথ রহিয়াছে। যাহারা অতীতকে সম্মান করে না, সম্পূর্ণরূপে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য পথ কোথায়?

যে সব গাথা বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ইহাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন সরল, সহজ, আড়ম্বরহীন, নিরলস ও কর্ত্তব্যপূর্ণ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ভগবান পিতা ও মাতা দুই-ই হইতে পারেন এ বিশ্বাস ইহাদের আছে। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার্থিব জিনিষের প্রয়োজন হয় না এবং পার্থিব অভাব, রোগ শোক দূর করিবার জন্যও তাঁহাকে ডাকিবার দরকার নাই। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতা বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছে ছাগল, শূকর, মোরগ প্রভৃতি খাসীয়ারা বলি দেয়। Divination by egg-breaking খুবই চলে। এদের পুরোহিতদের লংড (Lyngdoh) বলে। তাঁহারা পূর্ব্বে বিবাহ করিতেন না। লংড-রা খাসীয়া ভাষার কতকগুলি প্রার্থনা মন্ত্র মুখস্থ করিয়া রাখেন। নিম্নে একটি প্রার্থনা মন্ত্রের অনুবাদ দেওয়া গেল:—

"হে ঈশ্বরী জগদীশ্বরী আমার প্রার্থনা শোন। তুমি উপরে, তুমি নীচেও রহিয়াছ। তুমি সৃষ্টিকর্ত্রী, তুমি রক্ষাকর্ত্রী ও তুমিই সমস্ত জীবের জন্মদাত্রী। তোমার কৃপায় জন্ম, স্বাস্থ্য, ধন, জন লাভ করিয়াছি। আমার প্রণাম গ্রহণ কর; তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রার্থনা ·· কর···"ইত্যাদি।

হিন্দুদের সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে আসায় ইহাদের ভিতর বিশেষ বিশেষ হিন্দুপূজাও ঢুকিয়াছে। সেলার চণ্ডী পূজা ও নরটিয়াং-এর দুর্গাপূজা প্রসিদ্ধ। পূজার সময় নরটিয়াং উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। সিন্‌টেং রাজগণের নরটিয়াংএ প্রাচীন রাজধানী ছিল; এখনও

ইঁটের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গামন্দির রহিয়াছে এবং নিত্য পূজারী ব্রাহ্মণ (বাঙ্গালী) রহিয়াছেন। পূজার খুঁটিনাটি অঙ্গটুকুও সকলে শিখিয়াছে এবং শ্রদ্ধার সহিত উহা পালন করে বলিয়াই মনে হয়। হুলুধ্বনি, স্থানবিশেষ গোময় লেপন, পবিত্র বসন-ভূষণে পূজা বাড়ীতে গমন, পূজান্তে মিলিত ভাবে প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদি সবই অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। Langan, Bhoi, Lalung প্রভৃতি জাতিও মন্দিরে পূজাদি দেখিতে আসে। মন্দির হইতে কিছু দূরে খাসীয়া ধরণে ইহারাও শূকর, মোরগ প্রভৃতি দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়। সরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য দেবীরও দুইটি মন্দির আছে। তাহারা বলে, Muar-phain নামক একজন সিন্‌টেং রাজা সেখানে এই সব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কোনও কোনও পূজারী ব্রাহ্মণের চরিত্রহীনতার জন্য উহাদের ভিতর শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের দিকে কিছুই উন্নতি হয় নাই। কয়েকজন শিক্ষিত সিন্‌টেং বন্ধু বলিলেন—পূজার কয়েকদিবস ইহারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু সারা বৎসর সম্পূর্ণ অন্য রকম। আমারও বিশ্বাস ঐরূপ। প্রাচীনকালে এই মন্দিরে নরবলি দেওয়া হইত; এখনও মন্দিরের এক কোণে বিশাল তলওয়ার অযত্নরক্ষিত হওয়ায় মরিচা ধরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

শিল্প ও কৃষি

জৈন্তিয়া পাহাড়ে ভৈ-জাতি এণ্ডি মুগার প্রসিদ্ধ কাপড় বুনিয়া থাকে, লোহার কাজ সিন্‌টেংদের ভিতর অনেকেই জানে। সোনা রূপার কাজ অধিকাংশই বাঙ্গালী পোদ্দারদের হাতে। জৈন্তিয়া পাহাড় কৃষি-প্রধান, বড় বড় উপত্যকায় নানাবিধ ধানের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ইহারাই ব্যবসায় ও কাটা কাপড়ের কাজে (tailoring) দক্ষ। এদের ভিতর অধিকাংশ লোকই স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন। সহরের প্রত্যেক বাড়ীই একাধারে বাড়ী ও দোকান দুই-ই। সর্ব্বত্রই মেয়েরা অধিক কর্ম্মঠ ও সর্ব্বকার্য্যক্ষম। খাসীয়া পাহাড়ে কমলা ও আলুর চাষই

প্রধান। সিলেট অরেঞ্জ ও সিলেট লাইম খাসীয়া পাহাড় হইতেই আসে। আজকাল অনেক খাসীয়া ভাল মিস্ত্রীর কাজও শিখিয়াছে। নানা রকম শিল্প ও কলকব্জার কাজ শিখিবার জন্যও তাহারা খুব চেষ্টা করিতেছে। খাসীয়া মেয়েরা বেত ও বাঁশের কাজে দক্ষ।

(আগামী বারে সমাপ্য) ব্রহ্মচারী মহাচৈতন্য

সৃষ্টি-রহস্য

"সেথা হতে বহে কারণ ধারা
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ॥"

স্বামী বিবেকানন্দ

বাইবেলে লিখিত সৃষ্টি-প্রকরণের কথা আমরা আলোচনা করিব। লিখিত আছে—

"প্রারম্ভে ভগবান স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীর কোন আকার ছিল না এবং উহা মহা শূন্য ছিল এবং সর্ব্বত্র অন্ধকার বিরাজ করিত এবং ঐ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভগবানের আত্মা বিচরণ করিত।

"এবং ভগবান বলিলেন,—'আলোক হউক' এবং আলোকের সৃষ্টি হইল।"

চিন্তাশক্তি—ঈশ্বরপ্রদত্ত আমাদের একটি বিশেষ ক্ষমতা। স্বনামধন্য পাস্কাল বলিতেন, "দুই প্রকার ভ্রম আমরা করিয়া থাকি—একটি চিন্তাশক্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া এবং অপরটি কেবল চিন্তাশক্তির উপরে নির্ভর করা।" কবি, চিন্তাশীল, মহাপুরুষ, শিল্পী সকল

সময়ে কেবলই চিন্তাশক্তি ব্যবহার করেন না, অধিকন্তু অনুপ্রেরণার সাহায্য লইয়া থাকেন। অনুপ্রেরণা কি তাহা বলিয়া বুঝান যায় না, কারণ, উহা অনুভবের জিনিষ। অনেক সময়ে মনে এমন সকল ভাবের উদয় হয়, যাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদের মনে কখনও উঠে নাই। এই বিশ্বজগতে আমরাই একমাত্র অধিবাসী নহি। আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং যাঁহারা স্বষ্টির কথা—পূর্ব্বেই বা কিরূপ ছিল, পরেই বা কিরূপ হইবে—বেশী জানেন, এইরূপ অনেকে আছেন। কিরূপে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসা যায়, আমরা তাহা বলিতে পারি না; কেহ বলিবেন, রাত্রিকালে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কেহ বলিবেন, উপবাস ও প্রার্থনা দ্বারা;—পথ নিশ্চয় অনেকই আছে। তবে উচ্চ অঙ্গের কবিতা অনুপ্রেরণার ফলেই সম্ভবে। আমরা—সাধারণ মানবেরা, শত শত বৎসর ধরিয়া উহা আলোচনা করিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় না। বাল্মিকী, ব্যাসদেব, কালিদাস বা ভবভূতি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

বাইবেল গ্রন্থের স্বষ্টি-প্রকরণকে ঐ ভাবে দেখিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিলে চলিবে না। উহা কবিতা রূপে পাঠ করিতে হইবে এবং উহার অন্তর্নিহিত সত্য আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ভাবে স্বষ্টি-প্রকরণ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সময়ের প্রারম্ভে (সময়ের প্রারম্ভ আছে কি না আমরা জানি না, তবে পৃথিবী ও সৌরজগতের নিশ্চয়ই প্রারম্ভ আছে) একজন ঈশ্বর অথবা বিরাট শক্তিশালী মন স্বষ্টির কথা ও উহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন; কেহ বলিবেন, আমরা উহা বিশ্বাস করি না। আমাদের ধারণা স্বষ্টি স্বয়ম্ভূ এবং উহার প্রারম্ভে কোন মনঃ-শক্তি বা সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুমান করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সুইফ্‌ট্‌ 'গলিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে' লাপুটা

দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তথায় অনেক বৈজ্ঞানিকের বাস। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মিলিত হইয়া অভিধান হইতে সকল কথা কাষ্ঠফলকে খোদিত করিয়া একটি যন্ত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে আবদ্ধ করেন। ঐ যন্ত্রটি হাতল দ্বারা ঘুরাইলেই কাষ্ঠফলকগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইত, কখনও সম্পূর্ণ বাক্য এবং অধিকাংশ সময়েই অসম্পূর্ণ পদ পাওয়া যাইত। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন, ঐ ভাবে তাহারা অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন। পূর্ব্বে লিখিত প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ কথাই আমাদের মনে হয়। কিন্তু কোন মনঃশূন্য জগতের কথা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। সামান্য একটি যন্ত্র দেখিয়া, যে মস্তিষ্ক হইতে ঐ উদ্ভাবিনী শক্তি বাহির হইয়াছে, তাহার কথাই যেমন মনে হয়, প্রানিজগতের দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়া তেমনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতির যিনি বুদ্ধিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও প্রাণশক্তি দিয়াছেন সেই বিরাট-মনের কথাই কি মনে হয় না ?

এই বিশ্ব কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে ? সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম-ভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখি, দুইটি প্রাথমিক জিনিস হইতে সকলের উৎপত্তি—যোগাত্ম বৈদ্যুতিক শক্তি এবং বিয়োগাত্ম বৈদ্যুতিক শক্তি। কিন্তু অন্য একটি শক্তির প্রভাবে এই দুইটির মিলন সাধিত হয়। আমরা উহাকে বিক্ষিপ্ত শক্তি বা সাধারণ ভাবে আলোক বলিয়া থাকি।

জগতে এই মাত্র তিনটি প্রাথমিক জিনিষ। শেষোক্তটিকে 'জিনিষ' বলা যায় কিনা সন্দেহ ; তাহা অপর দুইটিকে মিলিত করে এবং ঐরূপে পরমাণুর সৃষ্টি হয়। আবার উহা না থাকিলে এই সুন্দর সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। যাহা হউক এই তিনটিকে কে সৃষ্টি করিল ? বিজ্ঞান এই স্থলে নীরব ; কবিতাও কল্পনা সহায়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে না ; মানবও সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারে না ; কেবল অস্ফুট ধ্বনি উঠিতে থাকে—"ভগবান এই জগতের আদিকর্ত্তা।"

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এ, বি-এসসি,

রাগমালা

অথ দীপকঃ (ধ্যানম্)

বালা রতার্থ প্রবিলীন দীপে
গৃহেঽন্ধকারে সুভগো প্রবৃত্তঃ।
তস্যাঃ শিরোভূষণ রত্নদীপৈ-
র্লজ্জাং দধৌ দীপক রাগ রাজঃ॥
ষড়্জাংশ গ্রহন্যাস রিপৌ বর্জ্জিত ঔড়বঃ।
তৃতীয় যামে দিবসে গীয়তে বিবুধৈর্জনৈঃ॥

মতান্তরে—

গান্ধারাংশ গ্রহন্যাসং পূর্ণা দীপকস্তথা।
প্রথম প্রহররাত্রে গীয়তে বিবুধৈর্জনৈঃ॥

(সঙ্গীত সময়সারেনোক্তং)

গান্ধারাংশ গ্রহন্যাসং পূর্ণোজাতি স্বরূপকা।
সন্ধ্যাকালে প্রগীয়ন্তে দীপকস্য প্রকাশিতঃ॥

(সঙ্গীত স্বরসাগরেনোক্তং)

অথ সম্পূর্ণ—

+ঠাট— { স স গ গ ম ধ ধ র্স
ণ ণ ধ ধ প গ গ ঋ গ ঋ গ ঋ স।

অথ ঔড়ব—

ঠাট— { স গ ম ধ র্স
ণ ধ ম গ স।

হনুমন্মতে ষড়্‌রাগেষু দ্বিতীয়রাগঃ, সূর্য্য-নেত্রান্নির্গতঃ, অস্য জাতিঃ-সম্পূর্ণা, গৃহস্তু ষড়্জঃ অথবা গান্ধারস্বরঃ; অস্যরূপম্ যথা বর্ণোরক্তঃ, বস্ত্রং পাটলবর্ণম্, গলভূষণম্ বৃহন্মুক্তামাল্যম্। মত্তহস্ত্যারূঢ়োঽয়ম্; বহুস্ত্রীপরিবৃতশ্চ। কস্যচিন্মতে লজ্জয়া, দীপনির্ব্বাপণেনান্ধকারময়ং গৃহং কৃত্বা স্ত্রীভীরমতে।

---

১ লজ্জা প্রকুর্ব্বন্ কৃতবান্ প্রদীপঃ। ইতি বা পাঠঃ।

+ণ = কোমল নি

ভরতমতে অস্য রাগিণ্য :—বিহঙ্গিনী, প্রদীপিকা, গৌণ্ডী, গুর্জ্জরী, রুদ্রাণী, পলাশীকা।

হনুমন্মতে অস্যরাগিণ্য :—প্রদীপিকা, পলাশীকা, টঙ্কী, বিহঙ্গিনী (বেহাগ), গৌণ্ডী, কর্ণাটী।

* মতান্তরে অস্যরাগিণ্য :—দেশা, কামোদী, নাটিকা, কেদারী, কহুড়ী, কর্ণাটী।

ভরতমতে এবং হনূমন্মতে

পুত্রাঃ যথা :—কুসুমঃ, টঙ্কঃ, মঙ্গলাষ্টকঃ, রভসমঙ্গলঃ, কিরোদন্তঃ, কমলঃ, কুন্তলঃ, কলিঙ্গঃ, চম্পকঃ, কুঙ্কুমঃ, রামঃ, লহিলঃ, হিমালঃ।

পলাশী জয়চ্ছ্রীযুক্তা ধবলশ্রী ধনাশ্রীকা।
দীপকো জায়তে বিদ্বন্ গ্রীষ্মর্ত্তৌ চ প্রগীয়তে॥ †

উক্ত দীপকরাগ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আমাদের দেশে প্রকাশিত হইয়াছে যে, উক্ত রাগ লুপ্ত হইয়াছে এবং সঙ্গীতগুরু তানসেনের পরে আর কেহই দীপক গাহিতে কিংবা শিক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই পরলোকগত তানসেন কি কেবল "দীপক রাগেতেই" সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয় তবে সে রাগটি লুপ্ত হইবে কেন? যদি উহা লুপ্ত হইত তাহা হইলে সমস্ত রাগরাগিণীই লুপ্ত হইত। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহা নহে; সাধক কোনও একটি বস্তুতে সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া (অর্থাৎ ঈশ্বর-জানিত হইলে) অন্য বস্তু পাইতে নিষ্ফল হইয়াছেন, ইহা হইতে পারে না; কারণ, যিনি উৎকৃষ্ট চিত্রকর তিনি সমস্ত বস্তুই উত্তমরূপে চিত্রিত করিতে সক্ষম। আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কয়েকজন গুণী উল্লেখ করিয়াছেন যে, পঞ্চম "রাগটিই" "দীপক রাগ"। তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কারণ প্রাতঃস্মরণীয় তানসেনজীর বংশধরগণ

* এই মতটি সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

† সঙ্গীত শাস্ত্র। সঙ্গীত সময়সার। সঙ্গীত নারায়ণ। ভরত সূত্র। সঙ্গীত দর্পণ। সঙ্গীত স্বরসাগর। নারদ সংহিতা। তহফ্‌তোল হিন্দ।

এখনও জীবিত রহিয়াছেন; তাঁহারা দীপকরাগ ব্যবহার করেন; শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিয়া থাকেন; কোনও রাগ কিংবা রাগিণী এ জগৎ হইতে লুপ্ত হয় নাই, কেবল প্রকৃত সাধকেরই অভাব হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত রত্নাকর

আজগুবী

তেলাপোকা কাঁচপোকা হয় এ কথা শুনে হয়ত অনেক পাঠক-পাঠিকা হাসবেন। বেদে এর উদাহরণ আছে। জীব পরমাত্মা ভাব্‌তে ভাব্‌তে পরমাত্মাই হয়ে যায়, যেমন তৈলপোক মণিকীট ভাব্‌তে ভাব্‌তে মণিকীট হয়ে যায়।

এ সম্বন্ধে এক বন্ধু বলেন, কাঁচপোকা তেলাপোকাকে ধরে নিয়ে গর্ত্তে রাখে; যতটুকু খাবার খেয়ে, তার পেটে ডিম পাড়ে, পরে সেই ডিম থেকে কাঁচপোকা বের হয়—লোকে বলে তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়েছে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে, তার আকৃতি তেলাপোকারই মত। খালি রং কাঁচপোকার মত,—এর উত্তর কি ?

*　　*　　*

প্রাণিগণের হাড় সময়ে পাথর হয়ে যায়। মাটির নীচে এর যথেষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু সজীব মানুষের হাড় পাথর হয় এ কথা খুব আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নেই। ডাব্‌লিন নগরের যাদুঘরে (Museum) এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রমাণ আছে। কর্ক নগরে ক্লার্ক নামে একটি লোক সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে পাথর হয়ে গিয়েছিল এবং সেই অবস্থায় সে অনেক দিন বেঁচে ছিল। যারা ক্লার্ককে জানত তারা সকলে বলেছে, এই আশ্চর্য্য রকম বদল হবার আগে ক্লার্ককে সকলে খুব চট্‌পটে ও বলশালী লোক বলে জানত। এক রাত্রে খুব মদ খেয়ে অত্যাচারের পর মাঠে পড়ে ছিল। ওঠবার সময় ক্লার্ক বুঝতে পারলে তার শরীর কি রকম

অবশ হয়ে গেছে। তারপর ক্রমে তার চোখ, চর্ম্ম ও অন্ত্রাদি ছাড়া আর সব অবয়ব পাথরের মত হয়ে গেল, তখন সে সাহায্য ছাড়া উঠতে কিংবা বসতে পারিত না, শেষকালে সে কোনও দিকে নীচুও হতে পারত না, দাঁড় করিয়ে দিলে দাঁড়াতে পারত কিন্তু নড়বার চেষ্টা করা বৃথা হোত। তার দুপাটি দাঁত জোড়া লেগে একখানা হয়ে গিয়েছিল। তরল খাবার পেটে ঢেলে দেবার জন্যে দাঁত ভেঙ্গে ফাঁক করা হয়েছিল। সে জীব নাড়তে পারত না, আর মরবার আগে চোখেও দেখতে পেত না। ডাব্‌লিনের যাদুঘরে ক্লার্কের পাথরের দেহ যত্ন করে রাখা হয়েছে।

পুরান গ্রীসের দেবতত্ত্বের মধ্যে এই রকম কাহিনী এক আধটা শোনা যায়। আমাদের দেশে গৌতমপত্নী অহল্যা অনেক কাল পাষাণী হয়ে ছিলেন। বোধ হয় পাষাণ হবার আগে নিশ্চয়ই কোনও উৎকট মনোবিকার কিংবা চিন্তাবেশ উপস্থিত হয়েছিল। তারই প্রভাবে অহল্যার মানবীয় উপাদান নষ্ট (decompose) হয়ে গিয়ে নতুন এক রকম গঠন হয়েছিল—সন্দেহ নাই।

* * *

নদীয়া জেলার মধ্যে "দামুরহুদা" গ্রামে একটি স্ত্রীলোক ছিল। সে কিছুই খেত না, অথচ তার শরীর সুস্থ ও লাবণ্যযুক্ত ছিল। অনেক নীলকর সাহেব ও বাঙ্গালী তার সেই অদ্ভুত ব্যবস্থা নিজের চোখে দেখেছেন। তার সেই অনশন ব্রতের সম্বন্ধে গুজব এই যে, স্ত্রীলোকটি বিধবা হবার পর ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত শোকে অভিভূত ছিল। খাওয়া দাওয়া দূরের কথা একদিনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। ক্রমে শোক কমে এলে তার খাবার ইচ্ছা হোল। খেলে, কিন্তু তা তার পেটে রইল না, বমি হয়ে গেল। পরদিনও তাই হোল। রোজ যখন এই রকম বমি হতে লাগল তখন সে আর খেত না। না খেয়েও সে অনেক দিন বেঁচে ছিল। বিশেষ কোন অসুখও হয়নি এবং বলহীন বা কৃশও হয়নি। এই স্ত্রীলোক বাঙ্গলা ১২৮০ সালেও বেঁচে ছিল।

* * *

বাইবেল বলেন, দুহাজার বছর আগে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেন। আর বিদেশী পণ্ডিতরা ঠিক করেছিলেন, ভারতের সভ্যতা খৃষ্ট জন্মাবার পাঁচ সাতশ বছর আগে। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের মহে-ঞ্জোদারো-র খননের ফলে আমাদের দেশের সভ্যতা যে খৃষ্ট জন্মাবার ৫০০০ হাজার বছর আগের, তার স্পষ্ট চিহ্ন সকল পাওয়া গেছে। এই খননের মধ্যে একটি রূপোর কৌটো পাওয়া যায়। সেটি এক টুকরো কাপড়ে মোড়া ছিল সেই কাপড়ের টুকরো এখনও কৌটোর গায়ে লেগে রয়েছে। ৫০০০ বছর আগের কাপড় কি রকম অবস্থায় আছে তা সকলে অনুমান করুন। যেটা বাকী ছিল সেটা বোম্বাইয়ের কার্পাস সমিতির ডিরেক্টর মিঃ টার্ণার পরীক্ষা করে বলেছেন যে, উহা খাঁটি কার্পাস. অন্য দেশে যখন লোহা বের হয়নি, তখন সেই প্রাচীন যুগেও ভারত কার্পাসের ব্যবহার জানত।

*　　　*　　　*

নিউইয়র্কের কার্ক্যাপের নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক কয়েকটি কলের মানুষ তৈরী করেছেন। এই মানুষগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে প্রশ্নের উত্তর দান করে ও আদেশ পালন করে। এই মানুষগুলির মধ্যে একটি এমন ভাবে তৈরী যে "সিসেম দ্বার খোল" বলা মাত্র এই মানুষটি দরজা খুলে দিয়েছিল, এবং অনেকগুলি বিজ্লীবাতি ও পাখা চালিয়ে দিয়েছিল? যদি সমস্ত শব্দ ঠিক স্বরের সহিত উচ্চারণ করা হয় তা হলে কলের মানুষগুলো ঠিক সেগুলোই বুঝতে পারে। খুব জোরে, খুব আস্তে শব্দ করলে কিছুই করবে না। উপস্থিত এই তিনটি মানুষকে জলসরবরাহের কাজে লাগান হয়েছে।

*　　　*　　　*

মীরা নামে একটি তারার রহস্য ভেদ করবার জন্যে গত তিন বৎসর ধরে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতরা খুব আলোচনা করছেন। তাঁরা এই রহস্যজনক তারাটির উপর বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। খোলা চোখে একে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রায় দশমাস পরে এর মধ্যে এমন কিছু ঘটে, যার ফলে ওর তেজ অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে যায়; তখন

একে খোলা চোখেও দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ আগে একে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু আজকাল যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও দেখা যাচ্ছে। এই তারাটি পৃথিবী থেকে ৬০০০০০০০০০০০ কোটি মাইল দূরে থাকে। এ প্রায় দুপুর রাতে পূর্ব্ব দিকে ওঠে এবং তিন ঘণ্টা পরে দক্ষিণ দিকে অস্ত যায়। দশ মাস আগে এই অদ্ভুত তারার ভিতর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটে, যার ফলে ওর তেজ বেড়ে যায়।

* * *

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রিজ ভন বের (Fritg Von Bher) একটি রঞ্জক পদার্থ বের করেছেন। তা প্রয়োগ করে নেইন প্রদেশের মেকিয়স নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী বনের গাছগুলির স্বাভাবিক রং বদলিয়েছেন। গাছগুলির কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি হলদে, কোনটি কমলালেবুর রঙে পরিণত হয়েছে। রং এমন পাকা হয়েছে যে, জল কিম্বা এসিড দ্বারা তাদের রং বদলায় না। বার্চ্চ (Birch), বীচ (Bech), মপ্‌ল্‌ (Mople) প্রভৃতি গাছগুলিকে এই রকম রং করে সেই কাঠে বোতাম, ছাতার বাঁট প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে, কাঠগুলি কেটে খালি পালিশ ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না। এই রং ব্যবহার করায় গাছ বাড়বার পক্ষে কোনও বাধা জন্মায় না। তবে কাঠ কিছু শক্ত হয়।

* * *

অনেক দিন থেকে বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রলোক সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করেছেন, এর ফলে এইটুকু জানা গেছে যে, চন্দ্রলোকে জল ও হাওয়া নেই, সেই জন্যে কোনও প্রাণীর বাস নেই তবে ছোট ছোট ঘাস আছে। এ ছাড়া বিশেষ কিছু আবিষ্কার হয়নি।

* * *

আহৃতা—শ্রীঅমিতা রায়

আসামী সংগীত

বসন্ত আহ্বান

আজি নতুন ফাগুন দিন।
বিশ্ব-বীণর পুৰাণি তাঁৰত
ঝোঁকাৰ উঠিছে ৰিন্ ঝিন্ ঝিন্।

তাঁৰৰ ঝোঁকাৰ সুৰৰ ৰাগী
গাছৰ নতুন পাতত লাগি
নাচোন জাগে তাধিন্ তাধিন্।

মোৰ সুৰৰ ৰাগী লাগিছে
মোৰ প্ৰাণত নাচোন জাগিছে।

মোৰ হৃদয়ৰ মাজে মাজে
কাৰ নে-দেখা নেপুৰ বাজে
মঞ্জিৰা বাজে ৰিন্ ঝিন্ ঝিন্।

আজ নতুন ফাগুন দিন। বিশ্ব-বীণার পুরাণো তারে ঝঙ্কার উঠ্‌চে—রিন্ ঝিন্ ঝিন্।

গাছের নতুন পাতায় তারের ঝঙ্কার আর সুরের নেশা লেগে নাচন জাগ্‌চে—তাধিন্ তাধিন্।

আমার সুরের নেশা লেগেচে, আমার প্রাণে নাচন জেগেচে।

আমার হৃদয়ের মাঝে মাঝে কার অ-দেখা নূপুর বাজে—মঞ্জিরা বাজে—রিন্ ঝিন্ ঝিন্।

শ্রীপার্ব্বতিপ্রসাদ বরুয়া

'জল্‌সা'র চিঠি

মাননীয়—

* * * আমার কোন অল্পবয়স্কা আত্মীয়ার সঙ্গে 'জল্‌সা'র কথাবার্ত্তাই কইছিলুম এমন সময় ডাকে 'উদ্বোধন' এল। পত্রিকা খুলে পাতা উল্টাতে উল্টাতে 'মাধুকরী'র ভেতর মহিলা-থিয়েটারের আলোচনা দেখে আমরা দুজনেই আগ্রহের সঙ্গে তা পড়তে আরম্ভ করলুম। এর কিছু কিছু আগেই সংবাদপত্রে পড়েছি। কোন কারণে আমাদের ধারণা হয়েছিল—আপনারা এ রকম থিয়েটারের হয় ত পক্ষপাতী, এখন সে ধারণা চলে গেল।

আলোচনা যখন মেয়েদের সম্বন্ধে তখন আমরাও কিছু বোলতে পারি। পুরাকালের ইতিহাস আমি বিশেষ জানি না, তবে এ কালে যে ভদ্র-মহিলাদের থিয়েটার হচ্চে, এর মূলে—পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ। অনেক বছর আগে তিনি নিজের আত্মীয়-আত্মীয়াদের নিয়ে একবার থিয়েটার করেছিলেন (বোধ হয় 'রাজা-রাণী' প্লে হয়েছিল)। অবশ্য পাবলিক্ থিয়েটার নয়। এই নিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রবিবাবুকে এত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলেন যে, তিনি আর ও-রকম থিয়েটার করেন নি। তার পর বৃদ্ধ বয়সে সেই ম্যানিয়া আবার তাঁকে পেয়ে বসেচে। বহুদিন ধরে তাঁর লেখা দিয়ে বর্ত্তমান সমাজকে অনেকটা নিজের ভাবে নিয়ে এসে তিনি আবার আসরে নেবেচেন। ক'বছর আগে তিনি আবার তাঁর আত্মীয়াদের নিয়ে থিয়েটার করেছিলেন—এ কথা সকলেই জানেন। যখন সমাজে কোন বিরুদ্ধ আন্দোলন হোল না, তখন ঘন ঘন তিনি মেয়েদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নাবতে লাগলেন। এখন এই বাতিক্ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েচে। তবুও কিছুদিন পূর্ব্বে শুধু মেয়েরাই থিয়েটার কোরতেন এখন মেয়ে ও পুরুষ একই সঙ্গে আসরে নাবেন।

সত্যি কথা বোলতে, আমরাও প্রথমে এ রকম থিয়েটারের বিপক্ষে ছিলুম না; বরং ভাল বোলেই মনে কোরতুম। মহিলা-থিয়েটার আমরা কয়েকবার দেখেও এসেচি। কিন্তু গিয়ে, রঙ্গমঞ্চের মেয়েদের সম্বন্ধে দর্শক ছেলেদের মুখ থেকে যে ইতর আলোচনা আমরা শুনেচি, তাতে মনে হচ্চিল—উঠে চলে যাই। সাধারণ-মানুষ রঙ্গালয়ের সাধারণ-মেয়েদের সম্বন্ধে যেমন বিদ্রূপ করে যে বিদ্রূপও এঁদের সম্বন্ধে শুনে এসেচি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এসব শুনেও মেয়েদের বাপমারা কি করে আবার মেয়েদের থিয়েটার কোরতে পাঠান? তাঁদের কি আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান কিছুই নাই? নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কুৎসিৎ আলোচনা কি কোরে তাঁরা শোনেন? এই সব শুনে আমার পরিচিতা অনেক মহিলা—আমার মতই যাঁদের পূর্ব্বে অন্য ধারণা ছিল—এইরূপ অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, শুধু তাই নয়, নিজের বোনদের সম্বন্ধে পাছে এই সব ইতর ঠাট্টাবিদ্রূপ আবার শুনতে হয় সে জন্যে তাঁরা মহিলা-থিয়েটার একেবারে বর্জ্জন করেচেন। তাঁরা বলেন, "রাজবন্দীদের সাহায্যের জন্যেই হোক আর যে জন্যেই হোক টাকা আমরা পাঠিয়ে দেব—কিন্তু ও-রকম থিয়েটারে আর যাচ্চি না। ছিঃ ছিঃ ওখানে আবার ভদ্রলোকে যায়?"

তার পর যে সব মেয়েরা থিয়েটার কোরচে তাদের আমি তত দোষ দিই না, যত দোষ দিই তাদের বাপ মা ও ভাইদের। ছেলেমানুষ মেয়েদের সংসারের কি অভিজ্ঞতা আছে? কিসে কি হয়—তারা কি জানে? বাহবা পেয়ে তারা নেচে ওঠে। অভিভাবকরা প্রশ্রয় না দিলে তারা কি কখনো রঙ্গমঞ্চে গিয়ে নাচগান কোরতে পারে? তবে একটা কথা স্বীকার না কোরে পারচি না। ছেলেদের সঙ্গে মেশবার একটা স্বাভাবিক টান মেয়েদের আছে। অবশ্য যে সব মেয়ে বড় হয়েচে তাদেরই মনে এই রকম আকর্ষণ হয়। মেশবার সুযোগ পেলে তারা সে সুযোগ সহজে ছাড়তে চায় না—শেষে তাই নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এই নেশাই থিয়েটার-করা-মেয়েদের এখন পেয়ে বসেচে।

আমার যে আত্মীয়াটির সঙ্গে এতক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা কোরছিলুম

সে,—নে পড়ে। তার কাছে শুনলুম, কলেজের অনেক মেয়েই এই রকম থিয়েটারের বিপক্ষে। যারা পক্ষে—তাদের কোন-না-কোন আত্মীয়া থিয়েটারের দলে আছে। বিপক্ষ মেয়েরা বলে, "যারা থিয়েটার করে, নটীদের মত যেখানে সেখানে তাদের আলোচনা হয়, অন্যান্য থিয়েটারের পেশাদার নর্ত্তকীদের মত বিজ্ঞাপনে তাদেরও নানা ঢং-এর ছবি ছেপে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে,—এ আমরাই সহ্য কোরতে পারি না, তারা কি কোরে করে, ভাই।

আর্ট ভাল তা আমরাও জানি, কিন্তু সেই আর্টের জন্যে আমার কোন ছেলেমেয়েকেই নৈতিক বিপদের পথে বা সাধারণ নট-নটীদের দলে ফেলে দিতে চাই না—তাতে আর্ট থাক্, আর যাক্।

আমাদের লজ্জা হয় যে, বৃদ্ধা সরলা দেবীই কচি কচি মেয়েদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নিজের মেয়ে থাকলে এতটা কোরতেন বলে মনে হয় না। Experiment অন্যের ওপর দিয়ে সকলেই কোর্‌তে পারেন। তাঁর এই সর্ব্বনেশে হুজুগ যাতে বন্ধ হয় তাই আমরা চাই। যাতে এ সম্বন্ধে আপনারা ভাল করে লেখেন সে জন্যে আপনাদের অনুরোধ কোরচি।

'উদ্বোধনে'র পাঠিকাগণ, অনুগ্রহ করে আমায় ভুল বুঝবেন না—আমিও আর্ট চাই, মেয়েদের নাচগান শেখাবার ইচ্ছা আমারও খুব, কিন্তু পয়সা কুড়োবার জন্যে বা বাহবা নেবার জন্যে আমার মেয়েকে আমি বাজারে নাচাতে চাই না * * *

শ্রীসুষমা দেবী

মাধুকরী

সরিষায় ভূত

মূল কথা,—নীরব অভিনয়

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার শিক্ষিত ও অর্থশালী সমাজের কতিপয় ব্যক্তি মিলিয়া সাধারণ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মূক অভিনয় বা তাব্লো ভিভাঁ করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে ও ভবানীপুরের সম্মিলন ব্রাহ্ম-সমাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সময় বিলাসী সমাজের এই অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত হয় এবং এরূপ ভাবে ভদ্র পুরুষ ও স্ত্রীলোকের রূপ দেখাইয়া পয়সা উপায়ের ফিকিরের বিরুদ্ধে জন-মত গঠিত হইয়া উঠে। কিন্তু তথাপি এই বিলাসী ও অর্থশালী সমাজ এই মূক অভিনয় বন্ধ করিলেন না। তাঁহারা বলিয়া-ছিলেন, "আমরা ত বাক্য আবৃত্তি অথবা নৃত্যগীতের সাহায্যে অভিনয় করিতেছি না, কেবলমাত্র নীরবে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতেছি মাত্র; ইহাতে আর দোষ কি?" ভদ্রসমাজে জনসাধারণের সমক্ষে দানের জন্য অর্থসংগ্রহের অছিলায় অভিনয় করার ইহাই প্রথম চেষ্টা। সেই সময়ে ভদ্রসমাজের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ জনসাধারণের সমক্ষে নাটক অভিনয় করিবার সাহস লাভ করেন নাই। এই স্থানেই ভদ্রমহিলার অভিনয় করিবার স্পৃহার প্রথম উন্মেষ হয়। উক্ত অভি-নয় করিতে যাইয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা তৎকালীন লোক অবগত আছেন।

দ্বিতীয় সোপান,—সঙ্গীত

ইহার পরে অধঃপতনের দ্বিতীয় সোপান আরম্ভ হইল। সেই বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনের ছলে জনসাধারণের সমক্ষে ছাত্রীদিগকে দিয়া সঙ্গীত করাই-

য়াছেন। ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে বালিকা ও মহিলাদের দ্বারা সঙ্গীত করাইয়া কোন কোন দান-কার্য্যের জন্ম অর্থোপার্জ্জন করা হইয়াছে। ইঁহারা বলেন যে, মস্ত বড় একটা ত্যাগ করিয়া ও শ্রম স্বীকার করিয়া উত্তম কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে কেবল জন-সাধারণের বাহবা লইবার জন্য আপনাদিগের কলা-নৈপুণ্য জনসাধারণকে দেখাইয়া যশোপার্জ্জন করিবার ইচ্ছাতে এই কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। জনসাধারণ ও যুবকগণ ভদ্রমহিলাদের এই অভিনয় দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া আসে, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে মানব-চিত্তের সুপ্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে খোঁচাইয়া জাগাইতেছেন, তাঁহারা যে বিলাতী পাপ প্রচ্ছন্নভাবে এদেশে আনয়ন করিতেছেন, এ কথা তাঁহারা বুঝিলেন না।

তৃতীয় সোপান,—বাক্যস্ফুরণ

ক্রমে এই বিলাসী সমাজের সাহস বাড়িয়া গেল। এবার অধঃ-পাতের তৃতীয় সোপান। এখন মুখ খুলিয়া গেল। আর লজ্জা সরম রহিল না। নীরব অভিনয় ক্রমে সরব হইয়া উঠিল! বাঙ্গলার ভদ্র-সমাজে এই সকল অর্থশালী ব্যক্তিগণ বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতী-গণকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে নাচাইয়া অধিকতর অর্থসংগ্রহের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গৃহে এক নাট্যাভিনয়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ——র কন্যাকে নাচাইয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিন চারদিন নৃত্য দেখাইয়া তিনি অনেক অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। নারীর নৃত্য দ্বারা অর্থসংগ্রহের পথ তিনিই প্রথম দেখাইয়া দিলেন এবং বিলাসী সমাজ বুঝিল যে, নারীকে নাচাইলে ও তাহার দ্বারা নাটক অভিনয় করাইলে অধিক অর্থ উপার্জ্জন হয়। তাহার কিছুদিন পরে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে কোনও হিন্দু বালিকাগণের সঙ্গীত-বিদ্যা-লয়ের বালিকাগণকে নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া এক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী'তে তাহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।

তখন বাঙ্গলা দেশের অনেক সংবাদপত্রে "সঞ্জীবনীর হিন্দু বিদ্বেষ" বলিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পত্রিকার সম্পাদকগণ বুঝিলেন না যে, বাঙ্গলা দেশের সভ্যতাকে, নারীর শালীনতা ও পবিত্রতাকে 'সঞ্জীবনী' কতটা উচ্চে স্থান দিয়াছে এবং তাহারই জন্য প্রতিবাদ করিয়া 'সঞ্জীবনী' বলিয়াছিল, এইরূপে অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা বিশ্বভারতী ও সঙ্গীত-বিদ্যালয় রসাতলে যাউক। ইহারই কয়েক মাস পরে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কয়েকজন যুবক-যুবতীর সাহায্যে অভিনয় করিয়া এক বিধবা-আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী'তে তাহারও প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে রাজবন্দীদের অর্থকষ্ট দূর করিবার অজুহাতে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি এক নাচের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, "রাজবন্দীর অর্থ কষ্টের কথা দূর হউক,—তামাসা দেখিয়া যাও।" সেদিনের সাগর-নৃত্যে নৃত্যকারিণীর পরিধেয় বস্ত্রের কথা শুনিয়া লজ্জায়, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছি। যিনি এই সাগর-নৃত্য দেখাইয়াছিলেন, তিনি পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ——। স্বদেশী যুগের সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ দীর্ঘাকৃতি ইন্দ্রিয়জয়ী বীরহৃদয় রমাকান্তের কথা সকলের মনে আছে। আজ শ্রীমতী —— তাঁহার স্মৃতিতে কালিমা লেপন করিল। আমরা শুনিয়াছি শ্রীমতী —— এমন নর্ত্তকীর বেশভূষা করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া গ্রাম্য কৃষকেরাও শিহরিয়া উঠিত। সেই কুরুচিজনক ভাব ভঙ্গিতে অসভ্য চাষার নৈতিক জ্ঞানেও আঘাত লাগিত। কিন্তু কলিকাতার দর্শকমণ্ডলী অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই নৃত্য দর্শন করিয়াছে ও আনন্দে করতালি দিয়াছে!

কোথায় যাইতেছি

এখন জিজ্ঞাসা করি, আমরা কোথায় চলিয়াছি? যাঁহারা নারীর পবিত্রতা, শালীনতাকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত করেন তাঁহারা সমাজ ও দেশের শত্রু। অর্থশালী

বলিয়া আজ তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সমাজে চলিয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহারা বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা আশা করি যে, সংসারানভিজ্ঞ যুবক-যুবতীকে তাঁহারা সৎপথে চালাইবেন, পবিত্র জীবনযাপনে সাহায্য করিবেন, দুঃখ ও লজ্জার বিষয় তাঁহারাই এই সকল অল্প বয়স্কগণকে এইরূপ হীন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। কোথায় তাঁহারা সুপথে চলিবার জন্য অল্পবয়স্কদিগকে উপদেশ দিবেন, অল্পবয়স্কগণ বিপথে চলিলে কোথায় তাঁহারা পথ প্রদর্শন করিবেন, অপরিণত বয়স্ক উন্মার্গগামীকে সংযত করিবেন,—না তাঁহারাই এ সকল জঘন্য উপায় অবলম্বন করাইতেছেন। আজ যাহারা দান উপলক্ষে নৃত্য করিয়া দর্শকদিগের চিত্তবিনোদন করিতেছে, কাল তাহারা যে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এই কার্য্য করিবে না, তাহা কে বলিল? কি ভাবে এই সকল ভদ্রগৃহের যুবক-যুবতীদের নৃত্য ও নাটক জনসাধারণ গ্রহণ করে, তাহা গ্যালারীর যুবকদিগের টিট্‌কারী ও অশ্রাব্য মন্তব্যেই বুঝা যায়। স্বরাজ্যদলের মুখপত্র 'বাঙ্গালার কথা' ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের নৃত্যকে "রসের আসর" বলিয়াছেন, এবং নৃত্যকারিণীর 'লীলায়িত দেহ' 'অনুভূতির' দ্বারা বুঝিয়াছেন।

গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অজুহাতে —— পৌত্র ও কয়েকজন বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্রাহ্ম যুবক-যুবতী মিলিয়া নৃত্য-গীতবহুল 'আলিবাবা' নাটক করিয়া বিলাস বাসনা পূর্ণ করিলেন, সংবাদপত্রের বাহবা পাইলেন। আজ গোখলে বাঁচিয়া থাকিলে এই অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারাই আবার চিত্ত-রঞ্জন সেবা সদনের জন্য পুনরায় 'আলিবাবা' নাটক করিয়া প্রায় ৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীগণ অপর এক পুরুষকে অভিনয় ব্যপদেশে স্বামী সম্ভাষণ করিয়া যে অর্থ লাভ করিয়াছেন, সেই ঘৃণিত অর্থ দ্বারা নারীর সেবা হইবে!! এই অর্থে নারীর আত্মমর্য্যাদাকে পদাঘাত করিতেছে!

ডাঃ —— ঘোষ তাঁহার পত্নীর স্মৃতি রক্ষার জন্য এক আশ্রম করিয়াছেন। এই আশ্রমে পতিতা নারীদের কন্যাগণ ও অন্যান্য

বালিকাগণ শিক্ষালাভ করে কিন্তু ইহার জন্য পতিতা নারীগণ সারা-রাত্রি থিয়েটার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিল। পতিতা নারীগণ অল্পবয়স্কা বালিকা চুরি করিয়া অহরহ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছে। আর পতিতা নারীগণ অল্পবয়স্ক বালিকার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে! ইহা-পেক্ষা ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে? তাহারা যদি সৎপথে চালিত হইত তবে অন্য কথা ছিল, কিন্তু তাহারা যে পর্য্যন্ত তাহা করে নাই, সে পর্য্যন্ত এই সঞ্চিত অর্থ পাপের অর্থ,—পুণ্যকার্য্যে এই অর্থ ব্যবহার করার অর্থ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া।

বালির বাঁধ

একবার যখন ভদ্রঘরের নারীর নৃত্য সুরু হইয়াছে, তখন যে ইহা ঘন ঘন হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সম্ভ্রমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক পরিচালিত সঙ্গীত সম্মিলনী সেজন্য তাঁহাদের শিক্ষার্থিনী-দিগকে নাচাইয়া অর্থসংগ্রহের সুবিধা ছাড়িবেন কেন? তাঁহারাও মীরাবাই নাটক করিয়া ও শ্রীমতী ——র স্বপ্ননৃত্য করাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। থিয়েটারে খুব ভিড়ও হইয়াছিল, না হইবার কারণ নাই। জনসাধারণ ব্যবসাদার নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া ক্লান্ত হইয়াছে। তাহারা ভদ্রঘরের যুবতীর নৃত্যের দ্বারা উত্তেজনা চাহে। এই নাটক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের দ্বারা লিখিত। সঙ্গীত সম্মিলনীর পরি-চালিকাদের মধ্যে ——র পত্নী ও ডাঃ ——র পত্নী আছেন। শিক্ষার্থিনী-গণ তাঁহাদের সন্তানের তুল্য। তাঁহাদের নিকট হইতে সুশিক্ষা পাইবে ইহাই সকলে আশা করে, কিন্তু সঙ্গীত সম্মিলনীর সাহায্য সংগ্রহের ছলে নিজেদের বিলাস বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এই সকল শিক্ষার্থিনীর দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের ফিকির বাহির করিয়াছেন। তাহারা ৪ঠা মার্চ্চ পুনরায় রঙ্গালয়ে 'দিবসের অভিব্যক্তি' নামে এক নাটিকার অভিনয় করিবেন ও নারীকে নাচাইবেন। শুনা যায় তাহাতে নব-বিধান সমাজের বিখ্যাত ——র পুত্র ডাঃ ——র আত্মীয়া থাকিবেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ৺——র পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ——র

কন্যা যোগ দিবেন। ঐদিন পুনরায় নৃত্য দ্বারা দর্শকদের মনোনয়নের ব্যবস্থা হইতেছে।

সবুজ বাসনা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিলাস বাসনা এখনও "সবুজ" রহিয়াছে। শুনা যায়, তিনি বিশ্বভারতীতে নারীর নৃত্যের ক্লাস খুলিয়াছেন। বালিকা ও যুবতীগণ তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করে। তিনি তাহার এক চলচ্চিত্র (সিনেমা ফিল্ম) উঠাইয়াছেন। সেই চিত্রে দেখা যায়, তিনি মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া যুবতীগণ নৃত্য করিতেছে ও তিনি তাল দিতেছেন,—দূরে তবলচী তবলা বাজাইতেছে! তিনি সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ বালিকাগণকে এ কি শিক্ষা দিতেছেন? আমরা এই সকল বিলাস বিভ্রম দেখিয়া দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইতেছি। বাঙ্গলার ভদ্র সমাজে বিলাতী পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। আমরা জনসাধারণকে ইহা উৎপাটিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অপরাধী ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে কুসংস্কারপূর্ণ বঙ্গদেশকে সভ্যতার নূতন বর্ত্তিকা দেখাইয়াছিল। আজ বাংলার সমাজ যে ভাবে উন্নত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য অল্প নহে। এই সকল নৃত্যকারিণী এবং যাঁহারা তাহাদিগকে এই সকল নৃত্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। আজ তাঁহারা এই সকল অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীগণকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছেন? আজ ব্রাহ্মসমাজ তথাকথিত দানের নামে যে শালীনতা নষ্ট করিতেছেন, কাল তাহা অন্যান্য সমাজে আরম্ভ হইবে। এই সকল যুবক-যুবতীকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সাহায্য করিতে দেখা যায় না, কিন্তু বিলাসে, নৃত্যে, দানের নামে অর্থোপার্জ্জন করিতে তাহারা অগ্রণী। ব্রাহ্মসমাজ কোথায় চলিয়াছে? স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা

নহে, স্বাধীনতার অর্থ সমাজের পবিত্রতা ধ্বংস করা নহে, স্বাধীনতার অর্থ অবাধ মেলা মেশা নহে।

মানবের মনে যখন ধর্ম্মের প্রেরণা আসে, তখন তাহার উন্নতি সকল দিক হইতেই হয়। ব্রাহ্মসম্প্রদায় সমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশবাসীকে আপনাদের উদাহরণদ্বারা উন্নতির পথে চালিত করিলেন। বাংলার নব অভ্যুদয়ে সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞান-জগতে প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষায় ও আইন ব্যবসায়ে আনন্দমোহন, দেশ-শাসন-কার্য্যে লর্ড সিংহ, জন-সেবায় শশিপদ প্রভৃতি বিখ্যাত হন। ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্ম-সমাজ উন্নতির পথ দেখাইয়া বাঙ্গালীকে নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। এমন দিন ছিল যে, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ সকল কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে চাহিয়া থাকিত। আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন অপরি-ণামদর্শী ব্যক্তি বিলাসের পিচ্ছিল ও পঙ্কিল পথে বাংলার যুবক-যুবতী-গণকে চালিত করিতেছেন, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ আপনাদিগের অধঃ-পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা সমাজের অধঃপতনের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন।

উৎপত্তি ও লয় একই স্থানে

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে হইয়াছে বলিলেই হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়স হইতেই নাটকের পক্ষপাতী! সেই সময় হইতে তিনি আপন গৃহে আপন আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে নাটকের অভিনয় করিতেন। ক্রমে তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং অবশেষে এখন যুবতীর নৃত্যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ভবিষ্যতে অবস্থা আরও কি ঘৃণিত হইবে কে জানে? যে পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সেইখানেই তাহার লয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম্ম আজ বহুদূর; যে স্থানে মানবের মুক্তির আয়োজন হইয়াছিল,

সেই স্থানে মানবের জঘন্য বৃত্তির ধূমায়িত বহ্নিতে ইন্ধন দেওয়া হইতেছে !

নীতি-শিক্ষার বলিদান

গত শুক্রবার নারী শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে এক অভিনয় ব্রাহ্ম-বালিকা স্কুলে হইয়াছে, তাঁহাদেরও অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অভিনয়। ব্রাহ্মবালিকা স্কুলের ছাত্রীগণকে লইয়া অভিনয় করা হইয়াছে। স্বনাম-খ্যাত স্যার ——র পত্নী শ্রীমতী —— নারীশিক্ষা সমিতি ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় উভয়েরই পরিচালিকা। তাঁহার এ কিরূপ কার্য্য ? অর্থ পাইবে নারী শিক্ষা সমিতি ও অভিনয় করিয়াছে ব্রাহ্মবালিকা স্কুলের ছাত্রীগণ,—যেহেতু উভয়েরই সেক্রেটারী শ্রীমতী —— বসু। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে, কেবল মহিলাগণের জন্য অভিনয় হইবে কিন্তু দেখা গেল, পুরুষগণও সে অভিনয় দেখিতেছে। ভদ্র ঘরের যুবতীর অভিনয় দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জনের ঘৃণ্য উপায়ের লোভ ইঁহারাও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মবালিকা স্কুলের শিক্ষা-কার্য্য দুই দিন বন্ধ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া নারীশিক্ষা সমিতি দুই পয়সা উপার্জ্জন করিলেন কিন্তু ইহার বিষময় ফল কি তাহা তাঁহারা কি ভাবিতেছেন ? যুবতীগণকে এরূপ লঘুচিত্ত করাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত অনিষ্ট করিতে-ছেন। আমরা জানি, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি নীরবে ছাত্রীদের এই অভিনয়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সমর্থন করিবেন ?

আপনার মান আপনি রাখ

সেদিন কন্‌ভোকেশনে যুবকগণ যে গ্রাজুয়েট মহিলাগণকে অশ্লীল ও অশ্রাব্য গালি দিয়াছে, তাহার কারণ কি এই নহে যে, আজকাল অনেক ভদ্রঘরের যুবতীগণ জনসাধারণের নিকট পয়সা পাইলেই নাচিতে

রাজী হয়, ভদ্রঘরের যুবতীগণ আর সে সম্ভ্রম, সে ভদ্র ব্যবহার ও সেই মর্য্যাদা জনসাধারণের নিকট হইতে পাইবে কিরূপে ?

বাঙ্গালী,—জাগ্রত হও

পূর্ব্বে দান করা একটা পুণ্য কার্য্য ছিল। এই দানকে বিলাসী সমাজ পণ্যরূপে নৃত্যের পরিবর্ত্তে, 'রসের আসর' দ্বারা, 'লীলায়িত দেহের' 'অনুভূতির' দ্বারা উপার্জ্জন করিতে চাহেন। দান আর দান নাই,—ইহা পণ্য। মানবের উচ্চ মনোবৃত্তিকে নীচ পথ অবলম্বন করান হইতেছে। দুর্নীতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইতেছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতীগণ অপরকে স্বামী সম্বোধন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালী! তোমার প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজ যে সকল বিলাসীরা নষ্ট করিতেছে তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হও। ছিদ্র রাখিও না, বাঙ্গলা দেশ কি প্রাচীন রোমের বিলাস-শালা হইবে? বাঙ্গালী! যদি স্বরাজ চাও, তবে এই বিলাস বিভ্রমে পদাঘাত কর। দেশের শত্রু ইংরাজ নহে,—ইঁহারাই।

—সঞ্জীবনী—

সংঘ-বার্ত্তা

পার্শীবাগান—শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতির উদ্যোগে আল্‌বার্ট-হলে রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসুর সভাপতিত্বে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-স্মরণে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বামী বাসুদেবানন্দ,

স্বামী নির্ব্বেদানন্দ ও স্বামী অশোকানন্দ বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীভগবানের জীবনালোচনা করিয়াছিলেন।

* * *

রাজসাহীবাসীর আহ্বানে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও স্বামী ওঙ্কারানন্দ তথায় গমন করিয়া স্থানীয় ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

* * *

দিল্লী নগরীতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয় বহু শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে স্বামী শর্ব্বানন্দ, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেব-জীবন সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় বহু বিদুষী ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

অনারেবল্ জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হাওড়া—জয়গোপাল ইনস্‌টিটিউটের ছাত্র ও ছাত্রীদের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ-সভায় স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

* * *

বেদান্ত-সমিতি (কলিকাতা), চেত্‌লা (দক্ষিণ-কলিকাতা), তমলুক, কাঁথি, বাঁকুড়া, বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিং, চট্টগ্রাম, দেওঘর, নাগপুর, পাটনা, রাঁচি, পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ, কনখল্, বম্বে, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গলোর, ট্রিভেণ্ড্রাম, সিলোন, রেঙ্গুন, কোয়ালালামপুর (এফ, এম, এস) প্রভৃতি স্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

* * *

আগামী ৯ই বৈশাখ রবিবার ১৩৩৫ ইংরাজী ২২ এপ্রিল ১৯২৮, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তত্রস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান হইবে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর

সন্তান ও ভক্তগণ এই পুণ্যাবির্ভাব স্থানে উপস্থিত হইয়া মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক দেবীর দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

আবেদন

(১)

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মভূমি জয়রামবাটী এবং তত্রত্য অঞ্চল রোগ এবং অজ্ঞতার লীলাভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকগণের চেষ্টায় বহুদিন হইল এস্থানে একটি দাতব্য ঔষধালয় এবং একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এযাবৎ এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় ধীরভাবে স্থানীয় লোকদিগের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যথাবশ্যক অর্থাদির অভাবে উহাদের উন্নতি বিধান হইতেছে না। স্থান, গৃহ ও সরঞ্জমাদির অভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এবং চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাবিধান বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থান বাসোপযোগী করিতেও বহু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনগণের যথাসম্ভব সাহায্যদানে বিরত না হন। যিনি যেভাবে যতটুকু সাহায্য করেন তাহাই নিম্নঠিকানায় বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

পোঃ দেশড়া, 'মাতৃমন্দির', জয়রামবাটী, (বাঁকুড়া)

(২)

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বর্গীয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের নিকট 'লক্ষ্মী দিদি' নামে সুপরিচিতা। মহাপ্রয়াণের দুই বৎসর আগে পুরীধামে বাস করিবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্বর্গদ্বারস্থ 'লক্ষ্মীনিকেতনে' প্রায় দুই বৎসরকাল পরম শান্তিতে বাস করিয়া গত ১২ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩২ সাল, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে ঐ স্থানেই অমরধামে যাত্রা করেন। তাই আমরা উক্তস্থানে তাঁহার স্মৃতি-মন্দির আরম্ভ করিয়া এই কার্য্যে ভক্তবৃন্দের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী পাল, লক্ষ্মী-নিকেতন, স্বর্গদ্বার, পুরী—এই ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শিষ্যবৃন্দ

সমালোচনা

বাঙ্গালীর খাদ্য—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন প্রণীত। ১১।১নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "আরোগ্য নিকেতন" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড্, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র।

খাদ্যসমস্যা আজ বাঙ্গালীর জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এবংবিধ পুস্তকাদি যে, গৃহস্থ দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবন-যাপনে অনেকটা সাহায্য করিবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এই পুস্তকখানির প্রচার কামনা করি। পুস্তকের কাগজ ও মুদ্রণ প্রশংসনীয়।

কথাপ্রসঙ্গে

ভায়া শুনচি, 'উদ্বোধন' পাঠকদের ভেতর দু একজন আপত্তি করেচেন যে, ধর্ম্মের কাগজে ওরকম দো-আঁশলা ভাষা না চালিয়ে সংস্কৃত-পর গম্ভীরাত্মক ভাষার ব্যবহার করাই ভাল। কিন্তু ভায়া! যিনি এ কাগজের প্রতিষ্ঠাতা যাঁর অন্ন খেয়ে মানুষ তাঁর প্রতি নিমক্‌হারামী করি কি করে! ব্যাসদেব ঠিকই বলেছেন, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"— সত্যের ধারণা করতে গেলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে হয়। তোমরা স্বামিজীকে যুগাবতার বলে ঘোষণা করচ, কিন্তু তিনি কি চাইতেন তার সন্ধান তোমরা আদৌ রাখ না। তোমরা যখন তাঁর বই পড় তখন খুব liberal, কিন্তু খানিক পরেই সেই সেকেলে কুসংস্কারগুলো পানার মত এসে তোমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি সব ঢেকে ফেলে। সেইজন্যে ভাষা সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত, ফের তোমাদের শুনাচ্চি,—

"আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার

বেলা ওএকটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ওসকল তত্ত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ওভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

"যদি বল ওকথা বেশ; তবে বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্‌কাতার ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম যে দিক হতেই আসুক না, একবার কল্‌কাতার হাওয়া খেলেই দেখ্‌ছি, সেই ভাষাই লোকে কয় তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখ্‌তে হবে। যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে তত পূর্ব্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত ঐ কল্‌কাতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, কল্‌কাতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাংলা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কাতার ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে

হবে। ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কৃতর দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংসা ভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য্য শঙ্করের মহা-ভাষ্য দেখ; আর অর্ব্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।—এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তা শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে 'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!!—ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎ-সন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয় সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা পাতা চিত্র বিচিত্রর কি ধূম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে —তার কি কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধূম! সে কি আঁকা বাঁকা ডামা ডোল্—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ্। তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত—কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন বল আসবে, তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ীঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্ মগ্ করবে।"

অবিশ্যি আমরা এ কথা বলচি না যে, বাংলা ভাষা সবই স্বামিজীর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", "পরিব্রাজক" বা "পত্রাবলী"র নকল হবে। আমরা বলতে চাই, বাংলা ভাষা সংস্কৃতর নিকট নানা বিষয়ে ঋণী হলেও, তিনি এমন ঋণ যেন না করেন যার শৃঙ্খল ভারে একেবারে অচল হয়ে যান! নতুন সম্প্রদায়ের অদম্য তেজে প্রাচীনের আবর্জ্জনা ভেসে যায় বটে, কিন্তু এ দিকেও সাবধান থাকতে হবে যাতে প্রাচীনকালের মণিমুক্তাও যেন ভেসে না যায়। স্বামিজী যেমন একদিকে ভাষার আমূল সংস্কারক ছিলেন আর একদিকে তিনি বিশেষ রক্ষণশীলও ছিলেন। ভাষাকে সংক্ষেপ করবার জন্য, সূত্র-সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য তিনি লিখে গেলেন "হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" "বর্ত্তমান সমস্যা" ও "জ্ঞানার্জ্জন।" বাংলা ভাষায় এই রকমের সূত্র সাহিত্য বোধ হয় এই প্রথম। এখানে তাঁর ভাষা সংস্কৃতপর। আবার যেখানে জোরের দরকার তখনই "ভাববার কথা"য় লিখে দেখালেন "আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ বেরঙ্গ সহর-পসন্দ ঢঙ্গ," "কাফ্ গাফের" "লস্করী জবানের"ও দরকার। যেমন করে হোক ভাবটা ঢোকাতে হবে। ভাবই যদি না ফুটলো ত ভাষার জাতিভেদ মেনে কি হবে? ভাষার উদারতা না মানলে ছুঁৎমার্গী ব্রাহ্মণদের মত ভাষাও একঘরে হয়ে থাকবে। তার ফল dead-nation এর মত dead-languageও হয়ে পড়ে।

অবতার যখন আসেন তখন ভাষা, ভাব, শিল্প, সমাজ সব তাঁর ভাবের অনুযায়ী হয়—যেমন বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য। এক একটা নগণ্য ভাষা পালি, আরবী, বাংলা এক একটা মস্ত ভাষা হয়ে পড়ল। য়াহুদীরা যীশুর ভাব নিলে না, তাদের ভাষা ও জাত নষ্ট হয়ে গেল। যারা নিলে তারা এখন এক একটা মস্ত জাত। এবারও অবতার এসেছেন, তাঁর ভাষা ছিল সরল গ্রাম্য, কিন্তু ভয়ানক তেজী, আবার তাঁর St. Paul এর ভাষারও কতকগুলো নমুনো দেখাচ্চি—

"পর্দ্দা উঠ্ছে—উঠ্ছে ধীরে ধীরে, slow but sure. কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—'মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।' * * দাদা,

Leader কি বনাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। * * লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ হাজারো লোকের মন যোগান। Jealousy—selfishness আদপে থাকবে না—তবে Leader। সব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি জাল ফেলেছেন, ঠিক জাল গুটাচ্ছেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ। প্রীতিঃ পরমসাধনম্ * * Love conquers in the long run, বিরক্ হলে চলবে না—wait wait সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। * * কোন form যেন necessary না হয়—unity in variety—সার্ব্বজনীন ভাবের যেন কোন মতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed if necessary for that one sentiment, universality * * সার্ব্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others. ঐ দহে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি—গোঁড়ামি ছাড়া। * * সকলের ইচ্ছা যে Leader হয়, কিন্তু সে যে জন্মায়। * * আমরা সকলকেই চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil. * * সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোনও ভেদ থাকিবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। * * ৫।৭ টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কাজ আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated গতিতে বাড়তে চলল—এ হুজুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তোমরা দলাদলি Jealousy পরিত্যাগ কর। Shameful—আমরা Universal religion করছি দলাদলি করে।

"সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বল্লেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে ওঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ল্যাটা চুকে যায়। * * ঐ Jealousy, ঐ absence of conjoined action গোলামের জাতের nature। * * ঐ terrible jealousy characteristic আমাদের

—বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus. * * কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—whiteদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক ঐ রকম। কীটগুলো—এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই, মাগের আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে! হরে! At any cost, any price, any sacrifice ঐটি আমাদের ভিতর না ঢোকে আমরা দশজন হই, দুজন হই do not care—কুছ পারোয়া নেই—perfect characters হওয়া চাই। * * 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব রঘুবীর রাখে টেক্'। * * 'রঘুকুলরীতি সদা চলি আ-ই। প্রাণ যা-ই বরু-বচন ন যা-ই'।"

কোনও জীবন্ত ভাষা একদিনে সৃষ্ট হয়নি। তার প্রবাহ চল্‌তে থাকে এবং নতুন নতুন শব্দরাশি এসে তাকে পুষ্ট করে। ৮০০খৃঃ পর্য্যন্ত বাংলা প্রাকৃত বলে পরিচিত ছিল। তার পর ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাকৃত যুগ নষ্ট হয়ে গৌড়ীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় ও হিন্দুর পুনরুত্থানে সংস্কৃতর ভাব ও ভাষা বাংলায় এত বেশী প্রবল হল যে তাকে আর প্রাকৃত বলে চেনবারই উপায় রইল না। তেমনি মুসলমান প্রভাবও বাংলায় যথেষ্ট এবং একই নিয়মে ইংরেজীও যথেষ্ট ঢুকচে ও ঢুকবে। যেমন স্মৃতিগুলো হচ্চে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লক্ষণ তেমনি ব্যাকরণগুলোও ভাষার বিভিন্ন স্তরের লক্ষণ। যেমন মাহেশ ব্যাকরণ লুপ্ত হলে পাণিনি, বররুচি, পুরন্দর, যাস্ক এলেন। আবার তাঁদের প্রভাব কমতে লাগল,—উঠলেন রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গল্যায়ণ, শিলাবংশ। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। পূর্ব্বে যা দোষ ছিল, উত্তরে তা ব্যাকরণসিদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। জীবন্ত ভাষা চিরকালই ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করে চলে এসেচে। পাণিনিকে অগ্রাহ্য

করেও "মহাবংশ" ও "ললিতবিস্তর" শুদ্ধ বলে পরিচিত। "মৃচ্ছকটিকা"য় বিজ্জুলী (বিদ্যুৎ), বাড়ী (বাটী), ঘিঅ (ঘৃতম)—"শকুন্তলা"য় বক্কল (বল্কলম্)—"মুদ্রারাক্ষসে" বহুর (বধ্ঃ) প্রয়োগ চল দেখতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতজীদের অনুনয় করে আমরাও বলি, তেমনি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত-ভিন্ন ভাষা দেখে যেন চমকে না যান। এখন কি আর "কহসি আমারে" "নির্ভএ বোলেন্ত" "দর্শনেতে যান্তি" "পিবন্তি রুধির" প্রভৃতি শূন্য পুরাণের সংস্কৃত-ক্রিয়াপর ভাষা চলে? না বিলিতী কমা, সেমিকোলেন আমরা উঠিয়ে দেব?—সেইজন্য বলি, নজরুলী, পরশু-রামী বা শনি-মণ্ডলী ভাষা—এও বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের একটা দিক।

তবে একথাও আমরা বলি না যে, বঙ্কিমী বা রবীন্দ্রি ভাষা একেবারে উঠে যাবে। জীবন্ত সাহিত্যের নানা দিক থাকবেই থাকবে। কারণ, যার প্রাণ আছে সে স্বাধীন, ইঞ্জিনের মত পাতা লাইনে সে যেতে পারে না। তাই দেখতে পাই স্বামিজীর ভাষা criticএর ভাষা, বঙ্কিমবাবুর ভাষা oratorএর ভাষা, আর রবিবাবুর ভাষা politicianএর ভাষা। স্বামিজীর ভাষা একটা দুর্দ্দান্ত বিশ বাইশ বছরের ছেলের, রবিবাবুর পাকা গেরস্তর, আর বঙ্কিমের ভাষায় বার্দ্ধক্য ঘনিয়ে এসেছে বলে খুব সংযমিত। স্বামিজী কথা বলেন বালকের মত উচ্চ কণ্ঠে, বঙ্কিমবাবু গম্ভীর ভাবে, আর রবিবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে,—কি জানি যদি ধরা পড়ি—লেখা পড়বার সময় বোধ হয়, যেন লেখক পাঠকদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখচেন এর মনের ভাবটা কি? আর স্বমিজীর লেখা পড়লে বোধ হয় উদ্ধত বালকের মত বলচেন,—তুমি যাই মনে কর আমি এই সত্যি কথা বললুম, তাতে তুমি চট তো বয়ে গেল। বঙ্কিমবাবু যেখানে উপদেশ দিচ্চেন যেন ঠিক গুরুঠাকুর।

সবই দরকার। ইংরেজ কবি Chaucerএর ভাব ও ভাষা Spencer ছোঁননি। Canterbury Tales or Fairy Queenএর সৌন্দর্য্য Paradise Lostএ দেখা যায় না। Webster, Ford, Jhonson, Chatterton, Scott, Shelley কেউ কারও ধার ধারেন না—ঠিক আমাদের দেশেও তাই, কারণ প্রাণ এখন সেখানে খেলে বেড়াচ্চে।

যীশুখৃষ্ট

(ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি দর্শনে)

তুমি শুধু চিত্র নহ, কল্পনার চারুশিল্পরেখা
অপূর্ব্ব সুন্দর,
বর্ণের বৈচিত্র্যে শুধু উচ্ছ্বসিয়া তোল নাই তুমি
আমার অন্তর।
তুমি যে জীবন্ত মূর্ত্তি, করুণার অনন্ত ধারায়
প্লাবিয়া জগৎ;
মানব জাতিরে তুমি দেখাইয়া ছিলে একদিন
মহত্তর পথ।
সে পথ মৃত্যুর নহে,—নহে, নহে মুক্তির বিলাস
স্বর্গের কামনা,
মায়াবী যোগীর সম নহে মিথ্যা বিভূতির লাগি
ভৌতিক সাধনা।
মানবের দুঃখ লাগি এ যে মহা-মানব-আত্মার
গভীর ক্রন্দন,
পাপীর মুক্তির তরে পুণ্যবান প্রেমিকের এযে
আত্মবিসর্জ্জন।
পশ্চিম সমুদ্র তীরে প্রভাতের অমৃত আলোকে
তোমার আহ্বান্,
জাগ্রত সাবিত্রী মন্ত্রে চমকিয়া তুলিল প্রথমে
মানবের প্রাণ।
যেদিন জন্মিলে জেরু জেলামের অজ্ঞাত পল্লীতে
হে মহান্ যীশু!

প্রভাতী তারার সম অন্ধকার রজনীর শেষে
স্বপ্নজাত শিশু ;—
সেদিন মেরীরে ঘিরি মেরু জ্যোতি সম অকস্মাৎ
দেবদূতগণ,
উদ্ভাসি গগনপথ ভবিষ্যৎ মানব-নায়কে
করিল বন্দন।
কাঁপিল পাপীর আত্মা অত্যাচারী ক্রূর সম্রাটের
জীর্ণ সিংহাসন,
মুহূর্ত্তে পড়িল খসি শির হতে কিরীটমণির
শোণিত-কাঞ্চন।
এ যেন দ্বাপর যুগে দেবকীর গর্ভজাত শিশু
কংস-কারাগারে,—
আপনারে বিকশিয়া, ধ্বংস করি গেল ভগবান্
রাজ-অত্যাচারে।
লাঞ্ছনা পীড়ন আর পশুত্বের প্রতিহিংসা যদি
হতো চিরন্তন,
কেমনে দুর্ব্বল নর মহত্তর জীবনেরে তবে,
করিত বরণ ?
তাই আস যুগে যুগে অগ্নি-গিরি উচ্ছ্বাসের মত
সঞ্চারি প্রলয়,
বিদীর্ণ বক্ষের তলে ধরণীর লাঞ্ছনা বহিয়া
ওগো দয়াময়!
ছড়াইয়া যাও তুমি দিশে দিশে রাগ দ্বেষহীন
করুণার বাণী,
স্নেহকর স্পর্শে তুমি মুছাইয়া দাও সন্তানের
বেদনার গ্লানি।
তাই তো যেদিন তুমি দুষ্ট বুদ্ধি হিংস্র মানুষের
আক্রোশের ফলে,

হে মহান্ যীশুখৃষ্ট, ধর্ম্মহীন নিষ্ঠুর আদেশে
ক্রুশে বিদ্ধ হলে,
সেদিন দাওনি তুমি তপ্ত রক্ত-প্রবাহের মুখে
ক্রুদ্ধ অভিশাপ,
হস্তে পদে বিদ্ধ হয়ে সহ্য তুমি করিলে প্রেমিক
মানবের পাপ।
হত্যা কি লভিল জয়, ক্রুশে বিদ্ধ হলো কি সেদিন
সত্যের সাধনা ?
মানব আত্মার সেই দুর্গতির চরম দুর্দ্দিনে
কল্যাণ কামনা ?
ব্যর্থ কি হইল ঋষি ! সত্যাগ্রহী হে বীর সাধক !
নহে, নহে, আজ।
সেই আত্মবলিদান লভিয়াছে গভীর চেতনা
মানবের মাঝ।
লক্ষ লক্ষ নরনারী এ সন্তপ্ত দগ্ধ ধরা হতে
লভিতে সান্ত্বনা ;
ছুটেছিল তব পথে. তব ধর্ম্ম-ছত্র-ছায়া-তলে
ভুলিতে যন্ত্রণা।
শত কবি শত মুখে, শত শিল্পী সহস্র তুলিতে
তব জয় গাথা,
রচনা করিয়া গেল, সম্রাটের ঘোষণার মত
তোমার বারতা।
কে তুমি এমন করি মাতাইয়া গেলে এ জগৎ
প্রেমের প্লাবনে,
তুমিও তো এসেছিলে নরদেহে মোদের মতন
ধরণী প্রাঙ্গণে।
আমরা খেলিয়া গেনু মুঠি মুঠি ধূলি লয়ে শুধু
ক্ষুদ্র করতলে,

তীরেতে বসিয়া হায়, গণিলাম কত ঢেউ উঠে
সমুদ্রের জলে।
ভাব-জগতের শিশু, উন্নততর প্রেরণার লাগি
জীবন ভরিয়া—
বিশ্বের রহস্যতলে ডুবি তুমি আনিলে যে ধন
গোপনে হরিয়া ;—
তাই তুমি দিয়ে গেলে পরিপক্ক ফলের মতন
ধরণীর তলে,
এক হতে বহু হলো, পরিব্যাপ্ত হলো সে জীবন
লক্ষ লক্ষ দলে।
মোরা শুধু মাতিলাম জনতার মত্ত কোলাহলে
উন্মত্তের মত,
সহস্র লোকের সাথে করতালি দিয়ে মরি শুধু
না বুঝিয়া ব্রত।
দিন যায়, রাত্রি যায়, সূর্য্য চন্দ্র করে ওঠা নামা
ডুবে তারাদল,
পাষাণ মূর্ত্তির মত জড়তার বোঝা লয়ে মোরা
রহি যে নিশ্চল।
এমনি মূর্খের মত হারাব কি দুর্লভ জীবন
ঔদাস্য হেলায় ?
শুষ্ক শম্বুকের মত রহিব কি ধূলি শয্যাতলে
সমুদ্র বেলায় ?
বৈশাখী ঝড়ের মত এস, এস, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
উর্দ্ধে লহ তুলি,
জীবনের কাণ্ড হতে ভগ্ন করি দিয়ে যাও আজ
জীর্ণ শাখাগুলি।
নিভৃত অরণ্য মাঝে পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায়
সাধনার ফলে ;—

যেই মন্ত্র লভেছিলে, দাও সেই সঞ্জিবনী সুধা
মানবের দলে।
এই ক্ষুদ্র গৃহ ত্যজি বৃহত্তের সাধনায় মোরা
যাই বাহিরিয়া,
অনন্ত সমুদ্রতলে লক্ষ লক্ষ তটিনীর মত
যাই প্রবাহিয়া।
ওই তব স্নিগ্ধ আঁখি উর্দ্ধতর জগতের পানে
রহিয়াছে চাহি,
বলিছে ডাকিয়া যেন, 'ওরে আর্ত্ত ব্যথিত মানব
আর ভয় নাহি।
এই মৃত্যু কুণ্ড হতে আত্মার অমৃতলোকে তুমি
পাবে পরিত্রাণ,
প্রেমের করুণামন্ত্রে পশুত্বের গ্লানিভার তব
হবে অবসান।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(৯)

ইংরাজীর অনুবাদ

মার্চ্চ—১৮৯৬

প্রিয় অ—

* * * কাজ করে যাও। যতদূর সাধ্য আমি তোমাদের সাহায্য কোরবো। * * * যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তবে এখানকার আর

ইংলণ্ডের লোকেরা লাল কাপড়ের সঙ্গে খুব পরিচিত হয়ে পড়বে। বৎসগণ! কাজ—কেবল কাজ।

মনে রেখো—যতদিন তোমাদের গুরুর ওপর শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন কেউ তোমাদের বাধা দিতে পারবে না। ভাষ্য তিনটির অনুবাদ পড়ে পাশ্চাত্যবাসীরা অবাক হয়ে যাবে।

ধৈর্য্য ধর, বৎস! ধৈর্য্য ধর, আর কাজ কর। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য * * * ঠিক সময়ে জনমগুলীর ওপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো * * *

তোমাদের—

বিবেকানন্দ

(১০)

ইংরাজীর অনুবাদ

নিউইয়র্ক

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬

[ডাঃ ন—কে লিখিত]

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলুম। কাল আমি ইংলণ্ডে রওনা হচ্চি, তাই আমার অন্তরের কথা, আপনাকে দুচার লাইনে লিখে জানাব। আপনি যে, ছেলেদের জন্যে একখানি কাগজ বের কোরতে চেয়েছেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং তার জন্যে আমি যথাসাধ্য সাহায্যও কোরবো। বি—(B,) এর মত কাগজ-টাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করবেন, কেবল ভাষা ও প্রবন্ধ-গুলো যাতে আরও সহজ বোধ্য হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্যে যে সমস্ত অদ্ভুত গল্প ছড়ান আছে তা সহজ বোধ্য ভাষায় আবার লেখা দরকার, এই তো একটা মস্ত কাজ পড়ে রয়েচে, আপনারা বোধ হয়, এ বিষয়টা স্বপ্নেও ভাবেন নি। আপনাদের কাগজে এই জিনিষটাই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় হবে।

সময় পেলে আমি গল্প লিখবো—যত বেশী পারি। কাগজটাকে

খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তার জন্যে বি—(B) রয়েচে; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই ভাবে যদি কাগজটাকে চালাতে পারেন, তবে ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে এ ছড়িয়ে পড়বে। যতদূর সম্ভব সহজ ভাষা ব্যবহার কোরবেন, তা হলেই আপনারা সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান কাজ। কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ত্ববহুল কখনই কোরবেন না * * * ভারতে একটা জিনিসের বড় অভাব—একতা বা সংহতি-শক্তি, তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্চে—আজ্ঞানুবর্ত্তিতা।

বীরের মত কাজ করে যান। একদিনে বা একবছরে সফলতার আশা কোরবেন না। সর্ব্বদা খুব উচ্চ দিকে লক্ষ্য রাখুন। দৃঢ় হন। হিংসা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করুন। নেতার আদেশ মেনে চলুন এবং সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানব-জাতির প্রতি একান্ত অকপট হন, তা হলেই আপনি জগৎ কাঁপিয়ে তুলবেন। মনে রাখবেন—ব্যক্তিগত "চরিত্র" এবং "জীবন"ই শক্তির উৎস আর কিছুই নহে। এই চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই বিরক্তি ও হিংসার ভাব মনে উঠবে তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন। হিংসাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের কারণ। এই হতেই আমাদের জাতির মৃত্যু; সুতরাং এই নীচতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক।

আপনাদের—

বিবেকানন্দ

বৈদিক ভারত

(ঋগ্বেদীয় যুগ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮। চতুঃসমুদ্রাঃ

ঋগ্বেদে "চতুঃসমুদ্রাঃ" অর্থাৎ চারিটি সমুদ্রের উল্লেখ দেখা যায় (৯।৩৩।৬ ; ১০।৪৭।২)। সপ্তসিন্ধুদেশের তিন দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে যখন তিনটি সমুদ্র ছিল, তখন চতুর্থ সমুদ্রটি যে আর্য্যগণের অধ্যুষিত দেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গন্ধার ও বহ্লীকদেশও প্রাচীন আর্য্যভূমির অন্তর্গত ছিল। বহ্লীকের উত্তর দিকে ও তুর্কী-স্থানের পশ্চিম দিকে প্রাচীনকালে যে প্রকাণ্ড ভূমধ্যসাগর বিদ্যমান ছিল, তাহাই ঋগ্বেদের চতুর্থ সমুদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে যে কাশ্যপ সাগর (Caspian Sea), আরল্ সাগর (Sea of Aral) বল্কাশ হ্রদ (Lake Balkash) ও কৃষ্ণসমুদ্র (Black Sea) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে, পূর্ব্বকালে সেগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া একটি প্রকাণ্ড ভূমধ্যসাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে ভয়ানক ভূকম্পদ্বারা কৃষ্ণসাগরের সহিত ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের সংযোগ সাধিত হইলে, মধ্য এসিয়ার ভূমধ্যসাগরের জলরাশি নিম্নগ হইয়া ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের জলরাশির সহিত মিলিত হইয়া যায়। সেই সময়ে মধ্য-এশিয়া-স্থিত সাগরের অগভীর অংশসমূহ শুষ্ক ভূমিতে এবং গভীর অংশসমূহ পৃথক্ পৃথক্ হ্রদে

পরিণত হয়। এইরূপে বর্ত্তমান কাশ্যপ সাগর, আরল্ সাগর, বলকাশ হ্রদ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। * আর্য্য-অধ্যুষিত দেশের উত্তর ভাগে এই যে বিস্তীর্ণ সাগর অবস্থিত ছিল, ইহাই ঋগ্বেদোক্ত চতুর্থ সাগর। এই চারিটি সাগরেই আর্য্যবণিকগণ অর্ণবপোত যোগে বাণিজ্যের জন্য ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেন এবং আর্য্যভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়ে বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রভূত ধনরত্ন লইয়া আসিতেন। †

৯। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক "সমুদ্র" শব্দের অপব্যাখ্যা

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্, অধ্যাপক এ-বি, কীথ্ (Keith), অধ্যাপক হপ্‌কিন্স্, অধ্যাপক ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আর্য্যগণের আদি বাসভূমি ইয়োরোপে ছিল, এবং সেই স্থান হইতে আর্য্যজাতির দুইটি শাখা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া এসিয়া মহাদেশে উপনীত হয়; তন্মধ্যে একটি শাখা ইরান দেশে, এবং অন্য শাখাটি হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া গন্ধারে ও সপ্তসিন্ধুদেশে আসিয়া বাস করে। প্রথম শাখাটি ইরাণীয়গণের (আধুনিক পার্শিগণের) এবং দ্বিতীয় শাখাটি আধুনিক আর্য্য হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহারা আরও বলেন যে, ইয়োরোপবাসী আর্য্যজাতীয় কেল্ট্ (celts), লাতীন (Latins), টিউটন্ (Teutons) ও স্লাভ্‌গণের (slavs) বংশধরগণই বর্ত্তমান সময়ে যথাক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স্, বেল্‌জিয়ম্, ইতালী, গ্রীশ্, জর্ম্মেনী, সুইডেন্, নরওয়ে ও রুশিয়া প্রভৃতি দেশে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মতে, এই জাতিগণের এবং ইরাণীয় ও হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ইয়োরোপের একই প্রদেশে বাস করিতেন এবং একই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। আর তাঁহাদের সভ্যতাও একই প্রকারের ছিল। পরে কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেশে বাস করিলে, তাঁহাদের ভাষারও বিলক্ষণ তারতম্য

* *Encyclopædia Britannica* Vol. V. pp. 178—181; also Vol. XVIII p. 634 (Ninth Edition).

† চতুঃসমুদ্র-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

ঘটে। তথাপি কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য সাধারণ শব্দ (যেমন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বসা, শ্বশুর, বিধবা, দ্যু, সূর্য্য, গো, উলূক, মূষিক,—ইত্যাদি) অনেক আর্য্য ভাষার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আর্য্য ভাষা সমূহের সাধারণ শব্দ মধ্যে তাঁহারা "সমুদ্র" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পান না। এই কারণে, তাঁহারা অনুমান করেন যে উক্ত আর্য্যজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ইয়োরোপের মধ্যস্থলে বাস করিতেন, আর সেই স্থান হইতে সমুদ্র বহুদূরবর্ত্তী থাকায় সমুদ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহের মধ্যে "সমুদ্র" শব্দের বহুল উল্লেখ দেখিয়া ইহাঁরা অবধারণ করিয়াছেন যে এই "সমুদ্র" শব্দের প্রকৃত অর্থ "সাগর" (sea) নহে, পরন্তু বৃহৎ নদ বা নদী, যেমন সিন্ধুনদী—যাহার একপার হইতে অপর পার দেখা যায় না। * তাঁহাদের আরও ধারণা এই যে, হিন্দু আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা আততায়িরূপে বহ্লীক, গন্ধার ও সপ্ত-সিন্ধুদেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ দেশবাসী অনার্য্যগণের সহিত বহু শত বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া আরব-সমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সিন্ধুনদীর প্রকাণ্ড বিস্তার দেখিয়া তাহাকেই "সমুদ্র" বলিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সাগর-সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা পরিচয় ছিল না। † পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতগণের এইরূপ

* "The world which later is the regular name for 'Ocean' (Sam-udra) seems, therefore, in agreement with the etymological sense ('collection of waters') to mean in the Rigveda only the lower course of the Indus, which, after receiving the waters of the Punjab, is so wide that a boat in midstream is invisible from the bank."

(Macdonald's Hist. of Sansk. Lit. p. 14.)

† "The southward migration of the Aryan invaders does not appear to have extended at the time when the hymns of the Rigveda were composed, much

মত পাঠ করিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। আর্য্যজাতির আদি বাসভূমি ইয়োরোপে ছিল, এই মতের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগকে এত ব্যগ্র দেখা যায় যে, তাঁহারা বৈদিক মন্ত্র ও শব্দ সমূহের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আপনাদিগকে কেবল হাস্যাস্পদই করিয়াছেন। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে "সমুদ্র" শব্দের অর্থে যদি "সাগর" বলা যায়, তাহা হইলে "পূর্ব্ব সমুদ্র" বলিতে বঙ্গোপসাগরকে এবং "পশ্চিম সমুদ্র" বলিতে আরব-সাগরকে নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু বঙ্গোপ-সাগরের সহিত আর্য্যেরা পরিচিত থাকিলে, এই উপসাগর এবং পঞ্জাব দেশের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চাল, কোশল, মৎস্য, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে এই সমস্ত দেশের একেবারে কোনও উল্লেখ নাই, এবং সুবৃহৎ গঙ্গা ও যমুনা নদীরও একাধিকবার উল্লেখ নাই। আর "সমুদ্রে"র অর্থ "সাগর", ইহা স্বীকার করিলে, সরস্বতী ও শতদ্রু এই নদীদ্বয়ের সমুদ্রে নিপতিত হওয়ার ব্যাখ্যায় বলিতে হয় যে, আধুনিক

---

beyond the point where the united waters of the Punjab flow into the Indus. The ocean was probably known only from hearsay, for no mention is made of the numerous mouths of the Indus, and fishing, one of the main occupations on the banks of the Lower Indus at the present day is quite ignored," (*Ibid* p. 143—144).

"Some scholars believe that this people had already heard of the two oceans (i.e. the Bay of Bengal and the Arabian sea). This point again is doubtful in the extreme. No descriptions imply a knowledge of ocean, and the word for ocean means merely a 'confluence of waters', or in general, a great oceanic body of water, like the air. As the Indus is too wide to be seen across, the name may apply in most cases to this river." (E. W. Hopkin's *The Religions of India* p. 34).

Weber এবং Keith সাহেবেরও এইরূপ মত।

রাজপুতানা দেশের উপর ঋগ্বেদীয় যুগে সমুদ্র ছিল। রাজপুতানার উপর কোনও অতীত যুগে সমুদ্র থাকিলেও খৃঃ পূঃ ১৫০০ বা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সে দেশে সমুদ্র ছিল না, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাহা হইলে, উক্ত সময়ে সপ্তসিন্ধুদেশে আর্য্যাভিযানের কথা না বলিয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাভিযান হইয়াছিল, এবং সপ্তসিন্ধুবাসিগণ যে অতীব প্রাচীন জাতি, এবং অতীব প্রাচীনকালেই যে তাঁহারা সুসভ্য জাতি ছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে, ভারতীয় আর্য্যগণ যে খৃষ্ট জন্মের ১৫০০ বা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপ হইতে ভারতে আততায়িরূপে আসিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে বলা যায়? এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিলেন যে, ঋগ্বেদে সমুদ্রের অর্থ সিন্ধু নদী, অথবা ঐরূপ কোনও বড় নদী! কিন্তু একদেশদর্শী হইয়া এই মত স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা যেন অন্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যার সহিত ঋগ্বেদোক্ত "সমুদ্র" শব্দের অর্থের অসঙ্গতির প্রতিও লক্ষ্য রাখিলেন না। এস্থলে আমি এইরূপ কতিপয় অসঙ্গতির উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ সমুদ্রের অর্থ যদি সিন্ধু নদীই হয়, এবং তাহাই যদি ঋগ্বেদোক্ত "পশ্চিম সমুদ্র" হয়, তাহা হইলে "পূর্ব্ব সমুদ্র" কোন্ নদী? সরস্বতী প্রাচীনকালে বৃহৎ নদী ছিলেন বটে, কিন্তু সিন্ধুনদীর মত তাঁহার পরিসর ছিল না। বিশেষতঃ এই সরস্বতী নিজেই "সমুদ্রে" নিপতিত হইতেন বলিয়া উক্তি আছে। সপ্তসিন্ধুদেশের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা বর্ত্তমান সময়ে বড় নদী বটে; কিন্তু বৈদিক আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে বড় নদী বলিয়া জানিতেন না। জানিলে, তাঁহারা সিন্ধু ও সরস্বতীর ন্যায় বহুস্থানে তাঁহাদেরও অবশ্যই স্তবস্তুতি করিতেন। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সিন্ধুনদীর অপর পারে গন্ধার, আরেকোশীয়া প্রভৃতি দেশেও আর্য্যনিবাস ছিল। তাহা হইলে সেই দেশবাসিগণের পক্ষে সিন্ধুনদী "পূর্ব্ব সমুদ্র" হয়। কিন্তু সিন্ধু "পূর্ব্ব সমুদ্র" হইলে, তাঁহারা কোন্ বড় নদীকে "পশ্চিম সমুদ্র" বলিতেন? তৎপরে সপ্তসিন্ধু দেশের দক্ষিণ দিকেই বা এমন কোন্ বড় নদী ছিল, যাহাকে সিন্ধুনদী

বা সমুদ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? এইরূপ বড় নদীর অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল না, এবং এখনও নাই। সুতরাং সরস্বতী ও শতদ্রুর সমুদ্রে নিপতিত হওয়ার অর্থ কি?

দ্বিতীয়তঃ "সিন্ধু" শব্দ দ্বারা কেবল যে, সিন্ধুনদীকেই বুঝাইত, তাহা নহে; পরন্তু ঋগ্বেদে নদী মাত্রেরই নাম "সিন্ধু"। যথা সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ সাতটি নদী। এই সিন্ধুসমূহই "সমুদ্রে" নিপতিত হইত, ঋগ্বেদে তাহার বহুল উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র এইরূপ :—

সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ (৮।৬।৪)

সায়ণাচার্য্য ইহার টীকায় বলিয়াছেন, "বিশো বিশন্ত্যো বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্টয়ঃ প্রজাঃ অস্য ইন্দ্রস্য মন্যবে ক্রোধায়। যদ্বা মন্যুর্ম্মননসাধনং স্তোত্রং তদর্থং সন্নমন্তঃ। সম্যক্ স্বত এব নমন্তি।...তত্র দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্রায়েব যথা সমুদ্রমন্ধিং প্রতিসিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা নদ্যঃ স্বয়মেব নমন্তে তদ্বৎ।"

অর্থাৎ সিন্ধু বা নদীগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, তদ্রূপ সমস্ত মানব প্রজাগণ ইন্দ্রের ক্রোধের ভয়ে, কিংবা ইঁহার প্রীতি-সাধনের জন্য স্তোত্র দ্বারা ইঁহাকে প্রণাম করে।

উদ্ধৃত মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, সিন্ধু বা নদীগণ সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে। সুতরাং সমুদ্র ও সিন্ধু যে স্বতন্ত্র বস্তু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অপর একটি মন্ত্র এইরূপ :—

যৎ সিন্ধৌ যদসিক্ন্যাং যৎ সমুদ্রেষু মরুতঃ সুবর্হিষঃ।
যৎ পর্ব্বতেষু ভেষজম্॥ (৮।২০।২৫)

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—

"হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুদ্গণ, সিন্ধুনদীতে, সমুদ্র সমূহে ও পর্ব্বতে যে ঔষধ আছে। (তোমরা সেই সকল ঔষধ জানিয়া আমাদের শরীরার্থ আনয়ন কর)।"

উদ্ধৃত ঋকে সিন্ধুনদী, অসিক্নী (আধুনিক চিনাব নদী) ও সমুদ্রের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদের ৩।৩৬।৭ মন্ত্রে নিম্নলিখিত বাক্যটি আছে :—

"সমুদ্রেণ সিন্ধবো যাদমানা।" এই বাক্যের টীকায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, "সমুদ্রেণ সংহতা নদ্যাদিরূপেণাপোঽভিদ্রবন্তোনমিতি সমুদ্রঃ তেন যাদমানা তেন সহ সঙ্গতিং যাদমানাঃ সিন্ধবো নদ্যঃ। অর্থাৎ নদীগণ সমুদ্রের সহিত সঙ্গতি বা মিলন প্রার্থনা করে।

উক্ত মণ্ডলের ও সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্‌ও এইরূপ :—

"প্রষৎ সিন্ধবঃ প্রসবং যথায়ন্নাপঃ সমুদ্রং রথ্যেব জগ্মুঃ।" ইহার সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের টীকা এইরূপ,—

"সিন্ধবো নদ্যঃ যথা প্রসবং প্রকর্ষেণ সূয়ত ইতি প্রসবঃ কামঃ তমনুসৃত্য যৎ যদা প্রায়ন্ প্রকৃষ্টমতিদূরং সমুদ্রং গচ্ছন্তি, তদা আপো মহান্তং সমুদ্রং রথ্যেব রথিন ইব জগ্মুঃ প্রীণনার্থং গচ্ছন্তি।"

অর্থাৎ নদীগণ যখন কাম অনুসরণ করিয়া দূরবর্ত্তী সমুদ্রে গমন করে, তখন জল রথীর ন্যায় গমন করে।

উদ্ধৃত মন্ত্র সমূহে সমুদ্র হইতে সিন্ধু (নদী) যে ভিন্ন বস্তু, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

ঋগ্বেদের ১।২৪।১০ মন্ত্রে অশ্বিদ্বয়কে "সিন্ধুমাতরঃ" বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অশ্বিদ্বয় পূর্ব্ব দিকে উদিত হইতেন; পূর্ব্ব দিকে সিন্ধুনদী বা সিন্ধুর ন্যায় কোনও বড় নদী ছিল না; সুতরাং "সিন্ধু" অর্থে এখানে সমুদ্রই বুঝা যাইতেছে।

ঋগ্বেদের ১।৫২।৪ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"সমুদ্রের আত্মীয়ভূত ও অভিমুখগামী নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে পূরণ করে, সেইরূপ কুশস্থিত সোমরস দিব্যলোকে ইন্দ্রকে পূরণ করে।" ইত্যাদি।

মূলমন্ত্রে আছে, "সমুদ্রং ন সুভ্বঃ স্বা অভিষ্টয়।" সায়ণাচার্য্য টীকায় বলিয়াছেন, "সুষ্ঠু ভবন্তীতি সুভ্বো নদ্যঃ সমুদ্রং পূরয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। কীদৃশ্যো নদ্যঃ স্বা সমুদ্রস্য স্বভূতাঃ।" ইত্যাদি

ঋগ্বেদের ২।১৩।২ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"পরস্পর-সম্মিলিতা উদকবাহিনী এই সকল নদী চারিদিকে প্রবাহিতা হইতেছেন, এবং সমস্ত জলের আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে ভোজন প্রদান করিতেছেন।"

মূলমন্ত্র এইরূপ,—

"সধ্রীমায়ন্তি পরি বিভ্রতীঃ পয়ো বিশ্বপ্স্ন্যায় প্রভরন্ত ভোজনম্।"

সায়ণাচার্য্য টীকায় বলিয়াছেন, "সধ্রীচীনাঃ পয়ঃ উদকং পরি পরিতো বিভ্রতোবিভ্রাণাঃ ঈং এতা নদ্যঃ আয়ন্তি সর্ব্বতো গচ্ছন্তি। তা নদ্যো বিশ্বপ্স্ন্যায় বিশ্বানামপামাশ্রয়ভূতায় সমুদ্রায় ভোজনং পয়ঃ প্রভরন্ত প্রবর্ষেণ সম্পাদয়ন্তি।"

ঋগ্বেদের ৫।৮৫।৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,---

"প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন দেব বরুণের সুমহতী প্রজ্ঞার কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। তাঁহার প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র বারিমোক্ষণকারী নদীসমূহ বারি দ্বারা একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করিতে পারে না।"

উক্ত ঋকের শেষাংশটি এইরূপ :—

"একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেনীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রম্।" সায়ণাচার্য্যের টীকায় লিখিত আছে,—"এনী এন্যঃ শুভ্রাঃ গমনশীলা বা আসিঞ্চন্তী উদকমাসিঞ্চয়ন্ত্যঃ অবনয়ো নদ্যঃ বহ্ব্যো নদ্যঃ সর্ব্বদোদকেন পূরয়ন্ত্যোঽপি নৈকমপি সমুদ্রং পূরয়ন্তীতি।"

উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নদীসকল "সমুদ্র" হইতে পৃথক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের জলরাশি সমুদ্রেই ঢালিয়া দিত; কিন্তু সমস্ত জল ঢালিয়া দিয়াও তাহারা যে সমুদ্রকে পূর্ণ করিতে পারিত না, ইহা বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছিল। সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত প্রমাণ থাকিতেও সমুদ্র সম্বন্ধে আর্য্যগণের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, এবং তাঁহারা বৃহৎ নদীকেই সমুদ্র বলিতেন, এইরূপ উক্তি যে নিতান্ত কষ্টকল্পনা-প্রসূত ও অযৌক্তিক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমুদ্র অর্থে "সাগর" বুঝিয়া "পূর্ব্ব সমুদ্র" "পশ্চিম সমুদ্র", "সরস্বতী ও শতদ্রুর সমুদ্রে নিপতন" "চারি সমুদ্র" ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, ঋগ্বেদের মন্ত্র-রচনার কালকে অতীব প্রাচীন যুগে লইয়া যাইতে হয়, এবং তদ্দ্বারা আর্য্যগণের ইয়োরোপে আদিনিবাস প্রমাণিত হয় না, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতগণ "সমুদ্র" শব্দের মনঃকল্পিত ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা করিয়া

থাকিবেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই।

তৃতীয়তঃ সমুদ্রের পরিসর ও গভীরতা যে বৃহৎ নদীর পরিসর ও গভীরতা অপেক্ষাও অধিকতর ছিল, এবং ঋগ্বেদে যে এইরূপ পরিসর ও গভীরতার উল্লেখ আছে, তৎপ্রতিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেন নাই। ঋগ্বেদের কোনও কোনও স্থলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ আকাশকেও সমুদ্র বলা হইয়াছে। ভূতলস্থ সমুদ্র যেরূপ জলপূর্ণ, আকাশের সমুদ্রও সেইরূপ জলপূর্ণ। ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রে দিব্য সমুদ্রকে "উত্তর সমুদ্র" (অর্থাৎ অন্তরিক্ষাখ্য সমুদ্র) এবং পার্থিব সমুদ্রকে "অধর সমুদ্র" বা ভূতলস্থ সমুদ্র বলা হইয়াছে। (১০।৯৮।৫,৬) সুতরাং পার্থিব সমুদ্র যে আকাশেরই ন্যায় বিশাল, অন্তহীন ও সীমাশূন্য ছিল, তাহা তাঁহারা জানিতেন। পার্থিব কোনও নদীর পরিসর আকাশের ন্যায় সীমাশূন্য ও বিশাল ছিল না। সুতরাং সমুদ্র-শব্দ যে নদীর অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। আর ভূতলে সমুদ্র না দেখিলে, প্রাচীন ঋষিগণ কদাপি আকাশের সহিত তাহার তুলনাও করিতে পারিতেন না।

সমুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞানও নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইতেছে,—

"সূর্য্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।" ইত্যাদি। (৭।৩৩।৮)

বৈদিক ঋষিগণের সমুদ্র-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আকাশস্থিত জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুমণ্ডলকেই তাঁহারা সমুদ্র বলিতেন। * যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নদীসকল সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে,

* "An allusion to 'eastern and western floods' which is held by some to be conclusive evidence for a knowledge of the two seas is taken by others to apply to the air-oceans." (Hopkin's *Religions of the Hindus* p. 34).

এবং তাহাদের সমস্ত জল বহন করিয়া আনিয়াও তাহা পূরণ করিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ কি? প্রকৃত কথা এই যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের "সমুদ্র" শব্দের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা মাত্র। এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে, ইয়োরোপে আদি-আর্য্য-নিবাস-সম্বন্ধীয় তাঁহাদের অভিনব ও অদ্ভুত মত প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই তাঁহাদিগকে অসম-সাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। * ঋগ্বেদে সমুদ্রের যে আরও বহু উল্লেখ আছে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

---

* অধ্যাপক ম্যাগডোনেল্ বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের ঋষিগণ যদি সমুদ্রের সহিত পরিচিত থাকিতেন, তাহা হইলে ঋগ্বেদে মৎস্যের এবং জলদ্বারা মৎস্য ধরারও উল্লেখ থাকিত। প্রকৃত প্রস্তাবে, ঋগ্বেদে মৎস্যের উল্লেখ আছে। (১০।৬৮।৮) এবং ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলের ৬৭ সূক্তটি জালাবদ্ধ মৎস্যগণের কাতর স্তুতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষি সম্মদ নামক মহাসীনের পুত্র মৎস্য। জীব মায়াজালে বা কর্ম্মজালে বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইবার কালে তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য দেবতার নিকট করুণ প্রার্থনা করে, এই সূক্তের মন্ত্রদ্বারা তাহাও সূচিত হয়। কিন্তু মন্ত্রবিৎ ঋষি জালাবদ্ধ মৎস্যের কষ্ট না দেখিলে ও অনুভব না করিলে, কদাপি ইহা লিখিতে পারিতেন না। আধুনিক মরুভূমির নিকটবর্ত্তী জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম মৎস্য দেশ ছিল। ইহা পূর্ব্বকালে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী থাকায় এবং সম্ভবতঃ সমুদ্রোপকূলে প্রচুর সংখ্যক মৎস্য ধরা হইত বলিয়া, ইহার নাম "মৎস্য" দেশ হইয়া থাকিবে।

পিটার দি গ্রেট ও আলেক্‌সিস্‌

পরিচয়

[রুষসম্রাট পিটার দি গ্রেটের একমাত্র পুত্র আলেক্‌সিস্‌ পিতার প্রচণ্ড রাজ্য-লিপ্সায় ব্যথিত হয়ে ভায়নায় পালিয়ে যান। তাঁর পুত্রকে প্রত্যর্পণ করবার জন্যে জার, অষ্ট্রিয়ার রাজাকে আদেশ করেন। আলেক্‌সিস্‌ পিতার সম্মুখে উপস্থিত হোলে, তিনি তাঁকে তিরস্কার করে বিচারের জন্যে মন্ত্রী সভায় পাঠিয়ে দেন। জারের কোষাধ্যক্ষ, পিতা-পুত্রের কথোপকথন ও বিচারের ফল যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন, স্যাভেজ ল্যাণ্ডর (Savage Landor) নাট্যচ্ছলে তা প্রকাশ করেছেন। এই নিবন্ধ তারই ভাষান্তর।]

পিটার। আমার কাছ থেকে তো পালালে, আমার গায়ের বাতাস তোমার সহ্য হোল না। ভায়না থেকে তবে ফিরে এলে কেন? সেখানে থাকলেই তো হোত। এমন করে সমস্ত ইয়োরোপের সাম্‌নে আমার মুখ হাসিয়ে কোন্‌ সাহসে ফের আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে?

আলেক্‌সিস্‌। বাবা, তোমার সামনে আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। আমাকে বলপূর্ব্বক আনা হয়েছে।

পিটার। হতে পারে।

আলেক্‌সিস্‌। তোমার ক্রোধ উদ্দীপন কোরতে আমি চাই না।

পিটার। হুঁ! (কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) বিদ্রোহি! কি সংকল্প নিয়ে তুমি ভায়নার আশ্রয় নিয়েছিলে?

আলেক্‌সিস্‌। নির্জ্জনে শান্তির আশায়—সকল বন্ধ হোতে মুক্তি পাবার আশায়;—আর সবার উপর সংকল্প ছিল—আমি যেন আর তোমার বিরক্তির হেতু না হই।

পিটার। আশা পূর্ণ হয়েছে? ভেবেছিলে—অষ্ট্রিয়া তোমাকে তার

পার্ষদ বোলে গ্রহণ কোরবে। (বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া) কি বল ?—আরে, সে যে আমার ঠিক ভায়ের মত।

আলেক্সিস্। না—সম্রাট! আমি ভেবেছিলুম তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন।

পিটার। যখন যাও সঙ্গে টাকা নিয়ে গিয়েছিলে কি ?

আলেক্সিস্। গোটা কতক মোহর।

পিটার। কত ?

আলেক্সিস্। বোধ হয় ষাটটি।

পিটার। আর বোধ হয় সেও বলেছিল, ওর আরো অর্দ্ধেক সে দেবে; আরে মূর্খ! ওর দ্বিগুণেও যে একখানা বাড়ী কেনা যায় না।

আলেক্সিস্। বাবা, তা আমি জানি; আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না, এমন জায়গায় জন্মেচি যে, পৃথিবীর কোন জায়গায় একখানা বাড়ী কেনবারও আমার যো নেই। তোমার উদারতায় আমার তো ওসব কোন অভাবই ছিল না।

পিটার। কোন সম্বন্ধেই আমি তোমার অভাব রাখিনি। জ্ঞান বল, কর্ত্তব্য বল, ধর্ম্ম বল, সাহস বল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বল, সব বিষয়েই তোমায় সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমার একমাত্র চেষ্টা ছিল। তোমায় শিক্ষা দিয়েছিলুম—রক্ষী ও যুদ্ধাশ্বের মধ্যে, দামামা ও তূর্য্য নিনাদে, মাস্তুল ও পতাকার নিম্নে। যখন তুমি খুব শিশু ছিলে আইন অগ্রাহ্য করেও তখন আমি তোমাকে অস্ত্রাগারে নিয়ে গেচি; লোহার পাতের উপর কামানের গোলাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে তোমায় দেখাতুম, কত নতুন ঝক্‌ঝকে তরোয়াল তোমার চোখের সামনে ধরতুম; হাতের পাতার উল্টো দিকে—যতক্ষণ না রক্ত বেরোত—আলপিন ফোটাতুম্, তার পর তোমাকে জিব দিয়ে তা মুছে নিতে বোলতুম; তোমায় আবার সেই রকম রক্ত বের করতে বোলতুম, আর আমি জিব দিয়ে তা মুছে নিতুম। তার পর তুমি যখন দশ বছরে পড়লে তখন তোমার পানীয়ের সঙ্গে বারুদ মিশিয়ে দিতুম; পীচের মধ্যে লংকার গুড়ো ভরে দিতুম; তন্নমুঞ্জের সঙ্গে আলকাতরা মিশিয়ে দিতুম; ছোট ছোট

মেয়েদের দিয়ে তোমায় বিদ্রূপ করাতুম ও আদর দিতুম, মাঝী মাল্লার ভাষায় তোমাকে কথা বলাতুম—কেবল তোমাকে সাহসী করবার জন্যে, কিন্তু কিছুই হোল না। তোমার মনে আছে, যখন কোন বন্দীকে ফাঁসী বা গুলি করা হোত তোমাকে জানালার পাশে দাঁড় করিয়ে দিতুম, দেহ টুকরো টুকরো করে তোমাকে দেখাতুম, চাকর দিয়ে কাটা মাথা এনে তোমাকে তার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বোলতুম। কিন্তু কাপুরুষ তুমি একেবারে দুনিয়ার বার। সে যা হোক্, কিন্তু তোমার রাজপ্রাসাদ থেকে এ রকম জঘন্য ভাবে পালাবার সম্বন্ধে আমি আর একটা কথা জিগেস করচি, ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। অষ্ট্রিযার রাজা কি তোমায় নেমন্তন্ন করেছিল?—ঠিক উত্তর দাও, 'হ্যা' কি 'না'।

আলেক্সিস্। সম্রাট যদি দুঃখ বা অপমান বোধ না করেন, তা হলে আমি এ-কথার যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারি।

পিটার। দিতে পার। তাঁর মত লোককে বাক্যের দ্বারা চঞ্চল কোরতে পারে, এমন কে আছে?

আলেক্সিস্। যখন যাই তখন তো নেমন্তন্ন করেননি, তার পূর্ব্বেও কখন করেননি, এ আমি সত্য করে বলতে পারি। তবে তিনি আমার মর্ম্মের কথা শুনে বড় দুঃখিত হয়েছিলেন।

পিটার। কি সম্বন্ধে? মুখ সামলে কথা বলবে, থাম তুমি। দুঃখ বলে কোন জিনিষ রাজাদের কখনো থাকতে পারে না, বিশ্বাসঘাতক ছাড়া তারা কখনো দুঃখ জানায় না, কাজ হাসিল করবার লোক পেলেই তাদের দুঃখ, সহানুভূতি, করুণা গজিয়ে ওঠে। তখনি তাদের মন তুলোর মত নরম হয়ে যায়। তোমার জন্যে সে দুঃখিত হয়েছিল। কি দয়াদ্র হৃদয় রে!! তোমাকে দয়া দেখিয়ে সে কেন টেনে নিয়েছিল জান? তোমাকে তোমার বাপের মাথার উপর বজ্রবেগে নিক্ষেপ করবার জন্যে; কিন্তু যখন দেখলে তোমার বাপ বড় কঠিন জায়গা, তখন তার কাছে সে দূত পাঠালে—পুত্রের গোঁয়ার্তুমি ও অবাধ্যতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ কোরে। সে বুদ্ধিমান কিনা তাই সে সমস্ত পৃথিবীর

জন্যেও ভগবানকে ক্রুদ্ধ কোরতে চাইলে না। নিশ্চয় কোন কিছু একটা তোমাদের মধ্যে হয়েছিল, নইলে কোন্ মুখে তুমি তার রাজ্যে আশ্রয় নিলে? এধারে এস, সব কথা খুলে বল। আমি বেশ জানি, তোমার মিথ্যা বলবারও সাহস নেই। ঠিক করে সত্য কথা বল দেখি।

আলেক্‌সিস্। তিনি বলেছিলেন, যদি আমি আশ্রয় চাই—তো তাঁর রাজসভা আমার জন্যে খোলা রইলো।

পিটার। খোলা রইলো! হোটেলও তো সকলের কাছে খোলা থাকে, কিন্তু সেখানে যা তারা পায়, তার বিনিময়ে দিতে হয়! সত্য কথা বল—তুমি কি ঠিক তেমনি করেছিলে?

আলেক্‌সিস্। না বাবা, তিনি আমাকে খুব সৌজন্যের সহিত গ্রহণ করেছিলেন।

পিটার। তা তো বুঝতে পারচি!

আলেক্‌সিস্। বাবা, আমি তো তোমার বিদ্রূপের পাত্র নই!

পিটার। সে কথা সত্য। আমার তা অভিপ্রায়ও ছিল না।

আলেক্‌সিস্। বাবা, অনুগ্রহ কোরে তুমি যে শাস্তি দেবে আমি তা সাদরে বরণ করে নেব। (হস্ত চুম্বন করিতে অগ্রসর)

পিটার। নীচ! নীচ!! এখনও তুমি আমার পবিত্র হস্ত চুম্বন কোরতে সাহস কর? মূর্খ! তুমি বুঝতে পারচ না, অষ্ট্রিয়ানরা তোমাকে একটা শুকনো পাতার মত দূর করে ফেলে দিয়েচে।

আলেক্‌সিস্। নিশ্চয়ই বুঝতে পারচি, বাবা।

পিটার। কেন জান?—আমার হুকুমে আজ যদি একটা কাল্-মাকের শয্যাচারিণী করবার জন্যে তার মেয়েকে চেয়ে পাঠাই সে তখনি তা অর্পণ করে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাবে।

আলেক্‌সিস্। বাবা, তার নীচতা কি আমার দোষ।

পিটার। না, তার চাইতে অনেক বেশী। তোমার উদ্দেশ্য ছিল যে প্রতিষ্ঠান আমি আজীবন প্রাণপাত করে গড়ে তুলেচি সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া। কই কখন তো আমার কোন বিজয়ে তোমাকে সুখী হতে দেখিনি!

আলেক্‌সিস্। তুমি যখন নিরাপদে ফিরে আসতে, তখন আমি সুখী হোতুম। তুমি যখন আনন্দ কোরতে, আনন্দ দেখে আমার আনন্দ হোত।

পিটার। মিথ্যুক! কাপুরুষ!! বিশ্বাসঘাতক!!! যখন পোল এবং সুইডরা আমার পদতলে নিপতিত হোল, তখন কি তুমি তোমার অন্তরের সহিত আমায় অভিনন্দিত করেছিলে? তোমাকে তো এক দিনও ঘরে বা বাইরে কখনো পান ভোজনে মত্ত হোতে দেখলুম না, আমার জয়ের জন্তে ভগবান বা সেণ্ট নিকোলাসের কাছে প্রার্থনা কোরতে দেখলুম না! তোমাকে দেখলুম—সৈনিকের পোষাক ত্যাগ করে চুপ করে মনমরা হয়ে বসে থাকতে—

আলেক্‌সিস্। লক্ষ লক্ষ প্রাণি-হত্যায় আমার প্রাণে দারুণ ব্যথা লেগেছিল। এই যে এত লোক মল তার একটিও তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, এই যে যুদ্ধের ঝড় বইল তাতে গেল সব চাইতে যারা বীর, সব চাইতে যারা শ্রেষ্ঠ; গৃহে ও শান্তিতে নিয়ে এল অশ্রুর বন্তা; সম্রাট সমগ্র রাশিয়ার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনবার জন্তে যে পরামর্শ করেছিলেন তার পরিবর্ত্তে এল এক বিরাট বিপ্লব। সম্রাটের মহৎ উদ্দেশ্য ধ্বংস হয়ে গেল।

পিটার। আমি ধ্বংস করলুম? তুমি কোন্ উদ্দেশ্যের কথা বোলচো?

আলেক্‌সিস্। আপনি যে মস্কোর লোকদের সভ্য করবার কথা বলেছিলেন। পোলদের কতক অংশ আমাদের চেয়ে সভ্য; সুইডরা তো এই মহাদেশের সব জাতির চাইতে সভ্য আর তারা যুদ্ধবিদ্যায় এমন পারদর্শী যে, তাদের একটির জীবন ক্রয় করতে, বিনিময়ে আপনাকে সাত আটটিকে দিতে হয়েচে

পিটার। মিথ্যাবাদী! ছজনও না। আর তারা মস্কো ভাইটদের চাইতে সভ্য? আপসালের বড় বড় লোকদেরও পোষাকের মূল্য তো তিন ডুকেটও নয়। আমার তো বিশ্বাস ছিল পোল বা সুইডদের মধ্যে রাজাই থাকতে পারে না, গাষ্টাভাস বা সোভেস্কির মত রাজা

তাদের কি হবে! এই অসন্তোষের ভাব সাধারণে ছড়িয়ে পড়বার পূর্ব্বেই ইয়োরোপে এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়ে। সাধারণে আমাদেরই সে ভার দেয়; সেইজন্যে আমরা আমাদের অনুযায়ী ব্যবস্থা করেছিলুম।—ধোৎ! কার সঙ্গেই বা কথা বল্‌ছি!! একটা নিরেটের সঙ্গে যুক্তি করাও যা, না করাও তা। তুমি কি বোলতে চাও, পোল আর সুইডদের আমি চুপ চাপ থাকতে দেব। উঃ! দুটো জাতই কি ভীষণ শক্তিশালী!!

আলেক্‌সিস্। তাদের শান্তি দেখলে আমার খুব আনন্দ হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রজাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি হোক এই আমার ইচ্ছা।

পিটার। তা হোলেই হোল; তাদের ওপর আমি যে আধিপত্য বিস্তার করেছি তুমি তা সন্দেহ কর।

আলেক্‌সিস্। ভগবান যেন এমন না করেন।

পিটার। ঠিক, ভগবান যেন না করেন। ভগবান কি কোরবেন, না কোরবেন সে সম্বন্ধে তোমার মত বদমাইসের কি দরকার? ভগবান যে ছেলেকে বাপের অবাধ্য হতে মানা কোরেচেন; তিনি তো আরো বিশ রকমের জিনিষ মানা কোরেচেন, আর তা ছাড়া যে কেবল মৃত পুরোণ লোকদের চিন্তা করে, এমন উত্তরাধিকারী আমি চাই না।

আলেক্‌সিস্। বাবা, আমি এমন চিন্তা কথনই করি না।

পিটার। তুমি নিশ্চয় কর। তুমি সিদিয়ানদের কথা বল্‌ছিলে, অধ্যাপক মশায়! সিদিয়ানরা নাকি আমাদের চেয়ে সুখী ছিল? এ কথা 'আপনাকে' কে বলেচে? তারা নাকি কারো অনিষ্ট কোরত না, নদীর ধারে ধারে মাঠে মাঠে তাদের গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়াত? ব্যবসায়ে কাকেও ঠকাত না, যুদ্ধে তারা ছিল বীর, কারোর ক্ষতি কোরত না, কাকেও আক্রমণও কোরত না, ভয়ও কোরত না—এর অর্থতো আমি কিছুই বুঝি না। হল্যাণ্ডে থাকৃতে আমি শুনেছিলুম যে, রোমের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দুর্গ প্রাচীরের নিন্দা করায় তাঁর ভাইকে মেরে ফেলেন, আর এই এত বড় রুষসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর অপদার্থ পুত্রকে, যে সভ্যতাকে ত্যাগ কোরে ভবঘুরের

মত ঘুরে বেড়াতে চায়, সহর ত্যাগ কোরে গ্রাম্য জীবন বরণ করে, মস্কোভাইটদের চাইতে সিদিয়ানদের ভালবাসে, তাকে ছেড়ে কথা বোলবে? আমি আমার লোকদের কামাতে শিখিয়েচি, প্যান্টলুন পরতে শিখিয়েচি, তাদের দিয়ে বসদ ও বাঘের সঙ্গে বিরাট বাহিনী নির্ম্মাণ করেচি। তীর ধনুক ভাল---না কামান ভাল? মেষ-পালকের দল ভাল-- না সৈন্যের দল ভাল? ঘোটকের দুধ ভাল---না মদ ভাল? কাঁচা মাংস ভাল---না রাঁধা মাংস ভাল? তোমার যা মত, এ তো দেখচি ভদ্রতা আর সৎশাসনের মূল পর্য্যন্ত কেটে ফেলা, সেইজন্যে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গেরা তরোয়াল ও আগুন দিয়ে এ নির্ম্মূল কোরবেন, বোলেচেন। নিঃশ্বেসের বিরোধী নিঃশ্বেস টেনে কেউ কখন বাঁচতে পারে?

আলেক্‌সিস্। আমি আমার মত তো কখন প্রচার করিনি।

পিটার। কি করে কোরবে? তোমার ও-মত পাথরে বীজ পড়ার মত হবে। আর যেখানে ওই বীজ একটু অঙ্কুরিত হয়েচে অমনি তক্ষুণি সেটাকে তুলে আমার কাছে এনেচে।

আলেক্‌সিস্। সভ্যতাকে আমি কখনই ছোট করিনি। কেবল মানুষের স্বার্থপরতা ও হিংসাবৃত্তি এর গতি রুদ্ধ কোরচে দেখে, আমার মনে বড কষ্ট হয়। সভ্যতার অসম্পূর্ণতা হেতু কতকগুলো দোষকে সভ্যতার গুণ বলে ধরে মানুষ ভুল কোরচে। খুব কম লোকেই সভ্যতার আসল রূপটি ধরতে পেরেচে।

পিটার। কেমন করে? যুক্তি দেখাও। ধ্যেৎ! তোমার আবার যুক্তি!! কি আবোল তাবোল বোলবে বল।

আলেক্‌সিস্। যখন দেখি—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আর পণ্ডিতেরা পরস্পরকে ঘৃণা কোরচে, নিজেদের বাড়াবার জন্যে পরস্পরের অখ্যাতি কোরচে, যখন দেখি—দয়াময় ভগবান হত্যার আদেশ ঘোষণা কোরচেন আর যা তিনি অন্যত্র মানা কোরেচেন তাই করার জন্যে ধন্যবাদ দিচ্চেন তখন এই জঘন্য বর্ব্বরতার পরিবর্ত্তে অতীত বর্ব্বর জাতিদেরই স্মরণ করি। এখনকারের কৃশ্চানদের চাইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা

কৃশ্চান না-হয়েও কত বেশী ধার্ম্মিক, সংযমী, ন্যায়বান, সরল, পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন—দেখে অবাক হয়ে যাই।

পিটার। দুষ্ট নাস্তিক!

আলেক্‌সিস্‌। সত্যই বাবা, দুষ্ট বোলেই আমি নাস্তিক। দুষ্টুমি—সকল অন্ধ আদেশ ও বিশ্বাসের বিরোধী।

পিটার। সত্যই কি আজ মস্কোর জারকে তার ছেলের কাছ থেকে ধর্ম্ম উপদেশ শুনতে হোল! না—, পবিত্র ত্রিত্বের নামে শপথ কোরে বোলচি, তুমি আজ থেকে আমার ছেলে নও। ফের যদি তুমি আমার হাটু স্পর্শ কর, এই তামাকের নল দিয়ে তোমার আঙ্গুল ছেঁচে দেব; যদি এটা একটা হাতুড়ি হোত! ওঃ! নীচ পলাতক কৃতদাস!!

আলেক্‌সিস্‌। বাবা, বাবা, তুমি আমার হৃদয় চূর্ণ করে দিয়েচো যদি দোষ করে থাকি আমায় ক্ষমা কর।

পিটার। সরকার থেকে এর যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান হবে।

আলেক্‌সিস্‌। শাস্তি হয় হোক, কিন্তু তোমার ক্রোধ উপশমিত হোক।

পিটার। জগৎ আজ তোমার ও আমার মধ্যে বিচার কোরবে। তোমার ওপর আজ এক দুর্নামের ছাপ আমি মেরে দেব।

আলেক্‌সিস্‌। বাবা, আজ পর্য্যন্ত আমার কোন সুনামের ধারণাই নেই। শোন জার, আমার মত নীচ লোক তোমার ও জগতের মধ্যে একটা বাধার সৃষ্টি কোরতে চায় না। তোমায় যেন কেউ দোষী না করে।

পিটার। আমায় দোষী কোরবে! বিদ্রোহি! বিশ্বাসঘাতক! আমায় কে দোষী কোরবে!!

আলেক্‌সিস্‌। বাবা, আমার ভয় হয়—পাছে কেউ তোমায় কুকথা বলে; লোক-মত প্রাসাদকেও কাঁপিয়ে দেয়, সমাধির কঠিন প্রস্তরও চূর্ণ করে প্রবেশ করে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের রথের গতিকেও অতি-ক্রম করে, আর শেষ বিচারের দিন সে মত তাঁকেও শুনতে হয়।

পিটার। চুলোয় যাক! এসব ব্যাপার পিটার্সবার্গে নয়, সংঘ

দিয়েও কিছু সুবিধে হবে না, তবে এখানকার আইনে বাধে বটে। তোমার মত জানোয়ারের সঙ্গে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই! * * * কে ওখানে? মন্ত্রী! কোথায়—এদিকে এস, ঝিমোচ্ছ, না টাকা গুণচ?

মন্ত্রী। (প্রবেশ করিয়া) কি আদেশ মহারাজ!

পিটার। ওখানে মন্ত্রী-সভা সমবেত হয়েচে?

মন্ত্রী। প্রত্যেক সভ্যই মহারাজ!

পিটার। এই যুবককে নিয়ে যাও, বিচার কর;—আমার কথা বুঝতে পারচ—

মন্ত্রী। আপনার আদেশ আমাদের জীবনের নিঃশ্বাস।

পিটার। এই নিরেটগুলো যদি বিচারে শৈথিল্য দেখায় তা হলে আমার লিভোনিয়ার শণের দড়ি এদের ওপর পরখ কোরব।

মন্ত্রী। (কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ করিয়া) মহামান্য জার!—

পিটার। কি বোলচ বলে যাও—নিশ্চয়ই তার মৃত্যু-আজ্ঞা তোমরা দাওনি, ব্যাপারটা কি সব না পড়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেচো।

মন্ত্রী। না সম্রাট! ওর কোনটিই ঘটেনি।

পিটার। তার মানে—তোমার শির স্কন্ধচ্যুত হবে।

মন্ত্রী। মহামান্য সম্রাট!

পিটার। জাহান্নমে যাক তোমার মহামান্য! কি কোরতে এসেচ? শীঘ্র বল।

মন্ত্রী। হায়! সম্রাট! আপনার পুত্র ভূমিতে পতিত হয়েচেন।

পিটার। ঠেলে তুলে চেয়ারে বাঁধ। ভীরু পশু! কেন পড়ে গেল?

মন্ত্রী। মৃত্যুর করস্পর্শে মহারাজ! আপনার নাম—

পিটার। সব ঘুলিয়ে দিচ্চ, মন্ত্রী! সব স্পষ্ট করে বল।

মন্ত্রী। আমরা তাঁকে বললুম যে, আপনার দোষ সপ্রমাণ হয়েচে; অতএব আপনার জীবনের স্বত্ব অপহরণ করা হোল।

পিটার। বেশ ভাল কথা, তার পর?

মন্ত্রী। তাঁর মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল—

পিটার। তাই নাকি! তাই নাকি! তার এই দুর্বিনীত ভাবই তার সর্ব্বনাশ কোরলে, কে মনে করেছিল তার ওই নীরস মুখে হাসি বেরোবে! তার পর বলে যাও—

মন্ত্রী। দু একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীর স্বরে বল্লেন, আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চল, আমার জীবন বড় ক্লান্ত, কেউ আমায় ভালবাসে না। মহারাজ! সমবেদনায় আমারও চোখে জল এল, আজ্ঞা-পত্র আমি বুকে চেপে ধরলুম। তিনি কাগজখানি হাত দিয়ে ধরে বল্লেন—পড়, আমার মৃত্যু-আজ্ঞা আমায় পড়ে শোনাও। তোমার চোখের ও-নীরবতাই বলে দিচ্চে এতে কি আছে, তবুও আইনের একটা বিধি আছে; আমাকে আর সন্দেহ দোলায় দুলিও না। আমার বাবা যে আমাকে ভীরু বোলতেন তা ঠিকই, কিন্তু যে মৃত্যু আমাকে আমার ভগবানের কাছে নিয়ে যাচ্চে, তাকে আজ আমার একটুও ভয় হচ্চে না।

পিটার। মাছের রক্তের লোকগুলোর মৃত্যুকালেও দেখেছি দৃঢ়তা নষ্ট হয় না। স্থির উজ্জ্বল চোখ, মৃদু হাসি—এর একটুও পরিবর্ত্তন হয় না। তার পর আজ্ঞা-পত্র পড়ে শোনালে?

মন্ত্রী। খানিকটা, মহামান্য রাজা! কিন্তু যেই তিনি শুনলেন যে, আপনি তাঁকে বিদ্রোহীর অপরাধে অপরাধী কোরেচেন, যেই আপনার নাম তাঁর শ্রুতিপথে গেল, তিনি নির্ব্বাক হয়ে পড়ে গেলেন, আমরা তাঁকে তুললুম, কিন্তু একেবারে নিস্পন্দ—মৃত্যু—

পিটার। নির্ব্বোধ! বর্ব্বর! পুত্রের মৃত্যু-কাহিনী তুমি পিতার নিকট শোনাতে এলে? এখনও যে, সে জল স্পর্শ করেনি; ওঃ! মদ নিয়ে এস।

মন্ত্রী। একজন চাকরকে ডাকতে পারি কি?

পিটার। দূর হও, নিজে আন, আমার কাছে মন্ত্রী ও চাকর দুই-ই সমান। আমি এইবার নিজেকে একটু ঠাণ্ডা কোরব। শোন, শোন, বোতলটা নিয়ে এস, একটু মাছ আর মাংস যেন সঙ্গে থাকে।

শ্রীপ্রভাতী দেবী

খাসীয়া ও সিন্‌টেং জাতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রচলিত রূপকথা

অনেকেই শুনিয়াছেন, খাসীয়া পাহাড়ে "থেন্" পূজা হয় এবং সেই পূজাতে মানুষের রক্ত দরকার হয়। তাই অনেক সময়ই দেখা যায়, কোন খাসীয়া একাকী দূর গ্রামে যাইতে চাহে না। ভয়—পাছে থেন্ পূজারীরা তাহাকে প্রাণে মারে। খাসীয়ারা বলে, শুধু তাহাদের রক্তই থেন খায়, বাঙ্গালী বা অন্য কোনও জাতীয় লোকের রক্ত খায় না। এ বিষয়ে প্রচলিত রূপকথা এইরূপ :—প্রাচীন কালে চেরাপুঞ্জীর নিকট এক পাহাড়ের গুহায় প্রকাণ্ড অজগর সাপ ছিল। গরু, বাছুর, ছাগল এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত পাইলে সে উদরস্থ করিত। গ্রামের সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিবার পরামর্শ করিল ও একজন সাহসী লোক ঐ কাজের ভার লইল। সে লৌহনির্ম্মিত এক ছাগল আগুনে পোড়াইয়া লাল করিয়া লইল তৎপরে কোনও কৌশলে অজগরের বিস্তৃত মুখ-গহ্বরে সেটাকে ফেলিয়া দিল। সাপটা তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। "শত্রুর শেষ" রাখা ঠিক নয় এই ভাবিয়া খাসীয়ারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, মৃত সাপটাকে ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলিতে হইবে। তাই করা হইল, এমন কি প্রবাসী বাঙ্গালীরাও নিজ নিজ অংশ পাক করিয়া খাইল। শুধু এক খাসীয়া বৃদ্ধা তাহার ছেলের গ্রামান্তর হইতে আগমনাপেক্ষায় কিছু মাংস তাহার জন্য রাখিয়া দিল। সে রাত্রিতে ছেলে বাড়ী ফিরিল না এবং দৈবক্রমে সেই মাংসখণ্ড জীবিত হইয়া ভীষণাকৃতি থেন্ (সাপ বিশেষ) রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া প্রার্থনাদি করিতে লাগিল। থেন্ তাহাদের সহিত নিয়ম করিল যে, ঐ বৃদ্ধার পরিবারের লোক বৎসরে একদিন মানুষের রক্ত দিয়া

তাহার পূজা করিবে। তাহা হইলে তাদের ধন, জন ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে এবং যেহেতু পরজাতীয়েরা তাহাদের ভাগের মাংস বিশ্বস্ত ভাবে খাইয়া ফেলিয়াছিল তাই তাহারা রক্ষা পাইল। খাসীয়াদের বিশ্বাস, এখনও এই পূজা প্রচলিত আছে এবং এমন কি মানুষ হত্যাও হয়। এইরূপ আরও অনেক গল্প আছে। হিন্দু দেবদেবী, যেমন—লক্ষ্মী, কালী, দুর্গা, কার্ত্তিক প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইলে এই প্রথা দূর হইতে পারে।

প্রাচীন রাজ্য—দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজবাহিনী এদেশে প্রবেশ করে। পরবর্ত্তী ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত দুতিনটি ক্ষুদ্র রাজ্য, বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ সুনজরে দেখে নাই। "গরিলা" যুদ্ধে নিজ নিজ স্বাধীনতা-স্পৃহা ও স্বদেশপ্রীতি তাহারা বুকের রক্ত দিয়া জন্মভূমির তুষার শীতল প্রস্তরবক্ষে লিখিয়া দিয়াছে। 'নংখ্লাও'রাজ তুবৎ সিং বন্দী অবস্থায় ঢাকা জেলে প্রাণত্যাগ করেন। অহমরাজাদিগের সময়েও প্রাচীন 'খাইরিম্' ও 'সিন্টেং রাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অহম্রাজাদিগের গৌরব যুগে যখন বিস্তৃত আসামে তাহাদের একাধিপত্য, তখন এই দুই রাজ্যের সহিত অহম্রাজ নরনারায়ণের মিত্রতা ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রণদক্ষ বহু হাতী, রাজ্যের টাকশালে প্রস্তুত রাজমোহরাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা, বিবিধ অস্ত্র, বহুবিধ বস্ত্র ও অনেকানেক উপঢৌকনসহ 'খাইরিম্' রাজের প্রতিনিধিগণ অহম্-রাজের দরবারে উপস্থিত ছিলেন---এরূপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। 'নরটিয়াং' এর ঢাল, তরোয়াল তাহাদেরই তৈযারী। দুইটি বন্দুক (অবশ্য অতি সাধারণ রকমের) এখনও 'পূজার বন্দুক' বলিয়া সশ্রদ্ধ ভাবে দুর্গাবাড়ীতে রক্ষিত ও পূজিত হয়। এগুলিও এদেরই তৈয়ারী। 'নর-টিয়াং'এ এক গল্প প্রচলিত আছে যে, ইংরেজ বিজয়ের পর জনৈক সাহেব সিপাহীসহ আসিয়া রাজ্যের সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্রাদি একত্র করিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে এসব তৈয়ারী করিবার বিদ্যাও

লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই যেন এক দশা, এই বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের—জীবিতের সংযোগ-সূত্র আবিষ্কার করিতে কেহই পারিতেছে না।

"কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি"র কল্যাণে খাসীয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের দুই তিনটি রাজ্য সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, প্রায় দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও এই সব রাজ্য নিজ দেশে প্রস্তুত ঢাল তরোয়াল এবং আগ্নেয়াস্ত্রাদি-সুসজ্জিত সৈন্য, সুনিয়ন্ত্রিত গজ, অশ্ব, রাজনীতি বিশারদ্ মন্ত্রণাকুশল ও শাম-দান-ভেদ-দণ্ডনীতি জ্ঞানবিশিষ্ট মন্ত্রী, রাজমোহরাঙ্কিত বহুল তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতক্ষম টাকশাল, বস্ত্রশিল্প ও কলাবিদ্যাপটু শিল্পী এবং প্রজাপূর্ণ ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমানে এ সবের বিশেষ কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। জৈন্তিয়াপুর-ই জৈন্তিয়ারাজের রাজধানী ছিল। রাজারা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জোয়াই হইতে জৈন্তিয়াপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা অতি প্রাচীন এবং এখনও সেখানকার পার্ব্বত্য নদী সমূহ পাথরের সেতুগুলি বক্ষে ধরিয়া প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি-গাথা নীরবে গাহিয়া চলিয়াছে। সেই বীরদাপের ও বিজয়গর্ব্বের চিহ্ন এখনও কালের স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া যায় নাই। তখনকার রাজাদের নাম ক্ষত্রিয়োচিত "সিং" উপাধিযুক্ত এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে হিন্দুসভ্যতার আবহাওয়ায় গঠিত হইয়াছিল।

একরূপ আকৃতি, বলিতে গেলে একই ভাষাভাষী ইহারা—আহার, বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও সমাজধর্ম্মে সম অনুষ্ঠানকারী। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, স্বাধীনতার আবহাওয়া ও আজন্ম সংস্কারই মাতৃভূমিকে তাহাদের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের জাতীয় নাচে, তীর খেলায়, সমাজ সংহতিতে ও কার্য্য ব্যপদেশে অন্য জাতির সহিত সংমিশ্রণে সর্ব্বত্রই জাতীয়তা বোধ বিদ্যমান থাকে।

খ্রীষ্টান্ মিশনরীদের আগমন

শ্রীরামপুর মিশনের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল। তিনি

মিশনের উদ্যোগে গস্‌পেল (Gospel) প্রচারের জন্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাগ্রে খাসীয়া পাহাড়ে প্রেরিত হন। তৎপরে প্রচারের সুবিধার জন্য বাংলা অক্ষরে খাসীয়া ভাষায় 'নিউটেষ্টামেণ্ট' (New Testament) ছাপান হয়। পর পর আরও অনেক প্রচারক আসিয়াছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন, ব্যাপটিষ্ট মিশন (Baptist Mission) এর সহিত একত্র মিলিত হইয়া যাওয়ায় পরবর্ত্তী বৎসরে খাসীয়া পাহাড়ের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। চারি বৎসর পর ১৮৪১ খ্রীঃ রেভারেণ্ড জোন্‌স্ (Rev. Jones) ওয়েলস্ মিশন (Welsh Mission) কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। বর্ত্তমানে এই ওয়েলস্ মিশনই (Welsh Mission) খাসীয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। প্রায় পাঁচশত লোয়ার প্রাইমারী (Lower primary) পাঁচটি এম, ই, স্কুল (M. E. School) ও একটি এইচ, ই, স্কুল (H. E. School) ইহাদের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। মিশন ফণ্ডই (Mission fund) খরচ দেয়। এখন ফণ্ডের (প্রায় ২॥ লক্ষ টাকা) সুদ হইতে আরও কয়েকটি স্কুলের খরচ চলিতেছে। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া যাহাদের কাজ চলিতেছে, যাহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, ধর্ম্মবলে না হউক অর্থবল, জনবল ও সুকৌশল প্রয়োগে সিদ্ধিলাভে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী এবং যাহারা রাজশক্তির ছত্রছায়ায় রক্ষিত, তাহাদের প্রশংসনীয় চেষ্টা, উদ্যম ও ধৈর্য্য কি বৃথা যাইবে? প্রায় চল্লিশ হাজার খাসীয়া ও সিন্‌টেং স্ত্রী পুরুষ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ ৩।৪ পুরুষ পরম্পরায় খৃষ্টান। কিন্তু ইহা কি অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের তুলনায় খুবই বেশী? কেনই বা খৃষ্টান হয় এবং কাহারা হয় বিচার করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে দোষ কাহাদের—তাহাদের, না—আমাদের?

জিলাকে দশটি মিশনরী ডিষ্ট্রীক্ট এ (Missionary District) বিভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই সেই জায়গায় এক একজন ওয়েলস্ মিশনরী (Welsh Missionary) থাকেন। তৎপর থিওলজি (Theology) বিদ্যায় পারদর্শিতার ক্রম অনুসারে (অবশ্যম্ভাবী বেতন

তারতম্যে) রেভারেণ্ড, পেষ্টর ও শিক্ষক স্থান পাইয়াছেন। প্রত্যেক মিশনরী ডিষ্ট্রীক্টেই (Missionary District) গড়ে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ-জন শিক্ষক, চার পাঁচজন পেষ্টর ও চার পাঁচজন রেভারেণ্ড আছেন। শিক্ষকেরাই প্রধান পাণ্ডা। অধিকাংশ গ্রামেই স্কুল ও গীর্জ্জার কাজ একই ঘরে হয়। স্কুলগৃহ মেরামতের খরচ অনেক জায়গায় গ্রাম্য পঞ্চায়েত্‌রাই বহন করে। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়। এইরূপে, যাহারা খৃষ্টান নয় তাহাদিগকেও গীর্জ্জা মেরামতের খরচ দিতে হয়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও খৃষ্টানসংখ্যা বৃদ্ধি এই দুই দেখাইতে পারিলে শিক্ষকেরা প্রমশন পান। এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত স্কুল-গীর্জ্জা, ও কয়েকটি বড় বড় চার্চ্চ (Church Building) আছে। সেখানে দুই তিন বা ততোধিক গ্রামের খ্রীষ্টানদের সমবেত উপাসনা হয়।

প্রায় এক হাজার খাসীয়া পাদরী তৈয়ারী হইয়াছে। সকলেই ওয়েলস্‌ মিশনের (Welsh Mission) বেতনভোগী। এই তুলনায় অতি অল্পসংখ্যক লোক অন্যান্য বিভাগে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

ভারতের মোহ উন্মুচিত হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষগুণ বাস্তবের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়াছে। এখানেও শিক্ষিতের বেকার সমস্যার (Non-employment of the educated) সূচনা দেখা যাইতেছে। মিশন কত পাদরীর খাবার দিবে? আর বর্ত্তমান শিক্ষার আনুসঙ্গিক সভ্যতার উপকরণ সমূহ নীতির বাঁধ উপচিয়া পড়িয়াছে। নয়ন-মন লুব্ধ। স্বল্প বেতনে আকাঙ্ক্ষার ইন্ধন যোগান অসম্ভব। তদুপরি 'সভ্য' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন বজ্রদৃঢ় দেহে বিকার দেখা দিয়াছে।

যেখানে যে অভাব—শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সেই অভাব পূরণ করিয়া ধর্ম্মের আলোক দেওয়াই বরাবর ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মের আদর্শ ছিল। যাহার যাহা আছে তাহা নষ্ট করিতে নহে, তাহাকে পরিপূর্ণ করিতেই ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ভারতে ও ভারতেতর দেশে প্রচারিত হইয়াছে! ইহাদের ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। যীশুকে যদি কেহ হরি বলে তবে ইহারা সেই হরিকে

চিনিতে পারিবে না। সন্দেহ হয়, যিশুও ইহাদের চিনিতে পারিবেন না। ভাব ও প্রকৃত ধর্ম্ম অনাদর করিয়া নাম ও রূপকেই প্রধান করা হইয়াছে। রাম, শ্যাম, যদু সকলের জন্য একই জুতা ব্যবহারের উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

খুব সম্ভব, প্রধানতঃ বাঙ্গালী জাতির সহিত সংমিশ্রন বন্ধ করিবার জন্যই ওয়েলস্ মিশন (Welsh Mission) শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, ইহাদের বাংলাভাষা শিক্ষার সুযোগ দেয় নাই। অথচ চাউল, ধান, কাপড় ও সব রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাঙ্গালীদের নিকট হইতেই ইহাদের কিনিতে হয় এবং কমলা, আলু, মধু, তেজপাতা, চূণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর নিকটই রপ্তানী করিতে হয়। ভাল বাংলা না জানায় ও দর যাচাই করিতে না পারায় ইহাদের কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা বলিবার নয়।

খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রচার

সেবা, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষাপ্রচার ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিল বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমত সমূহ। ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভারতে অবান্তর সকল ভাবরাশি প্রচারিত হইয়াছে। প্রচারকদিগের দৈনন্দিনজীবনে যদি এই ধর্ম্মভাব সতেজ থাকে তবে তাহারা যে কোনও অদ্ভুত মতবাদই প্রচার করুক না কেন, ভারতে তাহাদের স্থান আছেই। কারণ এদেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মতবাদ কর্ম্মপরিণত ধর্ম্ম-জীবন হইতে বিভিন্ন নয়। এদেশে ধর্ম্মপ্রচার অন্য কোনও রূপেই কৃতকার্য্য হয় নাই। রক্তপাত ও পার্থিব সুখ ভোগের লিপ্সা কিছুই জাতির প্রাণকে নাড়া দিতে পারে নাই। সমুদ্র বক্ষোপরি জলকল্লোলের মত তাদের উচ্ছ্বাস নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী!

ভারতে খ্রীষ্টীয় মিশনরীদের ধর্ম্মপ্রচার ঠিক পথে হয় নাই। তাই উপযুক্ত সাড়া মিলে নাই। আর যাহা কিছু সামান্য কৃতকার্য্য হইতে দেখা গিয়াছে তাহাও চরিত্রবান, ত্যাগী, ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান

সাধুগণের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। কারণ সকল ধর্ম্মের মূল শিক্ষাই কি "ত্যাগ ও সেবা" নহে? ইহারা কিন্তু, অর্থ ও সংহতি শক্তিতেই অতিমাত্রায় বিশ্বাসী, ধর্ম্ম ও চরিত্রবলে ততটা বিশ্বাসী নহে। অর্থবলেই ইহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে গীর্জ্জা, স্কুল ও প্রচারক অর্থের দ্বারা পরিচালিত ও পুষ্ট হইতেছে। শিক্ষার 'একচেটিয়া' দখল পাওয়ায় ইচ্ছামত পুস্তকাদি প্রণয়ন করিবারও সুযোগ ঘটিয়াছে। তদুপরি পাশ্চাত্য সমাজের দোষগুলি অবাধে অতি মাত্রায় প্রচলিত হইয়াছে। যে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না, যাহা কেবল ভাঙ্গাচুরার পথে নিয়োজিত করে তাহা দ্বারা কতটুকু কল্যাণ আশা করা যায়! তদুপরি কোনও সম্প্রদায়বিশেষের হাতে একটা উন্নতিকামী জাতির সমুদয় শিক্ষার ভার থাকা কতদূর বিপজ্জনক! শুধু কতকগুলি মিশনরী ও দুই দশজন গ্র্যাজুয়েট (graduate) তৈয়ারী করিবার জন্যই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে। একদিকে বাংলা ভাষা বা অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষা তাহাদের জানা নাই, ইংরেজী ভাষায়ও অধিকাংশের জ্ঞান খুব অল্প এবং খাসীয়া ভাষায় রোমান হরফ্ (Roman Alphabet) দিয়া লিখা যে সব বহি বাহির হইয়াছে তাহাদের শতকরা নিরনব্বইটি খ্রীষ্টীয় গল্পবহুল (Christian Theological)। বিলাসিতার আনুসঙ্গিক যে পরিমান অর্থব্যয় প্রয়োজন তদনুযায়ী অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই এবং অর্থাগমের নূতন উপায় উদ্ভাবনের শক্তিও ইহাদের নাই। অর্থনীতির দিক দিয়া সমস্ত জাতির ক্ষতির পরিমান দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

অন্যান্য সম্প্রদায়

পর পর আরও অনেক মিশনরী (Missionary) সম্প্রদায় খাসীয়াদের ভিতর কাজ করিতে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। নানা কারণে তাহাদের কার্য্য আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। তথাপি

ভারতীয় সভ্যতা তাহাদের দ্বারাই অনেকাংশে খাসীয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং একটা পরিবর্ত্তন যুগে তাহাদের অভ্যুদয়-দেবতার আশীর্ব্বাদ রূপেই আসিয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে ১৩০৪ সালের কিছু পূর্ব্বে বৈষ্ণব গোঁসাইরাও সেলা অঞ্চলে প্রচার কার্য্যে গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে ইঁহাদের কাহারই প্রচার কার্য্য নাই বলিলেও চলে।

বর্ত্তমান সংস্কারকগণ কি শিখিতে পারেন

বিশেষ করিয়া বাংলায় এখন যে সব সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে তাহার সবটারই কিছু না কিছু আদিম উপাদান এখানে রহিয়াছে। যে যে বিশেষ খাতে চলিয়া এই সব ভাবধারার যেরূপ কার্য্য পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা সংস্কারকগণের নিজ চক্ষে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বিধবা-বিবাহ, সমাজ-সংস্কার, সাম্য, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, স্বায়ত্ত-শাসন, শক্তি-চর্চ্চা, দেশাত্ম-বোধ পৌরহিত্য দূর করা এবং কতটুকু পাশ্চাত্য ভাব জাতীয় জীবনে গ্রাহ্য ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে এই সব জাতির চেষ্টা অনুধাবন করিলে আমাদের সংস্কারকগণের ধারণা আরও পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হইবে। অতি নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসী বাঙ্গালীগণও ইহাদের ভিতরকার খবর লইতে উৎসুক হন নাই বা সুবিধা পান নাই। প্রথমতঃ ভাষা না জানায় পরস্পর ভাব আদান প্রদান অসম্ভব। কিন্তু এক বৎসর চেষ্টা করিলেই এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাষা শিক্ষা করা যায়। সাধারণতঃ হিন্দুসম্প্রদায় খাসীয়াদিগকে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে। পাহাড়ী জাতি বলিয়া তাহাদের অবজ্ঞা করা হয় আর ছুৎমার্গের উৎকটতা সিলেট ও প্রতিবাসী জিলাসমূহে একটু বেশী থাকায় উহাদের সহিত একত্রে বসবাস করাও অবিধেয়। এমন কি ইংরাজী শিক্ষিত খাসীয়ারাও অনেক জায়গায় হীন ব্যবহার পাইয়া থাকেন। আমার জানা আছে, হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান ও হিন্দুদেবদেবীর পূজা দর্শনে উৎসুক

শত শত খাসীয়া স্ত্রী পুরুষ প্রতি বৎসর, বিশেষ করিয়া দুর্গাপূজার সময় শ্রীহট্ট সহরে গিয়া থাকে। তাহারা মুসলমান হোটেলে বা মুসলমান বাড়ীতে থাকিয়া কত অসুবিধা ভোগ করে। হিন্দুরা ইহাদের স্থান দেয় না। কত শিক্ষিত যুবক ছাত্র, কত কার্য্যক্ষম ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা 'মাল্‌সাগিরির' জন্য হাজার হাজার টাকা অবাধে খরচ করিতে পারেন কিন্তু এই একটা বিশেষ অসুবিধা দূর করিয়া দুই জাতির মিলনপথ পরিষ্কার করিয়া দিতে কাহারও চেষ্টা নাই।

নানা সম্প্রদায়ের প্রচারের ফলে হিন্দু জাতির উপর শিক্ষিত খাসীয়াদের নানারূপ মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, যথা—হিন্দুরা পৌত্তলিক, তাদের সমাজ সংহতি নাই, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্য-বিবাহ জাতীয় জীবনে কলঙ্কস্বরূপ ইত্যাদি। আবার খাসীয়াদের সহিত না মিশায় হিন্দুসমাজের ধারণা—উহারা পাহাড়ী, অসভ্য জাতি, ইয়োরোপীয় সমাজধর্ম্মের অনুকরণকারী, শৌচাচার বিহীন, অল্প বুদ্ধি ও সুকুমার মনোবৃত্তিবিহীন ইত্যাদি। এই সব আপাতঃ দৃষ্টিতে অনুচিত আচার নিয়মের একটা সত্নত্তর ও কার্য্যকারণ সামঞ্জস্য পাওয়া কেবল পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ও সহৃদয় ভাবে মিলামিশা হইতেই সম্ভব। তাহা হইলেই অতীত শত শত শতাব্দীর বিপদ আপদে হিন্দুরা কি ভাবে জাতীয় জীবন, ধর্ম্ম ও শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছে, কোন্ বিশেষ অবস্থায় কি কি বিধি নিষেধ কার্য্যকরী ও মঙ্গলপ্রদ ছিল আবার কি ভাবে অন্য যুগে সেই সব নিয়ম পরিত্যাক্ত হইয়াছে ও নূতন স্মৃতির অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কি করিয়াই বা এই সব পরিবর্ত্তনের ভিতর অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ ও সম্বন্ধবাদ বিষয়ক সনাতন শ্রুতি শাস্ত্রগুলি অব্যাহত থাকিয়া হিন্দুকে সর্ব্বকালে উদার, পরধর্ম্মমত সহিষ্ণু ও সর্ব্বধর্ম্মের সত্যগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে তাহাও ইহাদের উপলব্ধি হইবে। অপরদিকে নূতন জাতীয় জীবন ও আপাতঃ উগ্র ভাবরাশি হজম করিয়া খাসীয়ারা কিরূপে দ্রুত উন্নতির দিকে যাইতেছে এবং কী ভীষণ অজ্ঞতার ও বিস্মৃতির গর্ভ হইতে কতদূর উঠিয়া আসিয়াছে তা জানিতে পারিলে হিন্দুরাও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত

ভারতের মনীষা "সংস্কারে বিশ্বাসী নয়, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী" অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্ম আপনার এই বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ পথে চলিয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে উৎসাহিত না করিয়া জাতিবিশেষকে তদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে। একদিনে প্রচার কার্য্য শেষ না করিয়া শতাব্দী ব্যাপী ধর্ম্ম-জীবন সংস্পর্শ দ্বারা ইতর প্রধান জাতিগণের ভাবধারা ও কার্য্য-প্রণালী এককালে পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত করা হইয়াছে, তাই দেখিতে পাই, অনার্য্য শক, হুন জাতির বংশধরগণ আর্য্য-ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বিজিত হইয়াও হিন্দুরা জেতৃগণকে ধর্ম্মবলে কুক্ষীগত করিয়াছে, তাই সমাজে কোন্ জাতির স্থান কোথায় হইবে সেই প্রশ্নই উঠে নাই ; বর্ত্তমান গোর্‌খা, আহম্ ও মনিপুরী প্রভৃতি জাতির ইতিহাস তুলনা করুন। জাতিকে জাতি যে দিন সংস্কৃত বিদ্যা সহায়ে ধর্ম্ম ও শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে তখনি তাহার আসন সমাজশীর্ষে স্থান পাইয়াছে। জাতি স্রষ্টা ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বহু আর্য্যেতর জাতিকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতিতে উন্নীত করিয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকগণের সেই কার্য্যধারা ভুলিলে চলিবে না, তাহাতে শুধু সঙ্কীর্ণতা ও অধিকার তারতম্যের বিবাদ বাড়িয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি করিলে বা অন্যের অপরীক্ষিত কার্য্য পদ্ধতি জোর করিয়া এদেশে চালাইলে চলিবে কেন ? আমাদের সনাতন আদর্শকে ছোট করা কেন ? হিন্দুদের যাহা দিবার আছে অপ্রত্যাশী হইয়া তাহারা তাহা দিন্। ধর্ম্ম, বিদ্যা, কলাজ্ঞান, সঙ্গীত, পূজা পার্ব্বণ, উৎসব আনন্দ—তাহাতে সকলকেই আসিতে দিন, অন্য সব কিছু আপনিই হইবে। সত্যই জয়যুক্ত হয়, চালাকী দ্বারা কিছুই হয় না।

বিশেষ করিয়া খাসীয়া জাতির কথা বলিতে গেলে এই মনে হয়, তাহাদের উন্মুখ জাতীয় জীবনে অপরিণত 'খাসীয়া সাহিত্য'কে পরিণত ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেই, বিশেষ ভাবে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ভাব রাশি যতদুর সম্ভব তাহাদের ভাষান্তরিত করিতে পারিলেই ভাবের দিক

দিয়া দুই জাতি এক হইয়া যাইবে। এই আদান প্রদান অনেক দিন ধরিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনে, এমন কি ধর্ম্ম ও বিশ্বাস ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষা ও ভাব কতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে, খাসীয়া ভাষার সহিত বাংলা ভাষার কতকগুলি শব্দের তুলনা করিলেই তাহা দেখা যাইবে। শতকরা পাঁচটি শব্দ বাংলা।

সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ	খাসীয়া শব্দ
ত্রাহি (সংস্কৃত)	Tra´i (ভগবান)
ধর্ম্ম	Dhormo
সাধন ভজন	Sadhon bhojon
সাধু	Sa´dhu
দোহাই (প্রার্থনা)	Dua´i
পূজা	Puja
মানে (মান্য করে)	Mane
কৃপাৎ (সংস্কৃত)	Kyrpa´d
শিখায়	Hika´i
পড়ে	Pule
শাস্ত্র	Sa´stro
খত (বই, দলিল)	Kot
ওস্তাদ	Ba Slad
পৃথিবী	Pyrthei
দুজক (নরক)	Dujok
স্থান (তীর্থ স্থান)	Stha´n
হক্ (সত্য)	Hok
পাপ	Pop
মিছা	Misha´
মঠ	Mot (সমাধি মন্দির)
ভরম (সম্মান কর)	Burom
নাম লওয়া (দীক্ষা লওয়া)	Shim (লওয়া) wa´m

সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ	খাসীয়া শব্দ
বিচার	Bisha´r.
সিং (ক্ষত্রিয়ের উপাধি বিশেষ)	Siim (রাজা)
মহাদেবী	Moha´dei (রাণী)
সতী (সাধ্বী)	Soti
হাতিয়ার	A´tia´r
পালঙ্ক	Pa´long
দাওয়াই (ঔষধ)	Da´wa i
দোকান	Duka´n
সুদ	Sut
খাজানা	Kha´jna
জটা	Jota´
মন (mind)	Mon
আত্মা	Mon Siim (রাজা)

উপসংহার

এই দুই জাতির ভিতরকার ভাব আদান প্রদানের এই স্বাভাবিক স্রোতোবেগ বর্দ্ধিত করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইবে। পূর্ব্বতন সম্প্রদায় সমূহের কার্য্যপ্রণালীর দোষগুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে এখন ধর্ম্মসমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাসমন্বয় অত্যাবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে যেরূপ ধর্ম্মসমন্বয় সম্ভব হইয়াছে, শ্রীবিবেকানন্দেও তেমনি শিক্ষা সমন্বয় মূর্ত্ত হইয়াছে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

(সমাপ্ত) ব্রহ্মচারী মহাচৈতন্য

স্বপ্ন

স্বপ্ন সম্বন্ধে আমরা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিম্নলিখিত কয়টি শ্লোক পাই—

১। বৈতথ্যং সর্ব্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্মনীষিণঃ।

অন্তঃ স্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা ॥ ২।১ মাণ্ডুক্যকারিকা ॥

মনীষীরা বলেন যে, স্বপ্নে যে সব ভাবের উদয় হয় তারা সমস্তই মিথ্যা। কারণ স্বপ্নে যে সব ভাব ফুটে ওঠে, তাদের শরীরের মধ্যে সংকুলান হতে পারে না।

২। অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেশান্ন পশ্যতি।

প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ২।২ মা, কা ॥

স্বপ্নে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে অতদূর গিয়ে দেখা বা শুনা অসম্ভব। এবং জাগার পর স্বপ্নে যে সকল জায়গা যখন দেখা যায়, তা থাকে না, তখন সেগুলো যে কল্পিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে স্বপ্নের দেশ-কাল ও জাগ্রত অবস্থার দেশ-কালের পার্থক্য দেখান হল। এর পরের শ্লোকে এইটিই ভাল করে দেখান হয়েচে—

৩। অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্।

বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্ ॥

স্বপ্নে যে রথটথ দেখা যায় তা শ্রুতি (authority) ও ন্যায় (Reasoning) দুদিক থেকেই যে মিথ্যা তা বোঝা যায়।

৪। বৃহদারণ্যক বল্‌চেন,—ন তত্র রথাঃ—সেখানে সত্যিকারের রথটথ থাকতে পারে না।

(৫) কারিকা ন্যায় দেখিয়ে বলছেন—

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তঃ অবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ মা, কা, ২।৬ ॥

যা আদিতে ছিল না, যা অন্তেও থাকে না সে জিনিষ মিথ্যা। স্বপ্নের ব্যাপার যখন আদিতেও ছিল না এবং পরেও থাকে না তখন সেটা মিথ্যা। যে মাছের ন্যাজা নেই এবং মুড়োও নেই সে মাছ মাছই নয়।

৬। কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি॥ স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি॥ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ৪।৩।৭।৮॥

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আত্মা কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, প্রাণের (করণ) মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে যিনি জ্যোতিঃ রূপে আছেন। যিনি বুদ্ধির মত হয়ে ইহলোকে এবং পরলোকে বিচরণ করে থাকেন—বোধ হয় যেন কখন ধ্যান করচেন কখন খেলা করচেন, তিনিই স্বপ্নে স্থূল জগতের কার্য্যকারণ ভাব ত্যাগ করেন। এই পুরুষই নিজেকে শরীর ভেবে জন্মান এবং পাপপুণ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং মৃত্যুকালে দেহ ছেড়ে তখনকার স্থূল জগতের পাপপুণ্য থেকে অব্যাহতি পান।

৭। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোক-স্থানং চ সংধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সংধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপি-ত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভ-বতি॥ ঐ।৯॥

এই পুরুষের দুটি স্থান—ইহ লোক এবং পরলোক। আর তৃতীয় স্থান হচ্চে এই দুয়ের যে সন্ধিস্থান (মাঝামাঝি অবস্থা), সেটাকে স্বপ্ন স্থান বলে। পুরুষ এই সন্ধিস্থানে দাঁড়িয়ে ইহলোক, পরলোক দুই দেখতে পান। তারপর পরলোকের জন্য যে যেমন সাধন সঞ্চয় করে সে সেই রকম সুখ দুঃখও ভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় দেহী জাগরণের

সংস্কারের খানিকটা গ্রহণ করে এবং দেহ সংজ্ঞাহীন করে বাসনাময় অপর অপর দেহ ও দৃশ্য রচনা করে। দেহীর বাহ্য বিষয়কে বাদ দিয়ে নিজের জ্ঞানের দ্বারা ঘুমন্ত সংস্কারকে প্রকাশ করার নাম স্বপ্ন। সুষুপ্তি বা অজ্ঞানে তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়ে থাকেন।

১০। ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তা পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা ॥ ঐ। ১০ ॥

বাস্তবিক স্বপ্নে রথ, অশ্ব বা পথ কিছুই নেই, তবুও ঐ সব নির্ম্মিত হয়। সেখানে আনন্দ, আমোদ প্রমোদ নেই, অথচ সে সব দৃষ্ট হয়। সেখানে ডোবা, পুকুর বা নদী নেই অথচ সেরূপ দেখা যায়। এ সমস্ত সৃষ্টির কর্ত্তা কে?—সেই পুরুষই সঞ্চিত সংস্কার দিয়ে সে সব তৈরী করেন।

১১। স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।

শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥১১॥

এক হংস জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি স্থানে একাকীই ভ্রমন করে বেড়ান। সেই স্বর্ণাভ পুরুষ চির জাগ্রত, সুষুপ্তিতেও তাঁর জ্ঞান শক্তি লুপ্ত হয় না। তিনি সুপ্ত সংস্কার দেখেন আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তিদের গ্রহণ করে জাগ্রত হন।

১২। প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।

স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ এক হংসঃ ॥১২॥

সেই হিরণ্ময় পুরুষরূপী হংস প্রাণেদের ওপর দেহের ভার দিয়ে ঐ নীড় থেকে বেরিয়ে যথেচ্ছা ভ্রমণ করেন।

১৩। স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপানি দেবঃ কুরুতে বহুনি।

উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্যন্ ॥১৩॥

সেই স্বতঃপ্রকাশ দেব ভালমন্দ নানা রকম রূপ ধরে কখনও যেন রমণীদের সঙ্গে আমোদ করেন, বয়স্যদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করেন, কখন বাঘ দেখে ভয় পান—এরকম নানা জিনিষ তৈরী করে থাকেন।

১৪। আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি। তন্নায়তং

বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি, যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি, তানি সুপ্ত ইতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ॥১৪॥

সকলেই আত্মার চেষ্টাই (manifestation) দেখতে পায়, স্বরূপ কেউ দেখে না। বৈদ্যেরা বলেন, ঘুমন্ত লোককে হঠাৎ জাগিও না, কেন না আত্মা যে যে ইন্দ্রিয়কে যে যে জায়গা থেকে তুলে নিয়ে এসে ঘুমিয়েছিলেন, হঠাৎ জাগার জন্য যদি সেই সেই জায়গায় তাদের না পাঠাতে পারেন তা হলে দেহে অপ্রতিক্রিয় রোগ জন্মায়। জেগে যা দেখা যায় স্বপ্নে তারই সংস্কার দেখা যায়। এই সময় আত্মা বাহিরকে বাদ দিয়ে স্বয়ং জ্যোতিঃ হন।

১৫। স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ। পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্য-নন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি ॥১৫॥

তিনি সম্প্রসাদ (নিদ্রার) কালে রমণ, পরিভ্রমণ, পাপপুণ্য, সুখ, দুঃখ ভোগ করে বিলোম ক্রমে জাগ্রৎ ভূমিতে ফিরে আসেন। সে সময় তিনি যা কিছু দেখেন তাতে তিনি লিপ্ত হন না, কারণ পুরুষ স্বভাবতঃ অসঙ্গ।

১৬। স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥১৬॥

পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করে বুথানের জন্য ফের নিজ নিজ সৎ বা অসৎ বুদ্ধি, স্ত্রী বা পুরুষ শরীরে ফিরে যান। স্বপ্নে যা দেখেন পুরুষ সে অনুযায়ী ব্যবহার করেন না।

১৭। স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥১৭॥

তিনিই ফের জাগ্রৎ অবস্থায় পরিভ্রমণ, রমণ, পাপ, পুণ্য ভোগ করে স্বপ্নের অনুযায়ী বুদ্ধি ও শরীর প্রাপ্ত হন।

১৮। তদ্‌যথা মহামৎস্য উভেকূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবএবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ ॥১৮॥

একটা বড় মাছ যেমন নদীর এপার ওপার করে, পুরুষও ঠিক তেমনি একবার স্বপ্নে একবার জাগ্রৎ ভূমিতে বিচরণ করেন।

১৯। তদ্‌যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥১৯॥

একটা চিল যেমন আকাশে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নিজের বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করে, তেমনি পুরুষও জাগ্রৎ ও স্বপ্নে বিচরণ করে ক্লান্ত হয়ে সুষুপ্তিকে অবলম্বন করেন। সেখানে কেউ আর কামনাও করে না, রূপও দেখে না।

২০। তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাণিম্না তিষ্ঠন্তি ; শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণাঃ। অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি। যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে, সোঽস্য পরমো লোকঃ ॥২০॥

একটা কেশের সহস্র ভাগের এক ভাগের মত সূক্ষ্ম হিতা নামে অনেক নাড়ী আছে। সাদা, হলদে, নীল, লাল ও সবুজ রসে এরা পূর্ণ। এই খানেতেই পুরুষ স্বপ্ন দেখে। মারচে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হাতীতে তাড়া করচে, গর্ত্তেপড়ে যাচ্ছে। ভুল হলেও সব বর্ত্তমানের মত ঠিক ঠিক বলে বোধ হয়। কখনও মনে করে আমি দেবতা, কখনও রাজা। আবার সুষুপ্তিতে কখনও বোধ হয়, আমিই সমস্ত। এই হচ্চে পুরুষের শ্রেষ্ঠ লোক।

২১। তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহত পাপ্মাভয়ং রূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্ ॥২১॥

আত্মার এই সৌষুপ্ত রূপই অতিচ্ছন্দা (কামনাহীন) নিষ্পাপ ও ভয় বিরহিত রূপ। প্রিয়ার সঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে যেমন পুরুষ বাহ্যান্তর জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় সেইরূপ পুরুষও সৌষুপ্ত অবস্থায় গেলে বাহ্যান্তর জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। ঐ অবস্থাই হচ্চে পুরুষের আপ্তকাম শোকরহিত রূপ।

২২। তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততিশেতে (বৃ, ২।১।১৯)

সুষুপ্তি কালে সেই সকল নাড়ীর দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে গুটিয়ে নিয়ে এসে পুরুষ পুরীতৎ নাম্নী নাড়ীতে (Medulla oblongata) শয়ন করেন।

২৩। যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ন নিদর্শনাৎ (ছা, উ, ৫।২।৯)

যদি স্বপ্নে কাম্যকর্ম্ম বিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তা হলে জানবে সেই স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি হবে।

২৪। তথা পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি।

স্বপ্নে যদি কাল দন্তযুক্ত কাল পুরুষ দেখে তাহলে তার মৃত্যু নিকটে বুঝতে হবে (স্বপ্নাধ্যায়)

২৫। কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি খরযানাদীন্যধন্যানি

(স্বপ্নাধ্যায়)

স্বপ্নে হাতী চড়া শুভ, গাধায় চড়া অশুভ।

এখন দেখা যাক আচার্য্য শংকর এই শ্রুতি বাক্য সকল কি ভাবে তাঁর ভাষ্যের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। জীবের দেহান্তর বা সংসরণ বর্ণন কালে তিনি স্বপ্নতত্ত্ব বিচার করেছেন। স্বপ্ন স্থান হচ্ছে সুষুপ্তি ও জাগ্রতের মাঝামাঝি অবস্থা এ জন্য শ্রুতি একে সন্ধ্যা আখ্যা দিয়েছেন। আমরা রোজ স্বপ্ন দেখি কিন্তু স্থূল দেহ থাকায় আবার জাগ্রতে ফিরে আসি। কিন্তু মৃত্যুর পর স্থূল দেহ না থাকায় স্বপ্ন স্থানেই তাকে বহুকাল ধরে অবস্থান করতে হয় যত দিন পুনরায় স্থূল শরীর সে না পায়। এই সন্ধ্যা স্থানেই জীব স্বর্গ নরক ভোগ করে। শাস্ত্র বলচেন স্বর্গ ও নরক উভয়ই ভোগস্থান, সেখানকার কর্ম্মফল জীবকে ভোগ করতে হয় না, যেমন স্বপ্নের কর্ম্মফল আমাদের ভোগ করতে হয় না। কেন না জাগ্রৎ অবস্থায় জীবের কর্ম্ম স্বেচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু স্বাপ্ন কর্ম্মের ওপর জীবের কোন হাত নেই, সে সেখানে অস্বতন্ত্র। জাগ্রৎ ভূমির সূক্ষ্ম বাসনা সকল সেখানে আপনি স্ফুরিত হয়—ভালমন্দ স্বপ্ন দেখা না দেখার ওপর জীবের ইচ্ছা শক্তির একটুও আধিপত্য নাই। জেগে মানুষ ইচ্ছা-পূর্ব্বক যা ভাবে বা করে স্বপ্নে অবশ হয়ে জীবকে সেই রকমের ভাবতে

বা করতে হয়। মৃত্যুর পরও সারা জীবনের ভাব ও কর্ম্ম জীবকে অবশ করে পরিস্ফুট হয় এরই নাম—স্বর্গ নরক ভোগ। এক ঘণ্টার স্বপ্নে যেমন আমরা অতি দূর দেশে গমন করি বা বহুবর্ষ জীবিত থাকি মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ভোগও ঠিক সেই ভাবে হয়ে থাকে। এবং জাগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন ঘটিত স্বর্গ নরকাদি মিথ্যা।

পারমার্থিকের তুলনায় জাগ্রৎ ভূমিতে যে ব্যবহারিক রাজ্য আমরা দেখি সেটা মিথ্যা। আবার ব্যবহারিক জগতের তুলনায় স্বাপ্ন জগৎ আরও মিথ্যা।—কেন? আচার্য্য শংকর বলচেন (ব্রহ্মসূত্র, ৩ অধ্যায়, ২ পাদ, ১—৬ সূত্রের ভাষ্য দেখ) ব্যবহারিক সত্য বস্তুর যে ধর্ম্ম সে গুলো আমরা স্বপ্নে দেখতে পাই না। সে গুলো হচ্চে দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধা রাহিত্য। স্বপ্নে রথাদি থাকবার দেশ (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা) থাকা সম্ভবপর নয়। অল্প পরিসর স্থানে বহুপরিসর বস্তু থাকা অসম্ভব। যদি বলা যায় সূক্ষ্ম শরীর দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে, তা হলে যে লোকের কুরু দেশে শুয়ে পাঞ্চালের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙ্গে যায় সে পাঞ্চালেই থেকে যেত। তা ছাড়া বাইরে গিয়ে দেখাটা যে ভুল তার আর একটা কারণ পাঞ্চাল সম্বন্ধে সে যা দেখলে প্রত্যক্ষতঃ তা কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রুতিতে যে "রথ নির্ম্মান" বা "বহির্গমনে"র কথা আছে, সে সব আলঙ্কারিক অর্থাৎ 'যেন' (ইব)। অতএব স্বপ্নে দৈশিক বস্তু বিপর্য্যয়গ্রস্ত ও অস্পষ্ট।

স্বপ্নে কালেরও বিরোধিতা দেখা যায়। রজনীতে স্বপ্ন দ্রষ্টার ভারত-বর্ষেই দিবস দর্শন হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত বর্ষ অতিবাহিত হয়। এবং স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর নিমিত্তও নাই, সেখানে উপকরণ কোথায় থাকবে, আর উপকরণ পেলেই বা কি হবে, করণ বা ইন্দ্রিয় সকল তখন ত সুপ্ত থাকে। আর অত অল্প সময়ের মধ্যে রথ তৈরীই বা হবে কি করে। তা ছাড়া স্বাপ্নিক-সৃষ্টি সংকল্প পূর্ব্বক হয় না। সংকল্প পূর্ব্বিকা হলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন দর্শন করত না। কে নিজের অনিষ্ট সংকল্প করে?

তবে আচার্য্য শংকর একটা কথা স্বীকার করেছেন। তা আমরা

পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি (২২)। মন্ত্রের দ্বারা, দেবতানুগ্রহের দ্বারা ও ঔষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দেখা যায় তারও অনেক সত্য হয়ে থাকে—একথা শংকর মানেন।

আগামী বারে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা স্বপ্ন সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করেচেন তার আলোচনা করবার ইচ্ছা আমাদের রইল।

বাসুদেবানন্দ

রাগমালা

রাগ-দীপক—চৌতাল

(ধ্রুপদ)

বাদীস্বর "গ"

সমবাদীস্বর "স"

অনুবাদীস্বর "ধ"

(অস্থায়ী)

২ ৩ + ০ ১ ০ ২ ৩ +

গ গ গ গ ঋ স ঋ গ ঋ স ন ধ ধ ন ন স স ঋ গ গ গ ম প

না ০ দ, ০ পা ০ র, ০ ০ কি ন হু, ন, ০ ০ পা য়ো, ০ ০ ০ র ০ চ,

০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১ ০

ধ ন ধ ধ প ম ম প ধ ম গ ঋ ঋ গ গ ম ধ ধ প গ ঋ স

০ প ০ চ, ০ ন র, ০ স্ব ন ম, ০ ০ ০ ০ গ বাঁ ০ য়ো ০ ০ ০

(অন্তরা)

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১

প প প প ধ ধ ধ র্স র্স র্স র্স র্স র্ঋ র্ঋ র্গ র্গ র্গ র্ঋ

গ গ ন, ব ন্দ, প ব ন, ম ০ ন্দ, ০ স প্ত, সু র ণ, ছা

০ ২ ৩ + ০ ১ ০

ন ন ধ ধ ন ন প প ম প ধ ম প গ ঋ ন স ঋ

০ ০ য়ো, ০ ০ ০ ০ ০ প ট দে, দী প ক, গা ০ য়ো ০

(সঞ্চারী)

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০

স ন স ধ নধ ধ প প ধ ন ধধ ন স ঋ ঋ ঋ স ন ঋ

কা ০ হে ০ কো, দী ব রো, কা হে কী, বা তী, রূ পে কী, দী ব রো,

১ ০ ২ ৩ + ০ ১ ০ ২ ৩

স ন সগ ঋ ঋ স স স নধ ধ ন স ঋ গ ম প ধ ন ধ ন প

সো নে কী, বা তী, ই ক ই স, মূ র ছ না, জ্যো ত, দি ০ ০ খা ০ য়ো, ০

(আভোগ)

+ ০ ১ ০ ২ ৩ + ০ ১ ০ ২ ৩

প প ধ ধ ধ ন র্স র্স র্স র্গ র্গ র্ঋ স র্স ম র্স র্ঋ র্স ধ নি ধ প মধ গ গ

আ রো হী, অ ব রো হী, বা ই শ, সু র ত, প্র কা •শ, না য় ক, ০ ০ বৈ০জু০

+ ০ ১ ০

ধ ন ম নি ধ গ গ স ঋ

দী প ক, ০ ০ গা ০ য়ো ০

রাগদীপক— ত্রিতালী

(অস্থায়ী)

\+ ৩ ০ ১ ২ ৩
প ম ধ গ গ ঋ ন ন ধ ন প ধ ন স ঋ গ গ গ ম গ ঋ ঋ স ন
দ ধি য়া কে, ভূঁ থ ল, সু ঘ র, ক ন হ ই য়া, গ হ ল, ০ অ চ র বা,

০ ১
স ঋ ঋ স গ ম প ধ ন ধ
মো ০ ০ ০ র ০ হো ০ ০ ০

(অন্তরা)

\+ ৩ ০ ১ ২
প প প ধ ধ ধ স স স ঋ ঋ ন ন স ঋ স ন ন ঋ ঋ স স
লে ক র, ০ চী র, ক দ ম, প র, ব স ঠী, ০ ০ হ ম, জ ল, মাঁ হ,

৩ ০ ১
গ গ প ধ ন ধ প ম গ ঋ ঋ গ ম প ধ
উ ঘা রী, ০ ০ হো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

(২য় অন্তরা)

\+ ৩ ০ ১ ২
স স স ঋ ঋ গ গ স ন ধ স ঋ গ ঋ গ গ গ গ ধ ম প ধ ন
ন ব ক. চো ব, মে বে, দে. ০ ০ ডা লো, ০ ০ মো হ ন, ০ হো ০ ০ ০ য়,

৩ ০ ১
ধ স ঋ ঋ স গ প প প ধ ন ধ প ধ
জা ০ ০ উঁ, জ ল সে, ০ স্থা ০ রী, ০ হো ০

ক্রমশঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত রত্নাকর)

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

(শেষার্দ্ধ)

৮ই জুলাই, ১৯২০ সাল, কাশী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে স্বামিজীর খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল—কোনরূপ খারাপ ভাবে নয়, অমনি— ; আর একবার দেখতে ইচ্ছা হল। সেবার দেখ্‌লেন—কোথায় সুন্দরী! একটা বাঁদরের মুখ! একটা Higher power (উচ্চতর শক্তি) সর্ব্বদা রক্ষা করছে আর কি। আর একবার তিনি বলেছিলেন—তিনি স্বপ্নেও কখনও স্ত্রীলোক দেখতেন না, একদিন কিন্তু স্বপ্ন দেখেন একজন স্ত্রীলোক, তার মাথায় ঘোমটা দেওয়া। দেখে তাকে খুব সুন্দরী বলে বোধ হল। তিনি তার ঘোমটা তুলে তাকে দেখতে গেলেন। যাই ঘোমটা তোলা অমনি দেখেন ঠাকুর! স্বামিজী লজ্জায় মরে গেলেন! ভগবান রক্ষা না করলে কি আর রক্ষা পাবার জো আছে? তাঁর কৃপায় যাদের প্রথম থেকেই সংস্কার দাঁড়াতে না পারে—তিনি যাদের বাঁচিয়ে নেন, 'অহো ভাগ্য' তাদের, তারাই বাঁচে। নিজের চেষ্টায় এর হাত থেকে বাঁচা যায় না। তবে ঠাকুর বলতেন, "তোর যদি আন্তরিক হয়, তবে মা সব ঠিক করে দেবেন।" আন্তরিক হওয়া চাই—মনে একখানা মুখে আর একখানা হলে হবে না। পরের কাছে ভাল সাজা যায়, কিন্তু নিজের ভিতর কি আছে তা নিজের কাছ থেকে লুকোবার জো নেই। সেই ভিতর থেকে যদি চাওয়া যায় তবে তিনি শোনেনই শোনেন। কিন্তু ন্যাকার মত হলে চলবে না। বীরের মত জোর করে বল—আর করব না। তবে ত তিনি সাহায্য করবেন।

এক রাজার গল্প আছে। রাজা ভারি স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁর একজন বন্ধু একদিন সে বিষয়ে বলাতে তিনি সেদিন থেকে সামলে

নিতে চেষ্টা করলেন। রাজা অন্তঃপুরে আসলেন, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া রাণীর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না—রাজা ভারি গম্ভীর। রাণী সব বুঝলেন। রাজা খাচ্ছেন। রাণীর পোষা বিড়ালটা এসে রাজার পাত থেকে খাচ্ছে। রাজা তাকে মেরে তাড়াতে চেষ্টা করছেন, সেটা কিন্তু আবার আসছে। তখন রাণী এসে রাজার কাণ ধরে বল্‌লেন, "ওকে আগে অনেক আস্কারা দিয়েচ, এখন কি আর তাড়ান সম্ভব?" আগে আস্কারা দিলে পরে আর তাড়ান যায় না। রাশ নিজের কাছে রাখতে হয়,—রাশ কিছুতেই ছেড়ে দিতে নেই। রাশ ছেড়ে দিলেই আর উপায় নেই। স্বামিজী বলতেন, "Ready to attach and ready to detach any minute" (কোনও বিষয়ে লাগতেও যেমন, ছাড়তেও তেমন,—প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকা চাই) আমরা কাজ করতে গিয়ে তাতে জড়িয়ে যাই, আর সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি নে। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। যখন খুসী বেরিয়ে যাব —সব পড়ে থাকবে—কিছুই ত আর আমার নয়। ঠাকুরের দেখ— হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বর হতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। দরোয়ান এসে ঠাকুরকে বলছে, "আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে।" ঠাকুর বলছেন—"সে কিরে? আমাকে নয়, হৃদুকে।" সে বলছে—"না, বাবুর হুকুম, তাকে ও আপনাকে দুজনকেই যেতে হবে।" বস্, অমনি চটিটি পরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। বাবু নহবত থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে পায়ে হাতে ধরলেন, "ওকি? আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনাকে ত আমি যেতে বলিনি।" ঠাকুর কিছু না বলে ফিরে এলেন। দেখ্‌লে? তাঁর ত্যাগে ঝাঁজ নেই। আর আমাদের ত্যাগে কত ঝাঁজ! আমরা হলে কত কি বলতাম। তিনি কিন্তু কিছুই বল্‌লেন না—যেতেও যেমন, আসতেও তেমন।

ঠাকুর যা কাপড় পরতেন!! একদিন একজন ত তাঁকে বাগানে দেখে মালী মনে করে বল্‌লে, "ওরে, ও গোলাপ ফুলটা তুলে দেত! তিনি অমনি ফুলটি তুলে দিলেন। কিছুদিন বাদে সেই লোকই জানতে পারল—ইনিই পরমহংস। তখন লজ্জিত হয়ে বলছে—"আঃ,

আপনাকেই সেদিন ফুল তুলতে বলেছিলাম।" ঠাকুর বলতেন—"তা কি হয়েছে? কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।" বোঝ একবার। গোবিন্দ! গোবিন্দ! আর স্বামিজীর কথা দেখ। স্বামিজী যখন দ্বিতীয় বার নিউইয়র্ক গেলেন, তখন কা—সেখানে ছিল। সে স্বামিজীকে আসতে দেখে তাঁকে বল্লে "আপনার জায়গা, আপনি এবার নিন্।" একবার, দুবার—স্বামিজী তার কথায় কাণ দিলেন না। কা—আবার সে কথা বল্‌তে তিনি বল্লেন—"তোকে দিয়ে দিয়েছি। আমার জন্য সারা দুনিয়া পড়ে আছে।" কি ত্যাগ স্বামিজীর! সব গুরুভাইদের দিলেন—চেলাদের নয়। প্রথম ট্রাষ্টিদের ভিতর দেখবে সব গুরুভাইরা—একটিও চেলা নেই। তিনি নিজের টাকায় খেতেন। বলতেন—"সব দিয়ে দিয়েছি।" আমায় একবার লিখেছিলেন, "সব তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।" কি অদ্ভুত পুরুষ! তাঁর influence (প্রভাব) যদি যেতে ওদেশে, তবে দেখতে পেতে। তিনিই বল্‌তেন, "পাশ্চাত্য দেশে আমার কাজ বেশী হবে। ওখান থেকে ভারতে তার ধাক্কা লাগবে।" একদিন মঠ থেকে রেগে বেরিয়ে গেলেন, বল্লেন, "তোরা সব ছোটলোক, তোদের সঙ্গে থাকতে আছে? তোরা সব আলু পটল শাক পাতা নিয়ে ঝগড়া করবি।" কিন্তু শেষটা করলেন কি? সেই ছোটলোকদেরই সব দিয়ে গেলেন। আর একদিন ভারি চটে গেছেন, বল্‌ছেন—"একাই যাত্রা করতে হল—বাজান গাওয়া সব একাই করতে হল, কেউ কিছু করলে না।" আমাদের ত গালাগাল দিচ্ছেনই—ঠাকুরের উপরও ভারি অভিমান হয়েছে, তাঁকেও গাল দিচ্ছেন, "পাগলা বামুন, মুখ্যু—এর হাতে পড়ে জীবনটা বৃথা গেল।" স্বামিজীর এসব কথা শুনে আমরা ভারি দুঃখিত। তার পরই বলছেন, "তবে কি জান? যেটা দেওয়া গিয়েছে, সেটা ত আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। অনন্ত জীবনের একটা না হয় পাগলা বামুনের হাতে দিয়েই নষ্ট হল।" বোঝ একবার ভাব। আমাদের প্রাণ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এসব কথা জেনে রাখা ভাল। কোথায় থানা, কোথায় থাদ,

কোথায় কাঁটা, সব জানা থাকলে তা থেকে বেঁচে চলা যায়। ঠাকুর কত কি জানাতেন। গিরীশবাবু একবার ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু। খারাপ বিষয়েরও।" তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, "না গো, তা নয়। এখানে সংস্কার নেই।" করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানার ভেতর ঢের তফাৎ। আর করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখে শুনে জানাতে সেটা হয় না।

গোপাল

ধেনু চরাইতে, রাখালের সাথে,
নীলমণি যায় চলি।
চরণে নূপুর, বাজিছে মধুর,
রুণু ঝুনু রুণু বলি॥
শিখী পুচ্ছ শিরে, বামে হেলে পড়ে,
নাচিয়া গোপাল চলে।
আহা কি সুন্দর, গলে মনোহর,
বন ফুল মালা দোলে॥
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝল মল,
মেঘেতে বিজলী খেলে।
চরণ ফেলিছে, যেন গো ফুটিছে,
শতদল ধরাতলে॥
পীতবাস পরি, বাজায়ে বাঁশরী,
গোপাল চলিছে পথে।

গেল নীলমণি, যশোদা বাছনি,
শ্রীদাম সুদাম সাথে ॥
নয়ন যুগল, যেন গো কমল,
তাহে কাজলের রেখা।
অতি অপরূপ, দেখিয়া সে রূপ,
দায় হলো ঘরে থাকা ॥
যশোদা জননী, কেমনে না জানি,
গোপালে পাঠাল বনে।
ননীর পুতলী, ব্যথা পাবে বলি,
সে কথা হলো না মনে ॥
দেখি আঁখি ভরি, সেরূপ মাধুরী,
নয়ন ফিরাতে নারি।
ছাড়িয়া তোমায়, কেমনে বা হায়,
গৃহেতে যাইব ফিরি ॥

শ্রীসুনয়নী দেবী

মাধুকরী

এখন দেখিতেছি ভদ্রঘরের মেয়েরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নৃত-গীত ও অভিনয় করিবেনই; সাধারণের সমক্ষে বাহির হইয়া নাচ গান ও অভিনয়ের আসর জমাইবেনই; তাঁহারা সম্মানভাজন অভিভাবক তুল্য বৃদ্ধ ব্যক্তিরও নিষেধ বাণী শুনিবেন না। জাতি যখন ভোগ বিলাসের পিচ্ছিল পথে দিগ্‌বিদিক শূন্য হইয়া প্রধাবিত হয়, তখন পুনঃ পুনঃ পতনে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমাদেরও সেই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে।

কোনও সদনুষ্ঠানের সাহায্যার্থ নহে—রাজবন্দীদিগের সহায়তার জন্য নহে—নিছক সখ বা খোস খেয়ালের বশে সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মেয়েরা এম্পায়ার থিয়েটারে 'সীতা' নাটকের অভিনয় করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। * * *

ইতিপূর্ব্বে অজুহাত ছিল—সদনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্যের জন্য সাধারণের সমক্ষে থিয়েটারে নাচ গান বা অভিনয় করিলে ভদ্রঘরের মেয়েদের লজ্জাশীলতার হানি বা কোনও দোষ হয় না। কিন্তু এবার 'সীতা' অভিনয় যখন কোন সদনুষ্ঠানের জন্য হইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় নাই, তখন কি আমরা বুঝিব—এই নাচ গান অভিনয় অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অথবা কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য? কিম্বা কলা-কৌশল প্রদর্শনের জন্য?

বাংলার সম্ভ্রান্তঘরের পুর-মহিলারা যদি এইরূপে প্রায়ই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে থাকেন, তাহা হইলে সখের খাতিরে কাহাকেও নটীবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিলে আমরা বিস্মিত হইব না। কারণ, সকল বিষয়ে বিলাত যখন তাঁহাদের আদর্শ হইয়াছে, তখন এবিষয়েও বিলাত আমেরিকাই তাঁহাদের আদর্শ যে হইবে না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে না করিয়া থাকিতে পারি।

প্রতীচ্যের সংঘর্ষে ভারত-নারীর উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। এতদিন আমাদের বাহিরটাই ভাঙ্গিয়াছিল এইবার ঘরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। নারীত্বের মহনীয় আদর্শ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এম্পায়ার থিয়াটারে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের মহিলারা বঙ্গনারীর সম্মান, মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম প্রতীচ্যের আদর্শের দুয়ারে বলি দিয়াছেন।

আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া এম্পায়ারে বিশ্বসম্মিলনী কর্তৃক 'সীতা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। এই অভিনয়ের উদ্যোক্তাগণকে আমরা কয়েকটি কথা বলিতে চাই, এইরূপে সমাজের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট মহিলাদিগকে লইয়া এই ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করাটা কি ঠিক হইতেছে? আপামর সাধারণের সম্মুখে—ইংরাজ, চীনা, জাপানী, মুসলমান, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির সম্মুখে অর্থের বিনিময়ে এরূপ ভাবে নিজেদের স্ত্রী, ভগিনী

কন্যাগণকে নাচাইয়া তাঁহাদের শালীনতা ও সম্ভ্রম নষ্ট করিতে এই মহাপুরুষদিগের প্রবৃত্তি কি করিয়া হইল, আমরা বুঝিতে পারি না।

—ভগ্নদূত—

'সঞ্জীবনী' ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বহু ভদ্রঘরের ঝি বৌয়ের নাট্যাভিনয় দেখিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শীলতাহানির উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যাধি বিনাশের চেষ্টা করিতেছেন। 'সঞ্জীবনী' "কবিসম্রাট" রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে "ঋতুরঙ্গের" উন্মাদনাকর নৃত্য গীতের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া যাহা বলিতেছেন, বাস্তবিকই তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি প্রায়ই ঘরের ও পরের নারী লইয়া নাটকাভিনয় করাইতেছেন। বাস্তবিকই ভদ্রঘরের নারীদের নাটকাভিনয় কতদূর শীলতাযুক্ত তাহা কি তাঁহাদের ন্যায় মহা মনস্বিগণ চিন্তা করেন না? 'সঞ্জীবনী' ঠিকই বলিয়াছেন, যুবক যুবতীর এই প্রকার সমাবেশ, পর পুরুষকে 'স্বামী' সম্বোধন, অন্যের স্ত্রীকে 'পত্নী' সম্ভাষণ, কিরূপ রুচিসঙ্গত ও শীলতার পরিচায়ক তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ভদ্রঘরের ঝি বৌয়ের হাব, ভাব, বেশ বিন্যাস, রূপ পারিপাট্য দেখিবার জন্য খুব ভিড় হয়। 'সঞ্জীবনী' এই সমুদয় উল্লেখ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। দেখা যায়, কলিকাতার রোগ কিছুদিন পরে মফঃস্বলেও দেখা দিবে। কে জানে জনসাধারণের হিতকামনার ধূয়া ধরিয়া মফঃস্বলেও এ রোগ সংক্রামিত হইতে বিলম্ব হইবে কি না? মফঃস্বলে ত বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি লাগিয়াই আছে, সাধারণের সাহায্য কল্পে এরূপ ভদ্রঘরের ঝি বৌয়ের থিয়েটার হইলে একদিনেই সহস্র সহস্র টাকা উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে কি ভীষণ মহামারী তাহা চিন্তা করাও যায় না। ইহা প্রশ্রয় পাইলে অচিরেই সমাজ শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইবে। দেশ মহা নরকে পরিণত হইবে।

—মেদিনীপুর হিতৈষী—

সমালোচনা

সনাতন ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ। স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়। মূল্য চারি আনা।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী ও অনধিকারী কাহারা ইত্যাদি বহুজন জ্ঞাতব্য তত্ত্ব শাস্ত্রসহায়ে আলোচনা করিয়া স্বামী ভূমানন্দ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি গবেষণা মূলক, গবেষণায় নূতনত্ব আছে। বর্ত্তমান কালে বাংলাদেশে যখন নানা কারণে হিন্দুসমাজের ভিতর পরিবর্ত্তনের বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন বাংলার বুধ-মণ্ডলীকে এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিতে এবং উহার সিদ্ধান্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

সংঘ-বার্ত্তা

স্বামী পূর্ণানন্দ বিগত ৩১শে চৈত্র মহা বিষুব সংক্রান্তির দিন প্রাতে বাগবাজার মঠে (উদ্বোধন কার্য্যালয়) শরীরত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের চিরসান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান করিয়াছিলেন। এই স্বাধ্যায় ও তপস্যানিষ্ঠ সন্ন্যাসীর মহাপ্রয়াণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন একজন শান্ত সাধু হারাইলেন।

দুর্ভিক্ষ

আমরা বাঁকুড়া জেলার নানাস্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়াছি ; এবং কর্ম্মী পাঠাইয়াছি।

আষাঢ়, ৩০শ বর্ষ

কথাপ্রসঙ্গে

বন্ধু, ছেলে বেলায় আমি একটা সংস্কৃত শ্লোক খুব আওড়াতুম—কুর্ম্ম স্তারক-চর্ব্বণং ত্রিভুবনং উৎপাটয়ামি বলাৎ কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্ রামকৃষ্ণদাসাঃ বয়ম্, আর তুমি তার প্রত্যুত্তরে একটা কবিতা বলতে মনে আছে—

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে,
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্য সম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

তখন মনে হত তুটোর অর্থ একই—তুটোই বুঝি দেশ কালের কারাগার ভেঙ্গে মুক্ত হবার তুরন্ত উচ্ছ্বাস। কিন্তু ভায়া, এখন দেখছি প্রথমটার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হতে মুক্তির অভিযান, আর দ্বিতীয়টা হচ্চে ইন্দ্রিয়ের একাধিপত্য স্বীকার; ইন্দ্রিয় যখনই যা বলবে তাই গোলামের মত পালন করা; সংযমের হোমাগ্নি ভোগের আবিল জলে নিবিয়ে দিয়ে একটা জঘন্য পঙ্কিলতার সৃষ্টি করে তার মধ্যে গড়াগড়ি দেওয়া। কারু কিছু বলবার অধিকার নেই—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর কেউ হাত দিতে পারবে না। আসল কথা

ইন্দ্রিয়কে এমন একটা দুর্দ্দান্ত tyrant করে তুলতে হবে যে সে কারুর বাধা বিঘ্ন না মেনে একেবারে যথেচ্ছাচারিতার চরম করে তুলবে।

এ ভুলের কারণ কি জান ভায়া?—আমার cultureটা বড় কম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে জান, Culture is the faculty of making distinctions"? শুধু আমার নয় আমার অনেক বন্ধু বান্ধবদেরও নেই। সেদিনকারের বৈঠকে কি ভীষণ তর্ক হয়ে গেল জান ত। দাদা বলেন শিশু বালিকার মুখে ভগবানের নাম শোনাও যা আর ভরাযুবতীর খেম্‌টা নাচও তাই, boxing, fencingএর অঙ্গ চালনাও যা, আর কুল-কন্যা-বধুর দেহের art দেখানও তাই। ধ্রুপদ গানই বল আর খেয়ুড়ই বল, সংকীর্ত্তন ও ঝুমুর নাচ ও সব একই জিনিষ। তিনি আরও বল্লেন গঙ্গা স্নানে যদি দেহ দেখান যায় তবে রঙ্গমঞ্চে দেহ আদুড় করে অঙ্গের সৌষ্ঠবতা দেখান যাবে না কেন? তাঁর ভীষণ যুক্তির খরশরজাল মুখে আমরা সব তুলোর মত উড়ে গেলুম। আমরা যখন অধোবদন হয়ে বসে আছি, তিনি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বল্লেন, 'তোরা সব Indian Hindu, তোরা কি European Hinduদের সঙ্গে লড়ে পারিস।

আমার আনাতোল ফ্রাঁসের গোটাকতক কথা মনে পল। কিন্তু দাদাঠাকুরের ভয়ে "উত্থায় চ হৃদি লীয়ন্তে।" কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে সাহস করে কাগজে তা লিখে ফেল্লুম, যা থাকে বরাতে।

"No, they are not hoaxers. They are ecstatics. two or three of them have had a seizure, and the whole coteric is raving, for nothing is more contagious than certain nervous states.

"I understand why the adepts of the new art should love their disease and even pride themselves on it; and even if they have some little contempt for those who are not refined by so rare a nervous affection, I

shall not complain. It would be bad taste to reproach them for being ill."

ঐ যবন ভাষায় যা লেখা গেল তার মোদ্দা কথাটা হলো দাদার nervousness ভয়নাক বেড়ে গ্যাছে এবং সে রোগ আরও দশজনে ছড়িয়ে পড়ায় সকলে মিলে দাঁত মুখ খিঁচুচ্চে এবং আবোল তাবোল চিৎকার করে পুলিস ডাকবার মত করে তুলেছে। আনাতোল বলছেন, এঁদের বোক না আরও বেড়ে যাবে। বরং মিষ্টি কথা এবং ওষুধ বিসুদ দিয়ে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা কর। রোগ হলে কি গাল দিতে আছে বরং আরও বেশী যত্ন নিতে হয়।

ভাল মন্দ পৃথক করে বাছা মস্ত শক্ত ব্যাপার। এত বড় যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরও মনে কত গুলো বিরোধী ভাবের সংঘর্ষ উঠেছিল একবার ধারণা কর—

"একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ বাহন, শত সূর্য্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতি-প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতি যোগে সর্ব্ব শরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব কাহিনী।

"একদিকে জড় বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বল সঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয় সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপর দিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্ব দেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

"সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতাসাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান, উপস্থিত হইতেছে।

"একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্য সমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান।

"পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায় —ত্যাগ।

"বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বলিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্র মুগ্ধবৎ শুনিতেছে, "ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।"

"একদিকে নব্য ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত; কারণ যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ তাহা আমরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত, তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

"একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্য সম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?"

"একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপর দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে সাবধান!"

ইন্দ্রিয় সংযম কোরে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ কোরে যদি

বিচার কর এবং সেই বিচারে যা ভাল মন্দ স্থির হবে তা আমরা মাথা পেতে নিতে বাধ্য। আর যদি বল,—

"পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল, পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান, পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে—মূর্ত্তি পূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি? পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্য বিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।"

——এ রকম শ্বেতাঙ্গ বাক্যরূপ বেদ বা অনুকরণ-প্রিয়তা আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা জানি কদাচারে ও কুঅভ্যাসে দেশ ভরিয়া আছে কিন্তু সে সব দূর করবার জন্য আমাদের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বেদ ও তীক্ষ্ণধী মনস্বিগণ আছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বহুকালের সঞ্চিত অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এবং বর্ত্তমান যুগের অভিজ্ঞতা নিয়েই আমরা সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হব। বিজাতীয় জঘন্য রীতি নীতি আমরা কিছুতেই দেশের মধ্যে ঢোকাতে দেব না, বা অপর জাতির জুকারলেহীদের কিছুতেই সভ্য বলে স্বীকার করব না।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(১১)

ইংরাজীর অনুবাদ

১৪ই জুলাই—১৮৯৬

প্রিয় ডাঃ ন——

* * * কথাটা হচ্চে এই—কোন বিদেশীই ইংরেজের মত ইংরেজী লিখতে পারে না; খাঁটি ইংরেজীতে ভাবের যা বিস্তার হয় নকল ইংরেজীতে তা কখনই হতে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত * * *।

বিদেশী সাহায্যের ওপর একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মত, জাতিও আপনার সাহায্য আপনিই করুক। এই হচ্চে ঠিক ঠিক স্বদেশপ্রেম। যদি কোন জাতি তা কোরতে না পারে, তবে বলতে হবে—তার এখনও সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা কোরতে হবে। এই নূতন আলোক ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়া চাই, এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজে লাগতে হবে।

পদ্মফুলই হচ্চে নব-জীবনের প্রতীক। চারু-শিল্পে আমরা বড়ই পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্র-শিল্পে। বনে বসন্ত জেগেচে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েচে—এই ভাবে একটি ছবি আঁকুন দেখি। কত ভাবই তো রয়েচে ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে তুলুন। * * *

আগামী রবিবার আমি সুইজারল্যাণ্ড যাচ্চি; শরৎকালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে, আবার কাজ আরম্ভ কোরব * * * আপনি জানেন, বিশ্রাম আমার বড়ই দরকার হয়ে পড়েচে।

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

আপনাদের—

বিবেকানন্দ

(১২)

ইংরাজীর অনুবাদ

সুইজারল্যাণ্ড
৬ই আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় অ—

* * * অভীঃ। অনেক বড় বড় কাজ হবে। বৎস! সাহস অবলম্বন কর। * * *

মোক্ষমূলার অনেকগুলি ভারি সুন্দর চিঠি লিখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি বড় জীবনী লেখবার জন্য তিনি উপাদান চেয়েছেন। * * *

সংবাদ পত্রের মিথ্যা সমালোচনা শুনে শুনে আমি হয়রাণ হয়ে গেচি। মূর্খেরা যা বলে বলুক আমাদের কাজ আমরা করে যাই। সত্যকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

তোমরা দেখচ আমি এখন সুইজারল্যাণ্ডে রয়েচি, আর ক্রমাগতঃ ঘুরে বেড়াচ্চি। পড়া বা কোন লেখার কাজ আমি কোরতে পারচি না—এখন কোরবও না। আগামী মাস থেকে ইংলণ্ডে আমায় অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে। আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরচি। সেখানকার কাজ যাতে আপনার শক্তিতে চলে সেই চেষ্টা করব।

সকলে আমার ভালবাসা জানবে। বীরহৃদয়। কাজ কোরে যাও, পশ্চাদ্‌পদ হয়োনা,—'না' বোলো না। কাজ কর—ঠাকুর পেছনে আছেন। মহাশক্তি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন।

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

বিক্রমশিলা

(১)

বৌদ্ধযুগের প্রসিদ্ধ সারস্বত ক্ষেত্র বিক্রমশিলা সংঘারাম খ্রীষ্টীয় অষ্টশতকের শেষভাগে মগধরাজ পরম সৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে বিক্রম-নামক এক যক্ষকে নিগৃহীত করা হইয়াছিল বলিয়া এস্থানের উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে এরূপ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। * বিক্রমশিলা সংঘারামকে সংক্ষেপে বলা হইত 'শিলা-সংযম'।

বিক্রমশিলার সংস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে ঢাকার বিক্রমপুরের সহিত সংযুক্ত করিতে চাহেন। তিব্বতের ইতিহাসকার লামা তারানাথ † বলেন, গঙ্গাতীরে মগধের কোন পাহাড়ের উপরে এই সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। General Cunningham পাটনার নিকটবর্ত্তী বড়গাঁওর সন্নিহিত 'সিলাও' নামক গ্রামে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামহো-পাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, বিক্রমশিলা সংঘারাম ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। Mr. N. Dey এক প্রবন্ধে ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাটা নামক স্থানে ইহার সংস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই শেষোক্ত মতই অনেকের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

(২)

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। উহাতে ১০৮ জন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন; এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কর্ম্ম পরিদর্শনের জন্য আরও ৬ জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

---

* The Glories of Magadha Prof. Samaddor p. 146.

† ইনি ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

ছিলেন। বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ হাজার ছাত্রের স্থান ছিল। মন্দির ছিল মোট ১০৮টি। ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরে মহাবোধি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংঘারামের চারিদিক প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ইহার পরিরক্ষণের জন্য মগধরাজ কিছু সৈন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। * ৬টি সিংহদ্বারে ৬ জন দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী ছাত্রদিগকে ইঁহাদের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিংহদ্বার বন্ধ করা হইত। সিংহদ্বার বন্ধ হইবার পরে যে সকল অতিথি বা অভ্যাগত আসিতেন তাহাদিগকে বহির্ভাগে ধর্ম্মশালায় অপেক্ষা করিতে হইত।

মগধরাজ ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ছাত্রদিগের আহার্য্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ "সত্র" হইতে যোগান হইত। রাজকোষ হইতে অধ্যাপকগণের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইত। এরূপ কথিত আছে, ৪ জন সাধারণ লোকের জন্য যে খরচ না হইত ইঁহাদের এক একজনের জন্য তাহা খরচ হইত।

বিক্রমশিলার অধ্যাপকগণের পাণ্ডিত্য প্রভায় আকৃষ্ট হইয়া তিব্বত, গন্ধার, তুর্কীস্থান, উজ্জয়িনী, কাশী ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ছাত্র আসিয়া সমবেত হইত। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের (৯৮০—১০৫৩ খৃষ্টাব্দ) অধ্যক্ষতায় বিক্রমশিলা অত্যধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অতীশ বিক্রমপুরের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিদ্যা ও সাধন লব্ধ জ্ঞানে তিনি সেই সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তিব্বতরাজের আগ্রহাতিশয্যে দীপঙ্কর তথায় যাইয়া প্রায় ১৫ বৎসর কাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সেখানকার ধর্ম্মকে সুসংস্কৃত করেন।

অতীশের সময়ে দক্ষিণদিকের সিংহদ্বারের অধ্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত প্রজ্ঞাকরমতি, পূর্ব্বদ্বারের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাপণ্ডিত রত্নাকরশান্তি, পশ্চিম দ্বারের অধ্যক্ষ ছিলেন বাগীশ্বর কীর্ত্তি, উত্তর দিকের অধ্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত নরোপা। আর মধ্যে যে দুইটি সিংহদ্বার ছিল তাহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত রত্নবজ্র ও পণ্ডিত জ্ঞানশ্রী মিত্র।

* The Glories of Magadha p. 162.

এতদ্ব্যতীত বুদ্ধজ্ঞানপাদ (৮ম শতাব্দী), বৈরোচন রক্ষিত (৮ম শতাব্দী), জেতারি (১০ম শতাব্দী), বীর্য্য সিংহ (৯৮০—১০৫৩), অভয়করগুপ্ত (একাদশ—দ্বাদশ শতাব্দী), তথাগত রক্ষিত, রত্নকীর্ত্তি, (১০ম শতাব্দী), মঞ্জুশ্রী, ধর্ম্মকীর্ত্তি, শাক্যশ্রী ভদ্র (১২০৩)—ইঁহারাও বিক্রমশিলার খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে তিব্বতে যাইয়া সদ্ ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিক্রমশিলার অভ্যুদয় কালে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের খুব প্রভাব বিস্তার হয়। বিক্রমশিলাতে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইত। এতদ্ব্যতীত ব্যাকরণ, হেতুবিদ্যা (Logic), অভিধর্ম্মকোষের ও (Metaphysics) অধ্যাপনা হইত। বিক্রমশিলার অধ্যাপক ও ছাত্রগণ প্রাচীন পুঁথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিক্রমশিলায় প্রস্তুত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি অতি সুন্দর প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।

ঐতিহাসিক লামা তারানাথ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিক্রমশিলার অধ্যাপকগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপও পরিদর্শন করিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে বিক্রমশিলার অধ্যাপকগণের নির্দ্দেশানুযায়ী পরিচালিত হইত এরূপ কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইত। হয়ত তিনি তৎকর্ত্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে নালন্দার কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের ভার দিতেও পারেন। আমরা দেখিতেও পাই দীপঙ্কর ও অভয়কর গুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনা করিতেছেন।

(৩)

মগধের নৃপতিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় চারিশতাব্দীকাল বিক্রমশিলা সংঘারাম বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্যাবিতরণের কার্য্য করিয়াছিল। পাল ও সেনরাজগণ যখন মগধের আধিপত্যের জন্য পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন বখ্ তিয়ার খিলিজি এই সুযোগে বৌদ্ধবিহার গুলি আক্রমণ

করেন (১১৯৯)। সেন কিংবা পাল রাজগণের তখন এমন শক্তি ছিলনা যে 'তুরুস্ক' সেনাকে বাধাপ্রদান করিতে পারেন। উদ্দণ্ডপুর * ও বিক্রমশিলার ভিক্ষুগণ আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধ ব্যবসায়ী পরাক্রান্ত তুরুস্ক সেনার সম্মুখে যুদ্ধশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ভিক্ষুগণ কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারেন? সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজুদ্দীন সিরাজী প্রণীত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' হইতে জানা যায় যে হত্যাকাণ্ড এমনই নৃশংসভাবে চলিয়াছিল যে পরদিন সকালে বিজেতা এমন একজন লোককেও খুঁজিয়া পাইলেন না যিনি সংঘারামের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থগুলির বিষয় তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন। অতঃপর বিজেতার আদেশে শত শত বর্ষের সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি ভস্মীভূত হয়। তারানাথ আরও বলেন যে তুরুস্ক-বিজেতা বিহারের ভগ্নাবশেষের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

এই ভাবে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে বৌদ্ধভারতের শিক্ষাকেন্দ্র-গুলি একে একে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ হয়। ডাক্তার কার্ণ (Dr. Kern) বলেন, মুসলমানদের আক্রমণের ফলে বিক্রমশিলা ও উদ্দণ্ডপুরীর বহু ভিক্ষু প্রাণত্যাগ করেন। যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বিক্রমশিলার তৎকালীন সংঘস্থবির শাক্যশ্রী প্রথমতঃ উড়িষ্যা ও তৎপর তিব্বতে গমন করেন। অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়া সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতে মুসলমানেরা তত শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে নাই, এইজন্য সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম আরও কিছুকাল প্রচলিত ছিল। বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু মুসলমানের অত্যাচার ভয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ ও দেবমূর্ত্তিসহ নেপালেও পলায়ন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

---

* দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ) ভূমিতে এই সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দ

বাল্যকাল হইতে যখনই যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহা সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে পড়িয়া। একটা জিনিষ সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়া ছিলাম—তাহা ধর্ম্মের কথা। বাল্যকাল হইতেই একটা ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এবং আজিও তাহা তিরোহিত হয় নাই—তাহা এই যে ধর্ম্মের কথা বলিবার অধিকারী তাঁহারাই যাঁহারা চাপরাশ পাইয়াছেন—যেসে সে কথা শুনাইবার অধিকারী নহে। তথাপি আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। এ বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। বন্ধুর অনুরোধে হঠাৎ সম্মত হই নাই। শেষে এই সমাধানে উপনীত হইয়াছি যে ভগবানই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা—আমরা নিমিত্তমাত্র। তাঁহারই ইচ্ছাবলে আমি তাঁহারই বিষয় কীর্ত্তন করিতে আজ দণ্ডায়মান হইয়াছি—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ (man) কিন্তু ধর্ম্মের কারবার অতি-মানুষকে (Superman) লইয়া। সাহিত্যের ও ধর্ম্মের বাণী এক নহে। সাহিত্যের বাণী মানুষের এই পরিচ্ছিন্ন জীবনের আনন্দ ব্যথা প্রভৃতি হইতে সুরু করিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবনের গোপনতম আকাঙ্ক্ষাটিকে পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়া রসের সৃষ্টি—বড় জোর রসের স্রষ্টার উদ্বোধন—যাহাকে আধ্যাত্মিক সাহিত্য (mystic or transcendental literature) বলা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের বাণী, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা Vanity of vanities, all is vanity.

কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ
অপাস্ত মোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥ (শঙ্করাচার্য্য)

"যাঁহারা তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশাশূন্য হইয়া একমাত্র শিবতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্ তাঁহারাই সাধু।"

মীরাটে স্বামী বিবেকানন্দের ষষ্ঠষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পঠিত।

স্বামিজীর নাম প্রথম যখন আমার শ্রুতিগোচর হয় তখন কৈশোরের প্রারম্ভ স্বদেশীযুগের তখন প্রথম সূত্রপাত। তাহার পর স্কুল জীবনেই স্বামিজীর সমস্ত বই গুলি পাঠ করিয়াছিলাম; আর দেখিয়াছিলাম সেই বই গুলির প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি 'ব্রহ্ম বিদিব সোম্য ভাসি' সে মুখ ব্রহ্মজ্যোতিঃতে দীপ্তি পাইতেছে। আজ তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার পুণ্যমহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। তাঁহার পদে কোটী কোটী প্রণাম। তাঁহার বিষয় নূতন করিয়া কিছু বলিবার সাধ্যও নাই, বোধ হয় প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন আছে শুধু আজ তাঁহার মহিমা স্মরণ করিবার।

ইংরাজি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামিজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত, মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। তাঁহার পিতামহ ঈশ্বরপ্রেমে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ হইতে বাংলার জাতীয় সত্তার সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সে যুগে সাহিত্যে বঙ্কিম, সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর, আর ধর্ম্ম সাধনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছিলেন।

স্বামিজী আজন্মসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "এমন আধার এ যুগে আর কখনও আসে নি।" কখনও বলিতেন, "নরেন পুরুষ তিনি প্রকৃতি, নরেন তাঁর শ্বশুর ঘর।" কখনও বলিতেন, 'অখণ্ডের থাক'। কখনও বলিতেন, "অখণ্ডের ঘরে যেখানে দেব দেবীসকলও ব্রহ্ম হতে নিজের নিজের অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেন নাই, লীন হয়ে গেছেন—সাতজন ঋষিকে আপন আপন অস্তিত্ব পৃথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাদেরই একজনের অংশাবতার'। কখনও বলিতেন, "জগৎপালক নারায়ণ, নর ও নারায়ণ নামে যে দুই ঋষিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে জগতের কল্যাণের জন্য তপস্যা করেছিলেন, নরেন সেই নরঋষির অবতার।" কখনও বলিতেন, "শুকদেবের মত, মায়া স্পর্শ করতে পারেনি"।

উপরের কথাগুলি শুনিয়া জনৈক শিষ্যের মনে সন্দেহোদ্রেক হইয়াছিল যে কথাগুলি অতিশয়োক্তি কিনা। তদুত্তরে স্বামী যোগানন্দ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কথা সব সত্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিথ্যা কথা বেরুত না।"

পরমহংসদেব আর স্বামিজী সম্বন্ধে একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "They are like a double star in the spiritual firmament of India, or rather soul in its two different aspects—'Hesper phosphor, double name'."

তাঁহার শিশু জীবনেই ধর্ম্মানুরাগের পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু কোন জিনিষই তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করিতেন না। সব জিনিষের প্রমাণ চাহিতেন। St. Paul এর কথা আর তাঁহার কথা একই ছিল, "Prove everything, hold fast that which is true" ভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে জাতি যায় কিনা দেখিবার জন্য মুসলমানের হুঁকায় মুখ দিয়া তামাক খাইয়াছিলেন। চাঁপা গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে, উহাতে উঠিলে ঘাড় মটকাইবে এই কথা শুনিয়া তিনি নিঃসঙ্কোচে গাছে চড়িয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মদৈত্যের প্রকাণ্ড হাত খানা কখন তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। সুতরাং স্বামিজীর মনে যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদিত হইল তখন একদিন মহর্ষির নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?" উত্তরে মহর্ষিদেব বলিলেন, "বৎস, তোমার চক্ষে যোগীর দৃষ্টি দেখিতেছি।" প্রশ্নের জবাব না পাইয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার সেই প্রশ্ন। উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ। আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছি বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিয়াছি।" নরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন। এই প্রথম তিনি একজন মানুষ দেখিলেন যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম্ম সত্য উহা অনুভব করা যাইতে পারে। আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি,

তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

Virtue শব্দ ল্যাটিন Vir হইতে উৎপন্ন Vir অর্থ মানুষ। আবার এই Vir, সংস্কৃত 'বীর'এর সমর্থ বোধক সুতরাং Virtue অর্থ বীর্য্য। স্বামিজী Virtueকে এই অর্থে লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "You must have steel nerves and cast iron muscles" এই মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আমরা স্বামিজীর অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইতে পারি।

সাধারণতঃ পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায় কেহ পুং-সত্ব প্রধান (masculine), আর কেহ স্ত্রী-সত্ব প্রধান (feminine) এই শেষোক্ত সাধকেরাই ভক্তিমার্গবাদী। রামানুজ, মাধবাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইঁহাদের উদাহরণস্থল। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপেও এই ভাবের প্রতিধ্বনি Cardinal Newmanএ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become a woman, yes, however manly thou may be among men" ইঁহারা দ্বৈতবাদী (Dualist)—মায়া বা বিবর্ত্তবাদে ইঁহারা আস্থা স্থাপন করেন না—তাহাকে ভগবানের লীলা বা পরিণাম বলিয়া থাকেন।

পুং-সত্ব প্রধান অদ্বৈতবাদী সাধকেরা স্বামিজীকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া ধরিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক শঙ্করাচার্য্য, ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের শূন্যবাদের উপর হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে একই আছেন আর সেই একই ব্রহ্ম "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। দেশকাল ও নিমিত্ত ভেদে এই একই বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন—Kantএর ভাষায় যাহাকে Space, Time এবং Causation বলে। Matter বলিয়া কোন সত্তা নাই আছে কেবল মাত্র Spirit। Carlyle তাই বলিয়াছেন Matter exists spiritually only" উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" জর্ম্মাণ দার্শনিক Richter বলিয়াছেন "All is God like or God" সুফী

ধর্ম্মের "আনল্ হক্" এর অর্থ ইহাই। Emersonএর Oversoul বলিতে ইহাই সূচিত হইতেছে। স্বামিজী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"সকলেতে আমি আমাতে সকল
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।"

এই অদ্বৈতবাদের শেষ কথা "তত্ত্বমসি Thou art He।" নিত্যানিত্য বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান এবং মুমুক্ষত্ব দ্বারা উক্ত অভীপ্সিত অবস্থা লাভ করিতে হয়।

কিন্তু স্বামিজীকে কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদী বলিয়া চিত্রিত করিলে তাঁহার পূর্ণাবয়ব দৃষ্টিগোচর হইবে না। তিনি উপাসনা করিয়াছিলেন জ্ঞান ও শক্তির কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা গিয়াছিল। এই জন্য তিনি রামানুজ ও শঙ্করের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "The original contribution of Swami Vivekananda is that he has established perfect harmony and co-ordination among the conflicting schools of thought and various modes of realisation," তিনি জানিতেন যে অদ্বৈতবাদ সাধারণ লোকের পক্ষে খাটে না। তাই বলিয়া গিয়াছেন, "All people cannot take up this Advaita philosophy ; it is hard. First of all, it is very hard to understand it intellectually. It requires the sharpest of intellects, a bold understanding. Secondly, it does not suit the vast majority of people ইত্যাদি।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিস্ফুট হইবে। স্বামিজীকে শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশ ঘোষ মহাশয় একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি বেদ বেদান্ত ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার. ভ্রূণ হত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সাম্নে দিন রাত ঘুরচে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু আছে ?" জগতের দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজীর চক্ষে

জল আসিল। তিনি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। তখন গিরীশ বাবু বলিলেন, "দেখলি, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামিজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি।" তাহার পর স্বামিজী বলিলেন,—"দেখ জি, সি, মনে হয় এই জগতের দুঃখ দূর কোরতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় ত তা কোরব"।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্বামিজী ঠাকুরের নিকট উপনীত হন, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর লীলা সংবরণ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামিজী ভারতের উপকূল ছাড়িয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহার বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিবেদিতা বলিয়াছেন:— 'The impelling force that drove him out to foreign lands was the great personality of One at whose feet he had sat and whose life he had shared, for many years" আমেরিকায় Parliament of Religions in the Chicago Exhibition এ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'The religious ideas of the Hindus' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকায় ছিলেন। তাহার পর ইংলণ্ড হইয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সালে রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামিজী বলিয়াছেন, "সাধন, ভজন, জ্ঞান চর্চ্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে তাতে জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে; মানুষের জীবন-গতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals বেরোবে, এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে, যথার্থ ধর্ম্মানুরাগিগণ সব এখানে কালে এসে জুটবে।" ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার য়ুরোপ যাত্রা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারি Paris)

নগরীর Congress of Religionsএ ফরাসী ভাষায় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বেলুড় মঠে এই যে সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামিজী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ইঁহারা কেহই আত্ম মুক্তিকামী নহেন। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় ইঁহাদের জন্ম ইঁহাদের দেহ ধারণ। ঠাকুর স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি আকাঙ্ক্ষা কর?" স্বামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু ঠাকুর তাহা দেন নাই। "আমি জানি তুই একটা বিশাল বট গাছ, কত তাপিত প্রাণ, তোর ছায়ায় সান্ত্বনা পাবে, শীতল হবে, সেই সব চিন্তা ছেড়ে আজ ক্ষুদ্র আত্ম-মুক্তির কামনা।" "যাও আমার কাজ কর, মা আজ যা দেখিয়েছেন তা সবই বন্ধ রইল চাবী রেখে দিলাম, যখন কাজ শেষ হবে তখন আজ যাহা দেখলে জানলে, তা আবার দেখবে জানবে।" তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "ভাল জিনিষ পেলে কি একা খেয়ে সুখ হয়? দশজনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মানুভূতি লাভ করে না হয় তুই মুক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি? ত্রিজগৎ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। তখনই নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি।"

(ক্রমশঃ) শ্রীঅবণীনাথ রায়

স্বপ্ন-রথ

[পুরীর সাগর কূলে রথ যাত্রার দিনে দৃষ্ট স্বপ্ন]

নিশি শেষে সিন্ধু কূলে সৈকত-শয়নে
ঢালিয়া শরীর,
শুয়ে আছি— চেয়ে আছি উন্মুক্ত গগনে,
নিম্নে নীল নীর।
সহসা পড়িল চোখে যেন রে স্বপনে
বিরাট গম্ভীর,
দিশি দিশি বিমণ্ডিয়া কনক-কিরণে
চিন্ময় মন্দির।

২

বিস্ময়ে নিবিষ্ট নেত্রে দেখিনু চাহিয়া
হতে পর পার,
আসিছে বিচিত্র রথ সলিল ভেদিয়া
দেউল আকার।
নভশ্চুম্বী চূড়া পরে উড়িছে কেতন
সুরজ-অঙ্কিত,
হৈম মেঘ পুঞ্জে গড়া সহস্র তোরণ
মণি-বিমণ্ডিত।

৩

সহস্র তরঙ্গরূপী চক্রমুখে তার
উঠিছে ঘর্ঘর,
ঝরিতেছে লাজপুঞ্জ শুভ্র ফেনাকার
হইতে অম্বর।

ধবল বিহঙ্গতনু করিয়া ধারণ
নামি দেবতারা,
তরল মধুর কণ্ঠে করিছে ভজন
হয়ে আত্মহারা।

৪

না জানি কি ভাবোন্মাদে স্তব্ধ ঊর্দ্ধমুখে
জুড়ি দুটি কর,
নির্ব্বাক্ রহিনু চাহি ; উচ্ছ্বসিল বুকে
ভকতি-লহর।
হেরিনু স্মরিতে প্রাণ পুলকে শিহরে—
যেন জগন্নাথ,
আসিছেন স্বপ্ন-রথে আমারি অন্তরে
পূরাইতে সাধ !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

রাজযোগ

পরিচয়

[স্বামিজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারাবুলের বাড়ীতে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহিত যোগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, মিসেস্ বুল তাহা লিখিয়া রাখেন। পরে ভক্ত, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণের জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই ভাষান্তর।]

আরম্ভ

রাজযোগও বিজ্ঞান সমূহের অন্যতম। এই বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দর্শন সম্বন্ধীয় মনের বিশ্লেষণ ; আর তারই সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যও গড়ে ওঠে। সর্ব্বদেশের আচার্য্যেরাই একবাক্যে বলে গেছেন, "সত্য আমরা দেখেছি ও জানি।" যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, "আমাদের প্রচারিত সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।"

এই প্রত্যক্ষানুভূতি যোগলব্ধ।

সংজ্ঞা বা স্মৃতি জীবনের সীমারেখা হতে পারে না; কেন না, আর একটা অতীন্দ্রিয় ভূমি আছে; সেখানে আর সুষুপ্তিতে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ হয় না, কিন্তু এই দুটোর মধ্যে আবার আকাশ পাতাল তফাৎ, যেমন—জানা আর না জানা। যে যোগশাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা কোরছি সেটা ঠিক বিজ্ঞানের মতই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস।

যোগের শিক্ষা—জড়কে কিরূপে দাস করে রাখা যায়; কারণ তার তাই থাকা উচিৎ।

যোগ মানে যোজনা করা; অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করে দেওয়া।

মন, জ্ঞানভূমি ও তার নিম্নস্তরে কাজ করে। আমরা যাকে জানা বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা অংশ মাত্র।

একটুখানি জ্ঞান নিয়ে আমাদের এই "আমি", আর তার চারি দিকে বিরাট অজ্ঞান; এই "আমি"র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় ভূমি।

অকপট হৃদয়ে যোগ অভ্যাস কোরলে মনের পর্দা একটার পর একটা সরে যায়, আর নব নব সত্যের প্রকাশ হয়। ধীরে ধীরে যেন আমরা নূতন জগতের সন্ধান পাই, যেন আমাদের ভেতর নব নব শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু খুব হুঁসিয়ার যেন মাঝরাস্তায় থেমে না যাই। হীরের খনি সাম্‌নে পড়ে রয়েছে, কাঁচের 'জলুস্' যেন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে না দেয়।

ভগবানই আমাদের লক্ষ্য, তাঁর কাছে যেতে না পারাই আমাদের মৃত্যু।

যাঁরা সাধক—মুমুক্ষু, তাঁদের তিনটি জিনিষ দরকার।

প্রথম। ইহলোকে ও পরলোকের ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা ছাড়তে হবে। চাইতে হবে কেবল ভগবান, আর সত্য।

দ্বিতীয়। সত্য আর ভগবানকে লাভ করবার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা

চাই। যে মানুষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্তে ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি ব্যাকুল হও, তেমনি তীব্র ভাবে তাঁকে চাও।

তৃতীয়। শিক্ষা ছটি। এক—মনকে বহির্ম্মুখী হতে না দেওয়া। দুই—মনকে অন্তর্ম্মুখী করে একটা ভাবে আবদ্ধ রাখা। তিন—প্রতিবাদ না করে সব জিনিষ সহ্য করা। চার—তাঁকেই চাইতে হবে আর কিছুই নয়। আপাত মনোরম বিষয় তোমায় যেন ঠকাতে না পারে। সব ত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই চাও। পাঁচ—কোন একটা জিনিষ নাও, নিয়ে সদসৎ বিচার কর, সমাধান না কোরে ছেড় না। আমরা সত্যকে জানতে চাই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে নয়; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুর ধর্ম্ম, মানুষ কখনও তাই নিয়ে থাকতে পারে না। মানুষ—মননশীল; মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের সন্ধান পায়, ততদিন সে যুদ্ধ কোরবেই। বৃথা বাক্য একেবারে ত্যাগ কর। সামাজিকতা ও লোকমতের পূজাই হচ্ছে—পৌত্তলিকতা; আত্মা—লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ছয়—সর্ব্বদা নিজের স্বরূপ চিন্তাকর। কুসংস্কারের পারে যাও। ক্রমাগত "আমি ছোট" "আমি ছোট"—এই ভেবে নিজেকে ছোট করে ফেল না; যতদিন না ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হচ্ছে, ততদিন তুমি ঠিক ঠিক যা, তাই ভাব।

এই সাধননিষ্ঠা ব্যতীত ফল সুদূরপরাহত।

অনন্তের ধারণা আমাদের সম্ভব, কিন্তু ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করা অসম্ভব। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকাশ কোরতে যাই, তখুনি তাঁকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি; ফলে অনন্ত হয়ে পড়েন সান্ত।

ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে। শুধু ইন্দ্রিয় কেন, বুদ্ধিরও অতীত হতে হবে; আর এ শক্তি আমাদের আছেও।

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস করে শিষ্য গুরুকে জানাবে।

রাগমালা

নাদ

নাভিমণ্ডলের পশ্চাতে "মণিপুর নামক" দশ দল পদ্ম রহিয়াছে; উক্ত দশ দলে "ডং হইতে ফং" পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ ক্রমশঃ দশদলে আছে। এই সকল বর্ণ নীলবর্ণ। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে রং বীজ এবং ঐ বীজ মধ্যে স্বস্তিকত্রয় বিভূষিত, রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নি-মণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি বিদ্যমান আছেন; অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ও তাঁহার শক্তি ভদ্রকালী শোভাবিস্তার করিতে-ছেন। এই রুদ্র বর এবং অভয় মুদ্রাযুক্ত ভুজদ্বয় বিভূষিত, সিন্দুরবর্ণ ত্রিলোচন, বৃদ্ধ ও ভস্ম বিভূষিত শরীর; ইঁহার সন্নিধানে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা পীত ভূষণ বিভূষিতা, চতুর্ভুজা, মদমত্তচিত্তা লাকিনী শক্তি শোভা পাইতেছেন।

উক্ত মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয় মধ্যে ইষ্টদেবের চিন্তার স্থান উর্দ্ধমুখ অষ্টদল-কমল। তাহার উপরিভাগে অনাহত চক্রনামে রক্তবর্ণ দ্বাদশ দল পদ্ম আছে। এই পদ্মের কনিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন যে ত্রিকোণমণ্ডল আছে তাহাকে ত্রিকোণ শক্তি বলিয়া থাকে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানে ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন; এই ঈশ্বরই নারায়ণ ও হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দ্বিভুজ এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইঁহার নিকট কাকিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় এবং তাঁহার চারি হস্তে পাশ, পান-পাত্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধার্দ্র-হৃদয়া, মত্তা এবং অস্থিমালা বিভূষিতা। এইস্থানে কালরাত্রি প্রভৃতি আরও অনেকগুলি শক্তি বিরাজিতা আছেন। এই চক্রে যং

বায়ুবীজ এবং তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ ও গোলাকার বায়ুমণ্ডল এবং কৃষ্ণসার বাহন চতুর্ভুজ ধূম্রবর্ণ পবন শোভিতেছেন। এই চক্রের মধ্যে নির্ব্বাত দীপকলিকার ন্যায় জীবাত্মা রহিয়াছেন। ইহার উপরিভাগে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্র ও ভারতী মাতার স্থান নামক ধূম্র-বর্ণ ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে—"অং হইতে অঃ" এই ষোড়শ বর্ণের এক এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদয় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ পূর্ব্বাদিক্রমে, "নিষাদ", "ঋষভ", "গান্ধার", "ষড়জ", "মধ্যম", "ধৈবত", ও "পঞ্চম", সপ্তদলে এই সপ্ত-স্বর, অষ্টমদলে বিষ, তৎপরবর্ত্তী সপ্তদলে "হুঁ" "ফট", "বৌষট", "বষট", "স্বধা", "স্বাহা", এবং নমঃ এই সাতটি মন্ত্র এবং শেষদলে অমৃত আছে। ঐগুলি সপ্ত স্বরের বীজ। আমাদিগের শরীরের মধ্যে যে সাতটি পদ্ম * বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই সকল পদ্মের মধ্য হইতে সপ্তরাগের উৎপত্তি হইয়াছে; সপ্তরাগ যথা—"ভৈরব", "মাল-কোষ", "হিন্দোল", "মেঘ" "শ্রী" "দীপক" ও "নটনারায়ণ"।

উক্ত সপ্তদল অন্তর্গত ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব আছেন; এই স্থানেই সকলের মূলমন্ত্র আছে। এইস্থানে বিদ্যুৎবর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধর মণ্ডলও অবস্থান করিতেছেন। এইচক্রে "হং" এই "আকাশ বীজ" এবং তন্মধ্যে স্বচ্ছ গোলাকার আকাশ মণ্ডল ও শ্বেত হস্তীতে আরূঢ় শুক্লবস্ত্র পরিধান আকাশ আছেন। আকাশ চতুর্ভুজ। আকাশের হস্তে পাশ, অঙ্কুশ বর এবং অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট অর্দ্ধ-নারীশ্বর শিব; ইঁহাকেই সদাশিব বলা যায়। ইঁহার বর্ণ শুক্ল, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন দশভুজ এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান। ইঁহার নিকটে শ্বেতবর্ণা, পীতবসনা, শাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে, শর, চাপ, পাশ এবং অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে। প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা—অ—"অকার"; উ—"উকার"; ম—"মকার"; "ঁনাদ";

---

* সপ্তপদ্মের নাম যথা—১ম—মূলাধার, ২য়—স্বাধিষ্ঠান, ৩য়—মণিপুর, ৪র্থ—অনাহত, ৫ম—বিশুদ্ধ, ৬ষ্ঠ—আজ্ঞা, ৭ম—সহস্রার।

"•"— * "নাদ"; " - "কলা", "=" "কলাতীত"। চতুষ্পাদ যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ এবং সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা "জাগ্রতাবস্থা," "স্বপ্নাবস্থা", "সুষুপ্ত্যবস্থা"। পঞ্চদেবতা যথা—"ব্রহ্মা", "বিষ্ণু", "রুদ্র", "ঈশ্বর" ও "মহেশ্বর"। প্রণব তিন প্রকার যথা—"অপর প্রণব", "পরপ্রণব" ও "মহাপ্রণব"। অপর প্রণবও আবার তিনপ্রকার যথা—"সাত্ত্বিক", "রাজসিক" ও "তামসিক"। উক্ত ত্রিবিধ প্রণবের স্বরূপ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। "শব্দই ব্রহ্ম-স্বরূপ"; অপর প্রণবে অকার দ্বারা "রজোগুণ", উকার দ্বারা "সত্ত্বগুণ", এবং মকার দ্বারা "তমোগুণ" লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ—বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রা, এই তিন শক্তি। সাত্ত্বিক শক্তিকে "বামা" রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা, এবং তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার—"সত্ত্ব", "রজঃ" ও "তমঃ"। সাঙ্খ্যমতাবলম্বিগণ এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার এবং তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রণবের ষষ্ঠ অংশ কলা (অঙ্কুর) শব্দের অর্থ মহেশ্বর, রূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত। রাজসিক বিন্দু হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং সাত্ত্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ত্ব, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায়ই কলাশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অণুপ্রবিষ্ট চৈতন্য। অপর প্রণবের সপ্ত অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইল এক্ষণে এই প্রণবের পাদ চতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্তুতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারিটি অবস্থা

* (অর্থাৎ বিন্দুনাদ।)

আছে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য, তাহাকে স্থূল বলে। যাহা স্থূল গ্রাহ্য নহে তাহাকে সূক্ষ্ম বলে। গুণ মাত্রে স্থিত হইলে বীজ বলা হয়। নির্গুণ অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; এই চারিটি অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ বলা হয়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা হইতেছে, যথা—বিশ্ব, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট্ অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থাভিমানী পুরুষ ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের প্রথম স্থান; হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস্ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি "শব্দব্রহ্মরূপ" প্রণবের দ্বিতীয় স্থান; অব্যাকৃত অর্থাৎ সুষুপ্ত্যাবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ সুষুপ্ত্যাবস্থাভিমানী পুরুষ ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান; সুতরাং জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাকেই শব্দব্রহ্মরূপ অপর প্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, এবং মহেশ্বর, এই পঞ্চদেবতাই "শব্দব্রহ্মরূপ" প্রণবের স্বরূপ। উপরোক্ত শব্দব্রহ্মের বিষয় কিংবা প্রণবের বিষয় যাহা ব্যাখ্যা করা হইল উক্ত বিষয়গুলি সর্ব্বসাধারণের বোধ হয় বোধগম্য হইবে না; অনেকে উক্ত বিষয়গুলির মর্ম্মভেদ কিংবা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমও হইতে পারেন এবং উন্মত্ত ও প্রলাপের বাক্যের ন্যায়ও মনে করিতে পারেন; একারণে আমি সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে জগতের উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি তাহার প্রমাণ-স্বরূপ শ্লোকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবোজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
সচ্চিদানন্দ বিভবাৎসকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদস্তস্মাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্—তৃতীয়োল্লাসঃ।)

নাদ ধাতুর অর্থ ধ্বনি। সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে কথিত আছে নাদ, শব্দের যোগারূঢ়ি শক্তিদ্বারা ধ্বনি বিশেষকে কহা যায়। আকাশ হইতে "নাদ" জন্মে, এই নাদ কোনও বস্তুতে আঘাতিত হইয়া বায়ুসংযোগে

শুনিতে পাওয়া যায়; এই নাদ দ্বিবিধ—বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠ ও তালুর অভিঘাতে যে নাদ জন্মে তাহাকে বর্ণাত্মক নাদ বলা যায়; যেমন—গান গাওয়া, বই পড়া ইত্যাদি।

দুইটি লোহা কিংবা দুইটি কাঠ লইয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলে অথবা মৃদঙ্গ তবলাদি বাজাইলে যে নাদোৎপত্তি হয়, তাহাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ বলে। শব্দ মাত্রকেই নাদ বলা যায়। নাদের মূল কারণ আকাশ, বায়ু সংযোগে নাদ প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

আকাশ সম্ভবো নাদস্তথানাহত উচ্যতে।
আহত নাদমাকৃষ্য তথানাহত সংজ্ঞকাৎ ॥
তন্নাদং সপ্তধাকার্ষীৎতস্ত তু জাতিভিঃ স্বরৈঃ।
আদ্যঃ কায়ভবোবাণী সম্ভবস্ত দ্বিতীয়কঃ ॥
তৃতীয়শ্চাপি বংশাদিসম্ভবঃ স ত্রিধামত।
এবং বহুভিরাচার্যৈর্নাদস্ত বহুধোদিতঃ ॥
ষড়্জর্ষভোচ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
আত্মা চ স-স্বরঃ প্রোক্তো শিরোরি-স্বর উচ্যতে।
হস্তৌ গান্ধার সংপ্রোক্তৌ বক্ষস্থান্মধ্যম স্বরঃ।
কণ্ঠস্তু পঞ্চমঃ প্রোক্তোঃ কটিধৈবত সংজ্ঞকঃ।
পাদৌ নিষাদ এব স্যাৎ সপ্তাঙ্গা মূর্চ্ছনাভবেৎ ॥

(সঙ্গীত সময়সার, সঙ্গীতরত্নাকরেনোক্তং)

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত রত্নাকর

রোঁমারোলার চিঠি

(প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদককে লিখিত পত্রের অনুবাদ)

লুই ২৬শে জুন
১৯২৭

প্রিয় মহাশয়,

এক বছর পূর্ব্বে * * * নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ জীবনের সন্ধান পাই। সেই সন্ধানই আজ আমাকে তাঁর জীবন ও চিন্তা সম্বন্ধে আরও অধিক জানবার জন্য উত্তেজিত করছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হতে আমি ও আমার ভগ্নি প্রবুদ্ধ-ভারত কার্য্যালয়ের বই পড়তে আরম্ভ করি। তা ছাড়া আমার ভারতীয় বন্ধুরাও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত অনেক বই দয়া করে পাঠিয়ে দেন। গতমাসে মিস ম্যাকলাউডের সাক্ষাৎ আমরা পাই। তিনি যে কয়দিন আমাদের এখানে ছিলেন সে কয় দিনই আমরা বিবেকানন্দের কথা বলে কাটিয়ে দেই।

আমরা বিবেকানন্দকে দেখি, তিনি যেন অধ্যাত্ম-শক্তির একটি বিদ্যুতাধার আর রামকৃষ্ণ যেন একটি প্রেম-স্রোতস্বিনী। দুজনেই ঈশ্বর ও অনন্তজীবনের আবিষ্কার করেছেন। বিবেকানন্দ বড় রসিক কিন্তু রামকৃষ্ণ প্রতিভায় তাঁর চাইতে অনেক ওপরে।

আমি একখানা বই তাঁদের নামে উৎসর্গ করতে চাই যাতে পাশ্চাত্য সাধারণে তাঁদের চিনতে পারে। কাজটা খুব কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। তাঁদের চিন্তার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্খলার জন্য যে বিভাগ করা হয়েছে তাতে আমার বোধ হয় পাশ্চাত্যের বুদ্ধি ও হৃদয়কে ঠিক ঠিক চেতনা দিতে পারে না। তাঁদের জীবনের দুটো দিক আছে—একটা ভারতের আর একটা বিশ্বের—আমি এই শেষের দিকটাতেই জোর দিতে চাই।

প্রথম চিন্তার বিষয় কি ভাবে কথা বল্লে পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক কথাগুলো ধরতে পারে এবং যাতে ফল হয়। এ হতেই সমস্ত কাজ ঠিক ঠিক হবে। এখানে একটা বিপদের আশঙ্কা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন, তাদের উপযোগী করে নিজেদের চিন্তা নিয়োজিত করতেন। যেমন রামকৃষ্ণের ভাষা শিষ্যের প্রতি প্রেমপর পরন্তু বিবেকানন্দের ভাষা তীব্র কঠোর যা চরিত্রের ওপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসে মানুষকে নূতন করে গড়ে তোলে। একই সত্যকে ইঁহারা দুজনে এমন বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে অন্তর্দ্দৃষ্টি না থাকলে বিভিন্ন ভাব বলে বোধ হয়।

আমরা এখন ইউরোপে রইছি, আর এ সময় জগতে একটা প্রবল সামাজিক ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণ, যেটার প্রবর্ত্তক হচ্চে আর একটা বিরাট কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্ত, যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঝঞ্ঝা থেকে অনেক শক্তিশালী, যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজ লক্ষ লক্ষ লোক একজন নিপুণ কর্ণধার চায়। এখন এই রক্ষা-নির্দ্দেশ দিতে হবে স্পষ্ট সহজ এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে। এর জন্য অপেক্ষা করবার সময় নেই কারণ সেই প্রচণ্ড আবর্ত্ত কারও জন্যে দাঁড়াবে না।

এখন অবশ্য কর্ত্তব্য হচ্চে, যে রাস্তা দিয়ে আজ মানুষ এগোবে সে রাস্তাকে সত্য-সূর্য্যের আলোয় আলোকিত করতে হবে। আজ এই সন্ধিক্ষণে যদি বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকতেন তা হলে মানুষ তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেত—এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস। তাঁর ও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ রক্ষার পর, যাঁরা হচ্চেন এই ঘূর্ণাবর্ত্তের কেন্দ্র এখনও তাঁদের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার দ্বারা জগতের সকল লোককে আচ্ছন্ন করতে পারেন নি। এখনও ঝটিকার প্রাগভাব সব নিঝুম—নীরবে মেঘ জড় হচ্চে। এখন সাহায্যাভাবে অজ্ঞানের আঁধারে যারা ডুববে তাদের বিষয় আমাদের ভাবা উচিত।

আমার ও আমার ভগ্নির ইচ্ছা আমরা সিষ্টার ক্রিশ্চিনের সঙ্গলাভ করি যাঁর কথা আমরা লোকের মুখে ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে শুনতে পাই। বিবেকানন্দের সঙ্গে মেশবার সুযোগ তিনি যেমন পেয়েছেন।

এমন খুব কম লোকেরই সৌভাগ্য হয়েছে। আমরা তাঁর সঙ্গে পত্রের আদান প্রদান করতে পেলে সুখী হব যদি একদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়।

আমরা আরও শুনেছি যে হিমালয়ের অদ্বৈত আশ্রমে * * * * * একজন পণ্ডিত লোক আছেন। তাঁর কাছ থেকেও আমরা বিজ্ঞানের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার ব্যাখ্যা শুনতে চাই। বিজ্ঞান-তন্ত্র চিন্তা আমি বেশ বুঝতে পারি এবং আমার মনে ওঠে ভগবানে পৌঁছবার বিজ্ঞানও একটা রাস্তা এবং যে রাস্তা ধরে পাশ্চাত্য জগৎ খুব নিশ্চিতরূপে (অবশ্য যদি সৎভাবে চালিত হয়) ভগবানের দিকে এগুতে পারবে। আমার খুব উপকারে আসবে যদি আমি জানতে পারি, এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দের নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ হয়েছিল কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তবে তা কোন পুস্তকে।

স্বামী ———— তুমি ও তোমার ভাইয়েরা আমার প্রণাম জানবে। যিনি সকল সঙ্গীতের সার, আধ্যাত্মিক একতার যিনি মূল-সূত্র সেই রামকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধিত বলে আমাকে তোমাদেরই একজন বলে জানবে। ইতি—

তোমাদের সকলের প্রতি

স্নেহ সম্পন্ন

আর, আর

আগষ্টের শেষে আমাদের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে দেখা করবার ইচ্ছা আছে।

উদ্ভিদের সাড়া

(চিঠি)

আমি বিজ্ঞানবিদ্ নহি; তবে সাধারণভাবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানিবার আমার আগ্রহ আছে। কাজেই সার জে, সি, বোস কলিকাতায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা আগ্রহের সহিতই পড়িয়াছি, এবং সম্প্রতি Statesman পত্রিকায় তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা অনুপ্রাণিত Facts and Imagination শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে উহা খুব শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সার জগদীশ জীব ও জড়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—তাঁহার এই উক্তি সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। তিনি অথবা তাঁহার কোনও কৃতী শিষ্য যদি Statesman পত্রিকা সাহায্যে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন তবে বড়ই উপকৃত হইব, কারণ আমার ধারণা আমার ন্যায় অনেকে এইরূপ সন্দেহে পড়িয়াছেন। আশা করি আমার অনুরোধ নিষ্ফল হইবে না।

ভারতে বৈদিক যুগ হইতে এবং ইউরোপে অ্যারিষ্টটলের সময় হইতে—এ পর্যান্ত উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে—এ কথা কেহই অস্বীকার করেন নাই। সার জে, সি, বোস্ জীব এবং জড়ের মধ্যে কতকগুলি নূতন সাদৃশ্য স্পষ্টতঃ প্রমান করিয়া মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই, যদিও কয়েকমাস পূর্ব্বে Scientific American পত্রিকার কোনও প্রবন্ধ লেখক তাহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সার বোস্ যখন বলেন যে জগতে জড় বলিয়া কোন পদার্থই নাই, এবং শুধু উদ্ভিদ কেন ধাতুদ্রব্যেরও প্রাণ আছে, কারণ তড়িৎ প্রবাহ প্রয়োগে তাহাদেরও জীবনের সাড়া সমভাবেই পাওয়া যায়—(respond to the physical and electrical stimuli), তখন স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে জীবনের লক্ষণ কি ?

আত্মপোষণ ও বংশবিস্তারই (metabolism-cum-reproduction) জীবনের প্রমাণ, এইরূপ 'বিশ্বাসে বোধ হয় বোস্ মহাশয়ের আপত্তি নাই। যে পর্য্যন্ত না তিনি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে ধাতু পদার্থ ও অন্যান্য জড়পদার্থ সমূহ খাদ্য গ্রহণ করে, discharging বা disruptive প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে (subject to the discharging or disruptive processes) এবং জীব ও উদ্ভিদের ন্যায় বংশ বিস্তার করিতে সমর্থ, সে পর্য্যন্ত কোন চিন্তাশীল পাঠকই তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোন উত্তেজনাতে সাড়া দেওয়া জীব ও জড় উভয়েরই ধর্ম্ম—ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু ইহা দ্বারা এক্ষেত্রে কিছুই প্রমাণিত হইতেছে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯২৬ সালের জুলাই মাসের Hibbert Journal নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ডি, ফ্রেসার হ্যারিস্ (Prof D. Fraser Harris M. D. D. Sc. F. R. S. (Edin) মহাশয়ের লিখিত "Biology and Personality" শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি পড়ি। কোন প্রকার উত্তেজনাতে সাড়া দেওয়াই যে জীবনের প্রমাণ নহে, উহা উক্ত অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ যুক্তি সহকারেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে Nature নামক পত্রিকায় একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ক্রমবিকাশবাদ (Evolution) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লেখেন তাহাও আমি পড়িয়াছি। ইহাতেও তিনি যোগ্যতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধুতার ন্যায় জীবনও উপমাবিহীন (life is unique as morality is unique) এবং inorganic (স্থাবর) ও organic (জঙ্গম) এর মধ্যেও একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান বর্ত্তমান। উপরোক্ত দুই প্রবন্ধের সম্বন্ধে সার জে, সি, বোস্ মহাশয়ের কি উত্তর আছে তাহা জানাইলে বাধিত হইব।

সার জগদীশ যদি তাঁহার গবেষণা অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সমর্থন করিতে পারেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্যে জীব হইতে জীবের উৎপত্তি (Biogenesis), কি—জড় হইতে জীবের উৎপত্তি (Abiogenesis) এই সম্বন্ধে পুরাতন কলহ এবং প্রাচ্যে জড় ও জীবের মধ্যে যে অনৈক্যের

ধারণা আছে তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে। কিন্তু Statesman পত্রিকার সুলিখিত প্রবন্ধে এরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে এই অনৈক্যের নিরসনই গূঢ়তম রহস্যের সমাধান। ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না; কারণ ভারতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম রহস্যবিদ্ বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের নিকটে বিজ্ঞানের এত সাধের দৃশ্যমান জগৎ মায়া (illusion) ব্যতীত কিছুই নয়। হিন্দু ঋষির নিকট যাবতীয় বস্তু তাঁহারই প্রকারভেদ মাত্র। তিনি বলেন—'তিনিই সব এবং আমিই তিনি'- তাঁহার সর্ব্বত্র প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা নহে (Pautheism , কিম্বা প্রকৃতিতে দেবত্বের আরোপও নহে (apotheosis of nature)।

ভবদীয়

কামাখ্যানাথ মিত্র

প্রিন্সিপাল রাজেন্দ্র-কলেজ

ফরিদপুর

স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, স্বাভাবিক ভাবে যখন জাগ্রদবস্থায় খানিক ক্ষণের জন্য চেতনা বিলোপ হয়ে আসে তারই নাম নিদ্রা। শরীর-বিজ্ঞানীরা বলেন, এ অবস্থাটা হচ্চে দেহ ও মনের বিশ্রাম। সুষুপ্তির সময় মস্তিষ্ক একেবারে রক্তশূন্য হয়ে যায় এবং সেই জন্য তার কোন কাজও হয় না। কোনও তন্মাত্রই এ সময় জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে বা ভেতর থেকে কোনও প্রেরণা কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়ে পেশীর ওপর কাজ করতে পারে না। পেশীরা এ সময় শিথিল হয়ে থাকে। আপেক্ষিক গুরুত্বের ওপর সমস্ত শরীরটা নির্ভর করে।

স্বপ্ন দেখা

মনের যখন সুষুপ্তি, তখন সমস্ত চেতনা একেবারে লোপ পায়,

মনে হয় যেন মনটাই নাশ পেয়েচে। মনোবৃত্তির সময় দেহের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাও দেখা যায় না। এটা হলো নিদ্রার খুব গভীর অবস্থা। কিন্তু এর ওপর, নিদ্রা যখন খুব গভীর নয়, আর একটা অবস্থা আছে, যাকে আমরা স্বপ্ন বলি। এখানে মনোবৃত্তি থাকে, যা পূর্ব্বদৃষ্ট বাহ্য জগতের স্মৃতি থেকে তৈরী হয়। কখনও কখনও স্বপ্ন-বৃত্তির উত্তেজনায় মানুষকে কথা বলতে ও বেড়াতেও দেখা যায়। কর্ম্মেন্দ্রিয় তখন পেশীর ওপর কাজ করে। স্বপ্নকালীন ভীতি ও হর্ষজনিত মুখের ও অপরাপর অবয়বের পেশীর ক্রিয়া আমরা যে কোনও লোকের দেখতে পেতে পারি। কিন্তু যারা স্বপ্ন দেখে বা সেই অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় তাদের জগৎ ও জাগ্রদবস্থার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। জাগ্রদবস্থায়ও মনোবৃত্তি থাকে। তাকে মনোনিবেশ পূর্ব্বকই হোক বা অমনোনিবেশ পূর্ব্বকই হোক তার ওপর আমাদের একটা অধিকার আছে কিন্তু স্বাপ্ন-মনোবৃত্তির ওপর আমাদের কোনও হাতই নেই। তা হলে কেউ আর দুঃস্বপ্ন দেখত না। (শাঙ্কর মতের সহিত তুলনা করে দেখ)। এর পর আমরা স্বাপ্ন-রূপ ফুটে ওঠার হেতু ও তার সঙ্গে জাগ্রদবস্থার ভেদই বা কি, আর একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।

বাইরের স্পর্শ দিয়ে স্বপ্ন দেখান

লোকের সাধারণ ধারণা, স্বপ্ন মাথার মধ্যে হয়, আর এটা মস্তিষ্কেরই উত্তেজনার ফল। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা জানা যাচ্চে যে জাগ্রদবস্থাতে যেমন বাইরের জিনিষ ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিলে আমরা প্রত্যক্ষ করি, ঠিক তেমনি নিদ্রাঅবস্থায়ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে নানা উপায়ে উত্তেজিত করলে বিভিন্ন প্রকার স্বপ্নের উৎপাদন করা যেতে পারে। (শাঙ্কর মত দেখ) চোক কাণ বা ভেতরকার দেহের কোন অংশ উত্তেজিত করলে মস্তিষ্ক স্বাধীন ভাবে কাজ আরম্ভ করে—যেমন জাগ্রদবস্থায় একটা ফুল বা অন্য কিছু দেখলে মনে কত ভাবের প্রবাহ বইতে থাকে। কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রভেদ এই, স্বপ্নে লজ্জা এলে মাটিতে পড়ে হাড়গোড় ভাঙ্গবার আগে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। জাগ্রত জীবনের চলনেও লজ্জা

থাকে, কিন্তু স্বপনের নৃত্যেও লজ্জা থাকে না। আরও বোঝা যায় যে, জীবের ঘুমন্ত অবস্থায় ঘুমন্ত সংস্কাররাশির খেলার নাম স্বপ্ন এবং জাগ্রত সংস্কারের নাম, আমাদের শাস্ত্র যাকে 'স্মৃতি' বলেচেন।

অধিকাংশ স্বপ্ন রূপের খেলা

অধিকাংশ সময় আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তাতে আস্বাদ বা স্পর্শ খুব কম সময়ে করি। কখন কি ভাবে দেহের কোন অংশের উত্তেজনা হবে তার কোনও ঠিক না থাকায় স্বপ্নেরও কোন ঠিক থাকে না। আমরা স্বপন দেখি কখনও রূপ, কখন শব্দ, কখন ক্লান্তি কখন বা উত্তাপের। কিন্তু বেশীর ভাগই, যদি স্মরণ থাকে, তা হলে বুঝতে পারা যায় যে তারা রূপের। বাইরের উত্তেজনাগুলো আমাদের মনের রূপ-তন্মাত্রগুলোকেই ফুটিয়ে তোলে। ঘুমন্ত মানুষের দেহে উষ্ণ বা শীতল স্পর্শ দিলে দেখা যায়, সে স্বপ্ন দেখে, যাভার আগ্নেয় গিরির মত বা হিমালয়ের বরফের মত জায়গায় সে বেড়াচ্চে। যদি পেশীর কোনও কোঁচকান জায়গায় স্পর্শ দেওয়া যায় তা হলে বোধ হয়, যেন একদল কাঁকড়া বিছে বা মৌমাছি কামড়াবার জন্য তাড়া করেচে। যদি জিবের ওপর কোনও ক্রিয়া করা যায় তা হলে ভাল মন্দ আস্বাদ পাওয়া যায়। এই রকম বিভিন্ন ইন্দ্রিয় তাড়নার দ্বারা বিভিন্ন রকমের স্বপ্ন দেখান যায়।

স্বপ্নের উত্তেজক

উত্তেজক না থাকলে স্বপ্ন দেখা যায় না। আমাদের মনে হয় উত্তেজনার কোনও কারণ নেই অথচ স্বপ্ন দেখলুম কেন? শোবার আগে ঘর অন্ধকার করে দিলুম, ঘরের উত্তাপও ঠিক রাখা গেল, পাতলা কাপড় জামা পরা গেল, যাতে কোনও গোলমাল না হয় তারও ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখলুম কেন? মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, উত্তেজনার হেতু যতই নিবারণ কর, চোখের তারার ওপর রক্তের চলাচল, তার ওপর পাতার চাপ, নাড়ীর চাঞ্চল্য, বুকের ধপ্ ধপ্ শব্দ, বিছানার চাদর গুটিয়ে যাওয়া, বেকায়দায় হাত পা ঘাড় থাকা, হজমের গোলমাল, এ সব বন্ধ কেউ করতে পারবে না—কাজেকাজেই স্বপ্নও বন্ধ হবে না।

স্বপ্নে এত রূপ দেখা যায় কেন

বাইরের উত্তেজনাগুলো স্বপ্নে বেশীর ভাগ রূপে পরিণত হয় কেন,— বৈজ্ঞানিকেরা তার দুটো কারণ নির্দ্দেশ করে থাকেন। প্রথম হচ্চে সব ইন্দ্রিয়ের চাইতে চোখ অতি কোমল (sensative), একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঘরের আলোর একটু আধটু পরিবর্ত্তন বা চোখের পাতার রক্ত চলাচলের কিছু ব্যতিক্রম হলেই তা মনের রূপের ঘরে আঘাত করে। আর তা ছাড়া মস্তিষ্কের বহিরাবরণের (cortex) ধূসর রংটাও একটা কারণ। বোধ হয় রূপ দিয়ে যে স্বপ্ন আরম্ভ হয় মস্তিষ্ক-কেন্দ্রের ধূসরত্ব এবং চোখের কোমলতাই তার হেতু, নইলে বোধ হয় স্বপ্নে শব্দেরই অধিক আধিপত্য থাকত ; চোখ যদি অত কোমল না হত তা হলে বোধ হয় ঘুমের সময় ঐ ধূসর মনে প্রবেশই করতে পারত না। চোখ ও মস্তিষ্কের ধূসর বহিরাবরণ, দুটোই অত্যন্ত উত্তেজক বলে রূপের স্বপ্ন এত বেশী হয়।

দ্বিতীয় কারণ হচ্চে, আমরা জাগ্রত ভূমিতেও স্মরণ ও বিচার করি রূপের সংজ্ঞা দিয়ে। কারণ বাহ্য জগতের সঙ্গে চোখের যত সহজে সন্নিকর্ষ হয় তেমন অন্য কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে হয় না। আকাশে চিল উড়চে দেখচি, তার রূপটা, বাকি তন্মাত্রগুলো আমরা অনুমান করে নি। বাহ্য জগতের শতকরা ৯৯টা জিনিষের রূপ আমরা চোক দিয়ে দেখে অপরাপর গুণগুলো অনুমান করে নি। আবার যখন জিনিষ সামনে না থাকে তখন ত রূপ ছাড়া কল্পনা করবারই যো নেই। সেই জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র উত্তেজিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে রূপকেন্দ্রও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই জন্য চোখ হচ্চে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং লোকে প্রত্যক্ষ করাকে "দেখা" বলে। আর স্বপ্নটাকে সরল করে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, জাগ্রত ভূমি থেকে যেমন আমরা রূপ দিয়ে কল্পনা করি, তেমনি ওটা নিদ্রাবস্থার একটা অবশ কল্পনা।

(ক্রমশঃ) বাসুদেবানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে যখন মানবজাতির মধ্যে ধর্ম্মের অধঃপতন ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় ভগবান তখন স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হন। আবার অবতার পুরুষগণের লোকোত্তর জীবন পাঠে দেখা যায় যে তাঁহারা স্বীয় লীলাসহচর নিত্যপার্ষদগণ সমভি-ব্যাহারে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সত্ত্বঘনমূর্ত্তি অবতারগণ সাধন সহায়ে লুপ্তধর্ম্মের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং স্বীয় সাধনলব্ধ-শক্তি স্বল্প সংখ্যক শিষ্যগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদের জীবন বা আদর্শ সহজে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে না। মানব সাধারণের মধ্যে উক্তভাব প্রচারের উপযুক্ত রজোশক্তি অবতার সহচর নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারাই নানাভাবে ও নানা উপায়ে ভগবদ্বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে প্রচার করিয়া পৃথিবীতে ঈশ্বরের জন্মপরিগ্রহরূপ দৈব কার্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। আবার একমাত্র তাঁহারাই অবতারগণের অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সমূহ অজ্ঞ ও মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন। এই সকল লীলাসহচরগণ আমাদের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা চালিত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ ও ঈশ্বর-কোটি শ্রেণীর লোক। ইঁহারা অতীত কালে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া লোক-দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত বারংবার অবতারের সঙ্গে লোক-সমাজে অবতীর্ণ হন। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, বুদ্ধ ও আনন্দ, শংকর ও পদ্মপাদ, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ, যীশু ও পিটার প্রভৃতি অবতার ও তাঁহাদের নিত্যপার্ষদগণের জীবনী বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুজাতি যখন আধ্যাত্মিক, নৈতিক,

সামাজিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে অবনতির নিম্নতম সোপানে অতি দ্রুতগতিতে অবরোহণ করিতেছিল এবং যখন ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ দুর্ভেদ্য অন্ধতমিস্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল তখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপী শশধর ভারতীয় গগনে উদিত হইয়া স্বীয় নির্ম্মল ও শুভ্র আলোক সহায়ে দিঙ্‌মণ্ডল পুনরুদ্ভাসিত করেন এবং সহস্র বৎসরের দাসত্বজনিত জাতীয় অধঃপতনের গতি অবরুদ্ধ করিয়া পুনরায় এই প্রাচীনতম আর্য্যজাতির চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবার পথ নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মানুসারে সেই নিশানাথ সদৃশ অবতারের সহিত কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রও আকাশে উদিত হইয়া উহার শোভা পরিবর্দ্ধন করেন। কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী চন্দ্র অস্তমিত হইয়া স্থূললোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেও উক্ত তারকামণ্ডলী "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" ধর্ম্মের বাণী ঘোষণা দ্বারা রজনীমুগ্ধ পথিকের ন্যায় বহু মানবের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। আজ স্বামী সারদানন্দের মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সহচর আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র লোকনয়নের বহির্ভূত হইয়াছে। মহামহিমময় প্রবুদ্ধ-ভারতের দীপ্তশীর্ষ শোভিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিক কিরীট স্বীয় হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা হইতে আর একটি উজ্জল হীরকখণ্ড স্থূল দৃষ্টিতে খসিয়া পড়িয়াছে।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যৌবনের প্রারম্ভেই নরেন্দ্র প্রভৃতি মধুকরের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের শতদল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যুবক সাধকের প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ছেলেটির দেখ্‌ছি তীব্র বৈরাগ্য।" শরৎ সেই সময় কলেজে পড়িতেন এবং ধর্ম্মোপদেশের জন্য কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। পরে বোধ হয় শ্রীযুত কেশব সেনের বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় অবগত হইয়া তদীয় পূতসঙ্গলাভের নিমিত্ত তৎপদপ্রান্তে উপস্থিত হন। সেই সময় তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা শ্রীযুত শশীও (পরে ইনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন) ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই ভাই একই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিলেও প্রায় এক বৎসর যাবৎ তাঁহারা কেহই পরস্পরের আগমনের বিষয় অবগত ছিলেন না। পরে ঠাকুরই একদিন উভয়কে এই বিষয় জ্ঞাত করেন।

জহুরী-শিরোমণি শ্রীরামকৃষ্ণদেব হীরক ও মণি চিনিয়া লইতে অদ্ভুত পারদর্শী ছিলেন। সুতরাং উজ্জ্বল ও চাকচিক্যশীল বহুসংখ্যক কাচ ও স্ফটিকখণ্ড মধ্যে কয়েকটুক্‌রা মণি বাছিয়া লইতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তিনি এই বালকশিষ্যগণকে শীঘ্রই অবতারের নিত্য-লীলা-সহচর আপনার জন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহা-দিগকে সর্ব্বদা সাধনপথের নূতন নূতন তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অলৌকিক বিজ্ঞান সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কখনও দুইজন শিষ্যের জন্য একরূপ পন্থা নির্দ্দেশ করিতেন না। বিভিন্ন রুচি ও সংস্কার অনুসারে শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন সাধন মার্গে দীক্ষিত করিতেন। প্রত্যেক অন্তরঙ্গের সহিত তাঁহার এক বিশিষ্ট সম্বন্ধছিল। কাহাকে সাকার উপাসনায় কাহাকেও বা নিরাকারে, কাহাকে জ্ঞানমার্গে আবার কাহাকেও বা ভক্তি বা কর্ম্মমার্গে তিনি উপদেশ দিতেন। কিন্তু বিভিন্ন পথে গমন করিলেও সকলেই যেন অবশেষে এক অদ্বৈত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিষয়ে তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও "প্রকৃতি" ভাবাপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, আবার কাহাকেও বা "অখণ্ডের ঘর" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। যুবক শরতের সহিত তাঁহার কি অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কার সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। কারণ আমরা পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজের নিকট শুনিয়াছি যে এই সকল বিষয় অপর কাহাকে এমন কি স্বামী বিবেকানন্দকেও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। শরৎ মহারাজও এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুরের কয়েকটি বাণী আমরা তাঁহার নিকট বা অন্য কোনও বিশ্বস্ত-সূত্রে যাহা জানিয়াছি তাহা এস্থলে পাঠককে দিলে মন্দ হইবে না।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণ সমক্ষে জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা পার্ব্বতীসুত গণেশের প্রশংসা করিতেছিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া শরৎ মহারাজ বলিলেন, "মহাশয়, আমারও ঐ ভাব ভাল লাগে। গণেশের আদর্শই আমার আদর্শ বলিয়া মনে হয়।" ঠাকুর ইহাতে উত্তর করিলেন, "তোর গণেশের ভাব নয়, ভৈরবের ভাব। তোর ভিতর শিব আছে, জানবি। আর আমার মধ্যে শক্তি আছে। তোর সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য আমার মধ্যে বিদ্যমান।" এই সকল কথার গভীর অর্থ আমাদের ন্যায় অজ্ঞ মানবের বোঝা অসম্ভব। শিব ও গণেশ ভাবের প্রকৃত মর্ম্ম তিনিই অবগত ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে পূজনীয় শরৎ মহারাজের অদ্ভুত ত্যাগ বৈরাগ্য, অলৌকিক সংযম ও প্রেম, অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও শান্তভাব দেখিয়া যোগীশ্বর কৈলাসপতির অটল অচল মহিমা-মণ্ডিত ছবি স্বতঃই দর্শকের মনে উদিত হইত।

আর একদিবস ঠাকুর শরৎ মহারাজ ও শশী মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই দুই ভাইকে পূর্ব্বে ঋষিকৃষ্ণের দলে দেখিয়াছিলাম।" বাল্যকাল হইতেই শরৎ মহারাজের যীশুখৃষ্টের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি ঈশা কথিত বাইবেল শাস্ত্রের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই দুই ভাই পূর্ব্বকালে যীশুখৃষ্টের পার্ষদরূপে গ্যালিলি দেশে জন্মিয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? তবে আমরা ইহা অবগত আছি যে, ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর শরৎ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দ্দেশে মার্কিনদেশে যাইবার পথে রোম নগরে উপস্থিত হন। একদিন উপাসনা কালে উক্ত সহরের সুপ্রসিদ্ধ ভজনাগার সেণ্ট্ পিটার গীর্জ্জায় গমন করেন। সমবেত শতসহস্র নরনারীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় এবং তিনি কিয়ৎকালের জন্য সমাধিতে মগ্ন হন। কোন্ পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার মনকে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ ভগবান ঈশা মসির ভাবে উদ্বেলিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে?

পূজনীয় শরৎ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি একদিন ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে তাঁহাদের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ধ্যানে

কাহার কোন্ দেবমূর্ত্তির দর্শন হয় এই সকল বিষয় কথাবার্ত্তা হইতেছিল। হঠাৎ ঠাকুর শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোন্ মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাস্?" ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল তিনি যেন ইচ্ছা মাত্রই সাধককে ধ্যানে দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করাইতে সমর্থ ছিলেন। যুবক শরৎ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে চাই না; আমি সর্ব্বজীবে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চাই"। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "ওরে, উহা যে সব শেষের কথা। সাধনার শেষেই ঐরূপ উপলব্ধি হয়"। শরৎ মহারাজ বলিলেন, "তা হোক্ গে। আমি উহাই চাই। কোনও বিশেষ দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা নাই"। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, "আমি বাস্তবিকই কোনও দেবদেবীর বিশেষ মূর্ত্তি দর্শন করি নাই। তবে ঠাকুরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাঁহার কৃপায় উহার কিছু উপলব্ধি হইতেছে।" একজন অপরিণত বয়স্ক যুবকের মনে ধর্ম্মের এইরূপ গভীর প্রেরণা দেখিয়া কে মনে করিবে যে, ইনি আমাদের মতই একজন সাধারণ সংস্কার বিশিষ্ট মানব ছিলেন।

ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন শরৎচন্দ্র প্রথমে হিন্দু দেবদেবীতে বড় বিশ্বাসবান ছিলেন না; বরং নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিই তিনি সমধিক অনুরাগ সম্পন্ন ছিলেন। সেই জন্য দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর প্রতি ঠাকুরের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া শরৎ মহারাজ প্রথমটা কিছু কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত কালী মন্দিরে বা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গমন করিতেন এবং ঠাকুরকে সর্ব্বদাই উক্ত দেবদেবীর সম্মুখে ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দেখিতেন। অন্তরের সহিত না হইলেও ঠাকুরের প্রতি গভীর ভালবাসা বশতঃ শরৎ মহারাজ ও দেবদেবীর সম্মুখে ঐরূপে মস্তক অবনত করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রথমে তাঁহার অনুকরণে ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করিয়াছি। পরে তাঁহারই কৃপায় ঐ সকল দেবদেবীর মহিমা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি।" আর একবার তাঁহাকে বলিতে

শুনিয়াছি, "যৌবনকালে আমরা কেবলমাত্র পুরুষকারে বিশ্বাসবান ছিলাম। অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইচ্ছায় কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখন সমস্ত কার্য্যই নিজ পুরুষকার সহায়ে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতাম। ছোট বড় সমস্ত কার্য্যেই ঐরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুদিন পরে ঐ বিষয়ে প্রথম ধাক্কা পাই-লাম। যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে ইচ্ছামাত্র-সহায়ে অবলীলাক্রমে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই সকল কাজে অক্ষম বোধ করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের কৃপায় অচিরে বুঝিতে পারিলাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য্য করিবার কাহারও কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই"।

অদ্ভুত ঠাকুরের অদ্ভুত শিক্ষা প্রণালী ছিল। এই ক্রান্তদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলেও কিছু লুকাইয়া রাখিতে পারিত না। তিনি মানুষের মন লইয়া কাদার তালের ন্যায় নাড়াচাড়া করিতেন ও ইচ্ছা মাত্রই উহাকে বিশিষ্ট আকৃতিতে পরিণত করিতে পারিতেন। শরৎ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া দ্রুত গতিতে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখনও বা পঞ্চবটীতে ধ্যান জপে, কখনও বা মধুর কীর্ত্তনে আবার কখনও বা ঠাকুরের শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে শরৎ মহারাজ অন্য যুবক ভক্তগণের ন্যায় পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি, নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ ঠাকুরের অপর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইলেন। এই পরিচয় পরে যাবজ্জীবন বন্ধুত্বে ও আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ঠাকুর দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই সকল বালক শিষ্যগণের আধ্যাত্মিক জীবন গড়িবার ভার নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করেন। ঠাকুরের অপর একজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মুখে শুনিয়াছি, "আমরা সকলে নরেন্দ্রের নূতন নূতন ভাবোদ্দীপক কথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতাম। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে নূতন কথা শুনিতে ভালবাসিতাম। তিনি অনেক সময়ে একই বিষয়ের বারংবার অবতারণা করিতেন, বারবার একই বিষয় শুনিয়া আমি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতাম।

কিন্তু শরৎ মহারাজ পুরাতন কথাও বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, 'তুমি একই কথা বারবার কিরূপে আগ্রহের সহিত শুনিতে পার! ঐ সকল কথা ত অনেকবার শুনিয়াছ।' তাহাতে শরৎ মহারাজ উত্তর করিতেন, 'তুই বুঝিস্ না, নরেন্দ্রের নিকট একই বিষয় বারংবার শুনিলেও আমি প্রত্যেক বারই উহাতে নূতন অর্থ দেখিতে পাই। নরেন্দ্রের কথা কখনও আমার নিকট পুরাতন বলিয়া মনে হয় না'।" স্বামী বিবেকানন্দের উপর তাঁহার কি অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল!

দেহত্যাগের সময় সমীপাগত জানিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কয়েকজন সর্ব্বত্যাগী যুবক শিষ্যকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে দুরারোগ্য গল-রোগে আক্রান্ত হইলেন তখন এই সকল যুবক অন্য গৃহস্থ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবা ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। রোগ শয্যায় শায়িত হইয়াও ঠাকুর তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মিগণের চরিত্র গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অপার্থিব ভালবাসা-সূত্রে গ্রথিত করিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কাশীপুর বাগানে স্থানান্তরিত করার পর নরেন্দ্র, রাখাল কালী, শরৎ, শশী প্রভৃতি যুবকগণ বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিয়া গুরুসেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিনিয়োগ করিলেন। এই সময় যে দ্বাদশজন শিষ্য ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন শরৎ মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ক্রমে দীপ নির্ব্বান হইল। ঠাকুর ভক্তগণকে কাঁদাইয়া ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে স্থূল লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে শিষ্যগণ নিজেদের পিতৃহীন অনাথ শিশুর ন্যায় অসহায় বোধ করিলেন। এমন কি তাঁহার যুবক শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় পাঠাদি কার্য্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন। শরৎ মহারাজ সেই সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। বীর নরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় যুবকগণ আবার গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে সমবেত হইলেন। তাঁহার তেজোময় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" জীবন উৎসর্গ করিতে যুবকগণ পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলেন।

বরাহনগর মঠে যে তপস্যার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে তাহার তুলনা দুর্লভ। যুবকগণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানজপ ও শাস্ত্রাদি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন, সামান্য আহারই জুটিত; আবার কোন দিন তাহাও জুটিত না। কোন দিন কেবল মাত্র ভাতের যোগাড় হইত, অন্য কোনও ব্যঞ্জন হইত না। আর যে দিন কোন আহার্য্যই জুটিত না সে দিন তাঁহারা মঠের দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কীর্ত্তনে বা তপস্যায় অতিবাহিত করিতেন। নিকটবর্ত্তী শ্মশানে যাইয়া ধ্যান ও জপে যুবকগণ কত বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ শরতের ধ্যান ও ধর্ম্মানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এক দিন এই সকল যুবক অগ্নি-সাক্ষী করিয়া নিয়মিত অনুষ্ঠানের সহিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শরৎচন্দ্র—স্বামী সারদানন্দরূপে নবজন্ম লাভ করিলেন।

কিছুদিন পর বরাহনগর মঠের কঠোর জীবনও যুবক সন্ন্যাসিগণের নিকট ভগবান লাভের পক্ষে যথেষ্ট তপস্যা বলিয়া মনে হইল না। ভগবদ্দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে দগ্ধ করিতেছিল। তাঁহারা কৌপীন ও বহির্বাস মাত্র সম্বল করিয়া ভিক্ষুবেশে দেশ পর্য্যটনে নির্গত হইলেন। ভিক্ষালব্ধ পবিত্র অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া সাধন ভজনে দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ দুই জন গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে ৺পুরীধাম যাত্রা করিলেন। তথায় কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুকাল পর তিনি তপস্যা মানসে উত্তরাখণ্ড অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কেদারনাথ ও বদরী নারায়ণ দর্শন করিয়া আলমোড়ায় কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত মিলিত হইলেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়জন গুরুভ্রাতার সহিত হিমালয়ের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। স্বামী সারদানন্দ হৃষীকেশে কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। হিমালয় ভ্রমনকালে একটি সামান্য ঘটনায় তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন দুইজন গুরুভ্রাতার সহিত তিনি এক পাহাড়ের উচ্চ শিখর দেশ হইতে অবরোহণ করিতেছিলেন। পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও

ও বিপদ সঙ্কুল ছিল। তাঁহারা যষ্ঠি সহায়ে পথ অতিক্রমণ করিতেছিলেন। ঐ রাস্তায় কিঞ্চিন্মাত্র পদস্খলন হইলে মৃত্যু একরূপ অবশ্যম্ভাবী ছিল। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধার সহিত তাঁহাদের রাস্তায় দেখা হয়। বৃদ্ধার নিকট যষ্ঠিও ছিল না। তিনি অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ অকুণ্ঠিতচিত্তে জীবনের সম্বল যষ্ঠিখানি উহার হস্তে অর্পণ করিলেন। বন্ধুগণ ইঁহাকে আপত্তি করিলে তিনি ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিলেন, "বেচারীর বড় কষ্ট হইতেছে। আমা হইতেও উহার লাঠির অধিক প্রয়োজন।" পরে এটোয়া ও এলাহাবাদ হইয়া স্বামী সারদানন্দ বরাহ নগর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দুন্দুভিনাদে মার্কিনদেশে বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করেন। চিকাগো ধর্ম্ম সভায় ও আমেরিকার বিভিন্ন নগরাতে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আমেরিকার নানাস্থানে বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্বামিজীর নিকট চারিদিক হইতে সাদর আহ্বান আসিতে লাগিল। কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপে বেদান্ত প্রচারের জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তাঁহার কর্ম্মের সহায়তা মানসে স্বামী সারদানন্দকে পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় চিঠি লিখিলেন। স্বামী সারদানন্দ অচিরেই তাঁহার গুরু ভ্রাতার সহিত লণ্ডনে মিলিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুযোগ্য গুরু-ভ্রাতাকে পাশ্চাত্য দেশের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহাকে নিউইয়র্কে প্রেরণ করিলেন। স্বামী সারদানন্দ মার্কিনদেশে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা ও অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চরিত্র ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক নরনারী ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য তদীয় পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদার শিক্ষা ও সরল উপদেশে সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার ভূয়োদর্শিতা ও গভীর জ্ঞানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কয়েকটি সভায় হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত তিনি আহুত হন। তিনি মার্কিন যুক্তরাজ্যের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নিউইয়র্ক সহরে নিয়মিতরূপে বেদান্তধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনা

আরম্ভ করিলেন। এই সময় স্বামী সারদানন্দ একটি অলৌকিক ঘটনার বিষয় পরিজ্ঞাত হন। একদা তিনি কোনও নগরে জনৈকা ভদ্রমহিলার বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। সেই মহিলাটি তাঁহার একখানা পুস্তকে ঠাকুরের ছবি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আপনি এই ছবি কোথায় পাইলেন। আপনি এই লোকটিকে চেনেন কি ? আমি বহুদিন যাবৎ ইঁহার খোঁজ করিতেছিলাম। আজ আপনার নিকট তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।" স্বামী সারদানন্দ এই কথায় চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই ছবিতে অঙ্কিত মহাপুরুষের বিষয় কিরূপে অবগত হইলেন ?" উক্ত মহিলা উত্তরে বলিলেন, "আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন স্বপ্নে এই মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। স্বপ্নে ইঁহার বিষয় অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল মাত্র বুঝিয়াছিলাম যে ইনি প্রাচ্যদেশবাসী কোনও মহাপুরুষ হইবেন। তাঁহার দর্শনের পর এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি বিগত কয়েকবৎসর যাবৎ তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। ভারত, চীন বা জাপানের লোক সন্ধান পাইলেই তথায় যাইয়া ঐ স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের বিষয় খোঁজ করিয়াছি। অদ্য আপনার নিকট তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া বিশেষরূপে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আপনি নিশ্চয়ই ইঁহার বিষয় অবগত আছেন। আপনি আমাকে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু বলুন।" স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের অলৌকিক মাহাত্ম্যে চমৎকৃত হইয়া ঐ মহিলাটির নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় বর্ণনা করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। উহার কার্য্যভার পরিচালনার জন্য একজন সুদক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভব করিয়া তিনি স্বামী সারদানন্দকে এদেশে ফিরিয়া আসিতে চিঠি লিখিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি স্বামিজী কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণমিশনের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। মিশনের নানা কার্য্যভার ব্যতীত পাশ্চাত্য ভক্ত ও মিশনের সাধু ব্রহ্মচারিগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব স্বামী সারদানন্দের

উপর অর্পিত হয়। তিনি বেলুড়মঠে নিয়মিতরূপে শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিগণকে ধ্যানজপে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, তিনি একবার এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন, যেন মঠের ঠাকুর ঘরে সাধুগণ পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যান জপের অভ্যাস করেন। তিনি নিজে অনেক সময় উদায়াস্ত জপ করিতেন এবং চণ্ডীর হোম ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন।

(ক্রমশঃ) নিখিলানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

স্থান—কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বারান্দা। ৯ই জুলাই, ১৯২০

একটি বালকের নিকট শুকদেবের জন্ম বৃত্তান্ত বল্লেন। শুকদেব-চরিত্রের মাধুর্য্য বর্ণনা কোরতে কোরতে বল্লেন, "শাস্ত্রকার এই বলে শুককে প্রণাম কোরচেন—

সং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
উদ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥

ব্যাসপুত্র শুকদেব সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন তখন ব্যাস তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া 'পুত্র' 'পুত্র' বলিয়া তাঁহাকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। শুকদেব তখন যোগবলে বৃক্ষসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বাক্যের উত্তর দিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্বরূপ মুনি শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

ঠাকুর বোলতেন, "শুকের তিন তাইতে হয়েছিল।" শুকদেব যখন জনকের কাছে গিয়েছিলেন তখন সাতদিন দণ্ডায়মান ছিলেন। জনক বলেছিলেন—'তোমার বাপ যা বলেছেন তাই, আমি যা বলেছি তাই, তুমি যা অনুভব কচ্ছ তাই।' অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্রবাক্য আর আত্ম-অনুভূতি সাপেক্ষ হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান।

—ধ্যানট্যান কর ত ? মূর্তির ধ্যানও হতে পারে। ওঁ-ধ্যানও আছে। ধ্যান কোরতে কোরতে মন ওঁকারে লয় হয়ে যায়।

(একজন ভদ্র লোকের প্রবেশ।)

স্বামী তুরীয়ানন্দ বোলতে লাগলেন, 'তজ্জপস্তদর্থভাবনং'। ওঁ জপ ও তার অর্থ ভাবনা কোরতে কোরতে চিত্তস্থির হয়ে যায়, অর্থাৎ মন তা হতে বিরত হয় না।

'ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ'। ব্যাধি প্রভৃতি যে সমস্ত অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন কোরে থাকে সে সমস্তই ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা নাশ পেয়ে যায়। আর ঐ অবস্থাতেই স্বরূপদর্শন হয়ে থাকে।

আর বলেছেন—'ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।'

যোগের অন্তরায় কি ? এরা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মে দেয়। প্রথমেই হচ্ছে ব্যাধি—হয় পাগল হয়ে গেল, নয় এমন পীড়া হয়ে গেল যে কিছুই কোরতে দিলে না। স্ত্যান হচ্ছে চিত্তের কার্য্যকারিতাশক্তির অভাব। অকর্ম্মণ্যতা আর কি। এ জিনিষটা এরকম কি ওরকম, এমন কল্লে হবে কি হবে না, এরি নাম হচ্ছে সংশয়। যা কোর্‌লে সমাধি হয়, যোগ হয়, তা না করার নাম হচ্ছে প্রমাদ। আলস্য—তমোগুণ বেশী হলে যত্ন চেষ্টার যে অভাব তারই নাম আলস্য। বিষয়ের প্রতি যে তৃষ্ণা-বিশেষ তাই হচ্ছে অবিরতি। আর এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে জানার নাম ভ্রান্তি দর্শন। উচ্চ উচ্চ সমাধি ভূমির লাভ না হওয়াকে বলে অলব্ধভূমিকত্ব। আর রইল অনবস্থিতত্ব—সেটা হচ্ছে সমাধি ভূমি পেয়ে তাতে অবস্থান কোরতে না পারা। এরাই চিত্তের বিক্ষেপ। এরাই যোগ কোরতে দিচ্ছে না।

অন্তরায় সব দূর হয়ে যায় যদি এক প্রণব ভাবনা কোরতে পারে। মোটে ভাবনাই কোরতে দেবে না।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচকৈব।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব স্বাদ্বীপুনর্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥

যেমন পিত্তির অসুখ হয়েছে, মিছরী খেতে তেত লাগে, কিন্তু এই হচ্ছে ওর ওষুধ। নিয়মিত সেবন কোরলে অসুখ সেরে যাবে, মিছরীও মিষ্টি বোধ হবে। কৃষ্ণনামও তেমনি অবিদ্যাগ্রস্ত যদি গ্রহণ করে—ওষুধ গেলার মতও 'অনুদিনং সেবেত' তা হলে 'স্বাদ্বীপুনর্ভবতি।' রোগও যাবে, কৃষ্ণনাম মাধুর্য্যও গ্রহণ কোরতে পারবে। একেবারে অবিদ্যারোগের মূল নাশ করে দেবে। সেইজন্যই জোর করেও কোরতে হয়। যে ছেড়ে দেবে তার ত গেল।

গীতা বলছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনস্থির হয়।

আরও বলছেন—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

অর্থাৎ ধৈর্য্যের সহিত বিচারের দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে বিষয় সমূহ হতে নিবৃত্তি করিবে। মনকে আত্মস্থ করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

যোগসূত্রকার বলছেন, 'দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সংকারাসেবিতো দৃঢ়-ভূমিঃ।' দৃঢ়ভূমি লাভ করা চাই। প্রথমে বেড়া দিতে হয়, কিন্তু গাছ বেড়ে গেলে আর বেড়ার দরকার নেই। নিষ্ঠা চাই। যখনই স্থির হল এ ঠিক, তখনই স্থির করে ফেলল—এ কাজে প্রাণ দেব। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি চাই।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

হে অর্জ্জুন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি কিন্তু বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত।

এক বুদ্ধি নিশ্চয় করে তাতে জীবন দিতে হবে।

যোগসূত্রকার আরও বলছেন, 'ব্রহ্মচর্য্যাৎ বীর্য্যলাভঃ।' নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে। কাজে লাগবার পূর্ব্বে নিজেকে তার উপযুক্ত করে নিতে হবে। রামমূর্ত্তি মটর গাড়ী টেনে রাখছে বলে যদি আমি তা ফস্ করে কোরতে যাই তা হলে সেটা আহাম্মকের কাজ হবে। তা বলে কি আর কেউ কোরতে পারবে না! রামমূর্ত্তি কি করে ও কোরছে লক্ষ্য করে দেখতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরী কোরতে পারলে ও অনায়াসে করা যেতে পারে। যেমন গোবরা কোরছে। অনেকেই নিজের নিজের শক্তি জানে না। হনুমানের শক্তি জাম্ববান জানিয়ে দিলেন। অঙ্গদ সকলকে জিজ্ঞাসা কোরছে যে, প্রভু রামের জন্য কে সমুদ্র পারে গিয়ে তাঁর কাজ সেরে আবার আসতে পারেন? কেউ আছেন তিনি যেতে পারেন কিন্তু আসতে পারেন না। তখন জাম্ববান বল্‌লেন যে এখানে একজন লোক আছেন যিনি যেতেও পারেন, আসতেও পারেন। এই বলে তিনি কি করে হনুমান জন্মাবামাত্রই সূর্য্যকে গ্রাস করবার জন্য লাফ দিয়েছিলেন—ইত্যাদি হনুমানের বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলতে লাগলেন। ঐ শুনে হনুমান ত আকাশ-পথে চল্‌লেন, রাস্তায় সুরমা সাপের রূপ ধরে এসে হাজির, বলছেন আমার মুখের মধ্যে দিয়ে যাও। হনুমান প্রণাম করে বল্‌লেন, আমি এখন রামের কাজে যাচ্ছি, প্রথমে তাঁর কাজ সেরে আসি, তারপর তোমার মুখের মধ্যে দিয়ে যাব। কেমন বিনয় দেখ। Policy of least resistance. (স্বল্পতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়ারূপ নীতি)। সুরমা বল্‌লেন, তা হবে না, এখনই এদিক দিয়ে যেতে হবে। মহা বিপদ্! হনুমান কি করেন, নিজের শরীরটাকে বাড়িয়ে ফেল্‌লেন। ওদিকে সুরমাও মুখ ততই বড় করে ফেলতে লাগলেন। মুস্কিল দেখে হনুমান শরীর এতটুকু ছোট করে সুরমার কাণের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন।

সেই উত্তম ভৃত্য যে প্রভুর মনের ভাব বুঝে কাজ করে; সে মধ্যম ভৃত্য যে প্রভুর আদেশ শুনে তার অনুবর্ত্তন করে; আর যে প্রভুর আদেশ শুনেও শোনেনা সেই হচ্ছে অধম. সীতা অন্বেষণ কোরতে হবে—

সকলেই চল্‌ছেন কিন্তু হনুমান যাবার সময় নিদর্শন চাইলেন। তাতেই রাম বুঝলেন হনুমানের দ্বারাই ঠিক ঠিক কাজ হবে। কাণে কাণে সব কথা বলে দিলেন। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে নিজের বীরত্বটাও দেখালেন রাবণকে খুব ধর্ষণ করে।

যোগশাস্ত্র বলছেন, সব শক্তি আমাতে আছে। শম দমাদি দ্বারা মন বশ কোরতে হবে, তবে ত তার শক্তির প্রকাশ হবে। আমার শক্তি সঞ্চয় করার জন্য অটুট ব্রহ্মচর্য্য চাই।

চেলা বনা বড় শক্ত। গল্প শোননি? একজন চেলা হতে গিছল। সে গিয়ে এক গুরুকে বলে আমাকে চেলা বানিয়ে নাও। গুরু তখন বলছেন, তুমি কি চেলা হতে পারবে? চেলা হতে হলে জল তুলতে হয়, কাঠ আনতে হয়, সেবা করতে হয়—এ সব কি তুমি পারবে?—আজ্ঞে গুরুর কি কোরতে হয়?—তাঁর আর কি কোরতে হবে—তিনি বসে থাকেন, কখনও কখনও এক আধটু উপদেশ দেন, এই আর কি। তখন লোকটি বলছে, চেলা বনা যদি কষ্ট হয় তা হলে আমাকে গুরু করে নিন্ না। আসল কথা হচ্ছে সবাই কিছু না করে সব মেরে নিতে চায়। উপযুক্ত লোক একটু একটু করে দোষগুলি নষ্ট করে ফেলেন। ঝট্ করে ফেললে ও থাকবে, যাবে না। সেইজন্যই গীতা বলছেন, শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ ইত্যাদি।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও প্রকাশ পায় না, এই সকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নির আর কথা কি! তিনি (আত্মা) প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার প্রকাশেই এই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা দৃশ্য আর দ্রষ্টা এক করে ফেলেছি। পৃথক্ করে ফেলা যেতে পারে। আমি দ্রষ্টা দৃশ্য নই। বুদ্ধি পর্য্যন্ত দৃশ্যের মধ্যে এল।

মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং। অর্থাৎ মূল কারণের আর কিছু মূল থাকতে পারে না বলে মূল কারণ অমূল, এ সকল প্রথম যাঁরা বের করেছেন তাঁরা কত চিন্তাই যে করেছেন—কত ভাবনা ভেবেছেন, তাঁরাই জানেন।

প্রকৃত বিচার না করলে অমনি বিচার ফাঁকা। ওতে কিছুই হয় না।

ছেলেরা বলে না—ঈশ্বরের দিব্যি। কি কথা দেখ; শুনেছে—বিচার করে ত আর দেখছে না, তাই বলছে।

বৈরাগ্যবাধে—ইত্যাদি

কি কাণ্ড মশাই। পাখী যেমন দুটি পাখার সাহায্যে উড়ে আকাশে যায়, তেমনি বিমুক্তি-সৌধে যেতে হলে বিবেকবৈরাগ্যরূপ দুটি পাখার সহায়তা চাই। একবার ঠিক ঠিক বিবেক বৈরাগ্য হয়ে গেলে আর ভয় নেই। মরীচিকার পেছনে জলের অন্বেষণে ততক্ষণই লোক দৌড়ায় যতক্ষণ মরীচিকাকেই সত্য জলাশয় বলে ভ্রম হয়। একবার ভ্রম ভেঙ্গে গেলে, কি আবারও কেউ জলের জন্য ওখানে যায়? আসল কথাই হচ্ছে, মা যাকে নিজে হাত ধরে রাখেন তারই রক্ষে। গিরীশ বাবু বলতেন, "আমার ছোট ভাই বাবার হাত ধরে যেত, আমি কিন্তু তাঁর কোলে চড়ে যেতাম। আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম, তিনি কিছুতেই তাক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতুম—বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না - তখন হয় ত ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে যেতুম। এ অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন—লাটুকে বলতেন, ওরে গাড়ীতে দেখ্ কিছু আছে কি না—এখানে খোঁয়ারী এলে তখন কোথায় পাব? তিনি জানতেন যে, গাড়ীতে মদের বোতল আছে। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে সব চোখ সাদা করে দিতেন। শেষে বলতুম—আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটী করে দিলে!" সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিজ্ঞেস কোরতেন—ওঁকে কিন্তু কখনও জিজ্ঞেস কোরতেন না। বলতেন, "আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন না, করলে সব মহাভারত বলে দিতুম। কিছুতেই মানা কোরতেন না। সাধে কি ওঁকে এত মানি।"

লছমন ঝোলায় একবার কার্ত্তিক মাসে শরৎ মহারাজ আমরা সকলে খুব ভাং খেয়েছি। ঠাকুরের কথা কইতে কইতে সারারাত চলে গেল—চোখ সাদা—সব নেশা মাটি। Counteracted (ঠাকুরের কথার নেশায় প্রতিহত হয়ে) হয়ে সব নেশা চলে গেল।

ঠাকুর বলতেন, ঢোঁড়া সাপে কামড়ালে কিছুই হয় না, কিন্তু কেউটে সাপে কামড় দিলে এক ডাক, দু ডাক, তিন ডাক—বস্ সব চুপ।

শশধর আস্‌লে বলতেন—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ইত্যাদি। মেঘ কি আর সূর্য্যকে ঢাকে—সূর্য্য ত প্রকাশিতই থাকেন, আমাদেরই চক্ষু আবরিত হয়, তা বই ত নয়।

প্রমথ বাবুর কথা উঠল। বল্‌লেন—যেটা শুনেছে সেটা ধরেছে। বিবেক হয়েছে কি না। ঠাকুর বলতেন, তেল কালি ঠিক ঠিক মত থাকলে স্পষ্ট ছাপ পড়ে। তেল কালি ভাল না থাকলে ছাপ ভাল পড়ে না। বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে ধারণা খুব ভাল হয়। তেমন তেমন না থাকলে ধারণাও তেমন হয় না। গোবিন্দ—গোবিন্দ!

৯ই জুলাই ১৯২০। বারান্দা—৫টার সময়

ধ্যান ধারণা খুব কোরছ ত? কোন মূর্ত্তির ধ্যানও হতে পারে। ওঁকারের ধ্যানও আছে। ধ্যান কোরতে কোরতে মন ওঁকারে লয় হয়ে যায়। "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং"। অন্য বিষয় হতে গুটিয়ে এনে কোন বিষয়ে যদি চিত্তস্থির করা যায় তখন সেই বিষয়ে যে চিত্তবৃত্তি বারবার আকারিত হয় তাকে বলে ধ্যান। আর স্বামিজী বলতেন যে, ময়দার ডেলার মতন বস্তুবিশেষে মনটাকে আটকে ফেলার নাম হচ্ছে ধারণা।

অকাশ থেকে কিছু ত ধপ্ করে পড়বে না। ধারণা কেন হয় না, কারণ, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যই—হচ্ছে উহার একমাত্র উপায়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করা চাই—তবে ত ধারণা হবে। এর নাম হচ্ছে বীর্য্য। বীর্য্য যদি না থাক্‌ল ত কি কোরবে? মোট কথা হচ্ছে সম্পূর্ণ আত্মসংযম চাই। গীতা বল্‌ছেন—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

অর্থাৎ অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে যোগাবস্থা লাভ দুর্লভ, ইহাই আমি মনে করি, কিন্তু সংযতাত্মা ব্যক্তি উপায় অবলম্বন করিয়া যত্ন করিতে থাকিলে উহা লাভ করিতে পারে।

খামখেয়ালী করে যেমন যেমন মনে হচ্ছে তাই করে যাচ্ছে—কাজেই গোল। শাস্ত্র পড়ে রয়েছে তা দেখবে না, গুরুর উপদেশ নেবে না—শেষে যোগের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ যিনি নিয়মিত ভাবে আহার বিহার করেন, যাঁহার কর্ম্ম চেষ্টা সমুদয় নিয়মিত, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগ তাঁহারই দুঃখ-নাশক হয়।

কি সব চমৎকার উপদেশ রয়েছে। ব্যাধি হয় তা চলে যাবে—কিন্তু লেগে থাকা ত চাই।

সমালোচনা

"অভিনয় ও নৃত্য"

১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে "বিবিধ প্রসঙ্গে"র ভিতর "অভিনয় ও নৃত্য" সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা নিরপেক্ষ। তবে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েকটি অংশ বিচার সাপেক্ষ।

তিনি লিখিয়াছেন, "বঙ্গে উহার (নৃত্যের) পুনঃ প্রবর্ত্তন উপলক্ষে খবরের কাগজে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে।" কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে নৃত্যের অভিনয়ের বিরুদ্ধেই আন্দোলন হইতেছে "উহার পুনঃ প্রবর্ত্তন উপলক্ষে" নহে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "কোন কোন রকমের নৃত্য অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে। কোন কোন রকমের নৃত্য কেবল যে নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর নহে, তাহা নয়, বরং তাহা সুশোভন ও হিতকর।" তারপর শান্তি নিকেতনে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে যে নৃত্যগীত অভিনয় হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উহা তাঁহার চক্ষে সুন্দর ও নির্দ্দোষ লাগিয়াছে। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন, বাংলাদেশে এই কয়েকমাসের ভিতর নৃত্যাভিনয়ের অনেক evolution হইয়া গিয়াছে। উহা "নটীর পূজা" হইতে এই অল্পদিনের ভিতর "আলিবাবা"য় নামিয়া আসিয়াছে। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে হইলে মনস্তত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। উচ্চ আদর্শ সমাজে দিলেও সমাজের লোকের যদি তাহা গ্রহণ করিবার মত সূক্ষ্মানুভূতি না থাকে তবে সেই উচ্চ আদর্শ পয়ঃপঙ্কে অবলুণ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ "নটীর পূজা" দ্বারা নৃত্যের যে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সমসূত্রে গাঁথিয়া সমাজকে তাহার রসোদ্বোধন করিবার সাবকাশ দিলেন, "আলিবাবা"র রঙ্গমঞ্চে যথার্থই কি তাহার সদ্ব্যবহার হইল !!! সম্পাদক মহাশয় হয় তো বলিবেন, সমাজ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া কি সমাজে উহা দেওয়া হইবে না? ঠিক কথা। বৌদ্ধ যুগে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইবার উচ্চাদর্শ সমাজকে দেওয়া হইয়াছিল, বহুকাল পরে যখন উহা কদর্য্যতায় ভরিয়া গেল তখন সমাজের অন্য অংশ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে নাই, বিপুল উদ্যমে উহা দমিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল; দাক্ষিণাত্যে "দেবদাসী"র প্রথাও সেকালে উৎকৃষ্ট ছিল, অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবানের আজীবন সেবা বন্দনা করিবার জন্য কন্যাগণকে মন্দিরে রাখিয়া আসিতেন। সেই

প্রথা যখন আদর্শবিস্মৃত হইয়া অযথা স্বৈরাচারে পরিণত হইল, তখন ঐ কু-প্রথা ধ্বংস করিবার নানা আন্দোলন চলিয়াছে। সেইরূপ যখন সকলে "নটীর পূজা"র উচ্চভাব ও আদর্শ এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া "সাগর নৃত্য" ও "আলিবাবা"য় "মজ্জিয়ানা"র নাচ দেখাইতে ও দেখিতে ছুটিতেছে তখন কি উহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয় ?

আলোচনার কোন স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—"নৃত্য মাত্রেই যে দুর্নীতির পরিপোষক বিবেচিত হয় না, তাহার একটি প্রমাণ এই যে চৈতন্যদেবের অনুসরণে বৈষ্ণব সমাজের ও ব্রাহ্মসমাজের পুরুষেরা যে কীর্ত্তনাদির সময় নৃত্য করেন, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণে বিশেষ যত্নশীল ব্যক্তিরাও তাহাকে দুর্নীতির পরিপোষক মনে করেন না। তাহার একটি কারণ অবশ্য এই যে, পুরুষেরাই ঐরূপ নৃত্য করেন। যাহা পুরুষেরা করিলে দোষ হয় না, স্ত্রীলোকের তাহা করিলে দোষ হয় * * *।" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা কোন মহিলা, বা মহিলারা যদি কীর্ত্তনাদি বা নৃত্য করেন তবে সকলেই ভক্তি বিনম্রচিত্তে উহা দর্শন করিয়া ভাগবত আনন্দ আস্বাদন করে, কেহই উহাতে কটাক্ষপাত করে না, অথবা করিবার অবসরই থাকে না। কটাক্ষ করে "সাগর নৃত্য" ও "আলিবাবা"য় "মজ্জিয়ানা"র নাচ দেখিয়া। "নগরকীর্ত্তনাদির সময় নৃত্যে"র সহিত এই নৃত্য সমজাতীয় হইতে পারে না।

পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের উল্লেখ করিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "ঐ সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চারিত্রিক অধোগতি যাহাতে না হয়, তাহারা যাহাতে সচ্চরিত্র হইতে ও থাকিতে পারে, তাহার জন্য অবিরাম চেষ্টা হওয়া উচিত।" যাহারা পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাহাদের মধ্যে যাহাদের চারিত্রিক অবনতি হয়, থিয়েটারে যোগদান করিবার পূর্ব্বে বা কিছু পর হইতেই যে তাহাদের ঐরূপ অবনতি হয়—এরূপ নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সঙ্গ ও পরস্পর মিশ্রণের সুবিধা হইতে এই দোষের উদ্ভব হয়। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের থিয়েটার প্রসঙ্গেও ঠিক এই

জিনিষই প্রযোজ্য হইতে পারে। অর্থাৎ পরস্পরের মিশ্রণের সুবিধা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং অনিষ্ট হইবার অনুকূল অবস্থা হইতে তাঁহাদের মধ্যেও এই চারিত্রিক অবনতি আসা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তিনি হয় তো বলিবেন, "যাহাতে তাহা না হয় তাহার অবিরাম চেষ্টা হওয়া উচিত।" কিন্তু প্রত্যেক জিনিষেরই Theoritical ও Practical দুইটি দিক আছে। অনেক জিনিষ Theoritical হিসাবে বলা চলে কিন্তু Practical হিসাবে করা চলে না। তাঁহার এই যুক্তি 'বলা' যত সহজ, কাজে 'করা' তত সহজ নহে। এমন কি অসম্ভব বলিলেও চলে। অর্থাৎ অভিনয় কালীন ছেলেমেয়েদের যে অবাধ মেলামেশা হয়, তাহা হইতে বয়স-ধর্ম্মহেতু নৈতিক অবনতির যে সহজ সম্ভাবনা—তাহা কিরূপে রুদ্ধ হইবে?—"কাজল-কা ঘরমে যেতনা সেয়ানা হোই বুদ লাগই পর লাগই—"

যাহা উক্ত হইল, তাহা অমূলক নহে। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে "সঞ্জীবনী" পত্রের প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় বা সম্পাদকীয় বিভাগের কেহ উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় শিক্ষিত ও অর্থশালী সমাজের কতিপয় ব্যক্তি মিলিয়া সাধারণ প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে মূক অভিনয় বা তাব্লো ভিভাঁ করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানকে ও ভবানীপুরের সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। * * * এই স্থানেই ভদ্রমহিলার অভিনয় করিবার স্পৃহার প্রথম উন্মেষ হয়। উক্ত অভিনয় করিতে যাইয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা তৎকালীন লোক অবগত আছেন।" "History repeats itself" এই প্রাজ্ঞবাক্য মানিলে বলিতে হয়, আবার সেই বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার সুযোগ দিবার আবশ্যকতা কি?

ব্যক্তিগত বা জাতিগত "কাল্‌চারে"র দিক দিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে নৃত্যকলা ভদ্রমহিলাদের শিক্ষা দেওয়া অসঙ্গত বিবেচিত হয় না। পুরাকালেও তাহা হইত। কিন্তু তৎকালে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে কোন

সদুদ্দেশ্যের সাহায্যকল্পে অর্থের জন্য তাঁহারা নৃত্যাভিনয় করিতেন না। সদুদ্দেশ্যে টাকা তুলিবার জন্য মেয়েদের অভিনয় ও নৃত্যকলা প্রদর্শন— ইহাই এখন চলিতেছে। ব্যক্তিগত অর্থোপার্জ্জনের জন্য এরূপ অভিনয় ও নৃত্য এখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের মত শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রবীণ ব্যক্তিও যখন লিখিয়াছেন, "ভদ্রসমাজের লোকদের, বিশেষতঃ মহিলাদের নাট্যাভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা কি উচিত? অর্থোপার্জ্জন নিজের জন্য করা যাইতে পারে, কোন সদনুষ্ঠান বা হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্যও করা যাইতে পারে"—তখন শীঘ্রই দেখা যাইবে, কোন ভদ্রমহিলা অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন জমীদার বা রাজামহারাজের বাড়ীতে নৃত্যগীতের আমন্ত্রণ লইয়াছেন। ধরুন, কোন ভদ্রমহিলা আমন্ত্রণ পাইয়া কোন দেশীয় নৃপতির আসরে নৃত্য করিতে যাইলেন। তিনি যে সেখানে প্রভূত অর্থ, বিলাস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীতা না হইবেন সেরূপ কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "বালিকা ও মহিলাদের অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা আমাদের দেশের অন্য অনেক আন্দোলনের মত একতরফা হইতেছে—মহিলারা সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।" এই বলিয়া— "বঙ্গনারী" ছদ্মনামধারিণী কোন মহিলার "আগমনী" নামক পুস্তক হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"আমাদের মেয়েদের আর একটি অভাব, তাঁহারা দেহের সকল অঙ্গ অবলীলাক্রমে ও শোভনভাবে সঞ্চালন করার কৌশল কিছুই শিখেন না। ইহাতেও তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অনেক হানি হইয়া থাকে। উহা ঠিক মত আয়ত্ত করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সহিত কয়েকটি নৃত্যকলাও শেখা উচিত।"

আন্দোলন হইতেছে—রঙ্গালয়ে ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাভিনয় দেখাইবার বিরুদ্ধে, বালিকা ও মহিলাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার জন্য ব্যায়াম ও ব্যক্তিগতভাবে নৃত্যকলা শিখিবার বিরুদ্ধে নহে। সুতরাং

"বঙ্গনারী"র উদ্ধৃতাংশ হইতে সম্পাদক মহাশয় মহিলাদের নৃত্যাভিনয়ের সমর্থন-যোগ্য কিছুই পান নাই। অন্য একটি মহিলা—শ্রীমতী সুষমা দেবী—এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার অভিমত জানাইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের অবগতির জন্য ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার "উদ্বোধন" হইতে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, "যে সব মেয়েরা থিয়েটার কোরচে তাদের আমি তত দোষ দিই না, যত দোষ দিই তাদের বাপ, মা ও ভাইদের। ছেলে মানুষ মেয়েদের সংসারের কি অভিজ্ঞতা আছে? কিসে কি হয়—তারা কি জানে? বাহবা পেয়ে তারা নেচে ওঠে। অভিভাবকরা প্রশ্রয় না দিলে তারা কি কখনো রঙ্গমঞ্চে গিয়ে নাচগান কোরতে পারে? * * * আমার যে আত্মীয়াটির সঙ্গে এতক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা কোরছিলুম, সে,—নে পড়ে। তার কাছে শুনলুম, কলেজের অনেক মেয়েই এই রকম থিয়েটারের বিপক্ষে। যারা পক্ষে—তাদের কোন-না-কোন আত্মীয় থিয়েটারের দলে আছে। বিপক্ষ মেয়েরা বলে, 'যারা থিয়েটার করে, নটীদের মত যেখানে সেখানে তাদের আলোচনা হয়, অন্যান্য থিয়েটারের পেশাদার নর্ত্তকীদের মত বিজ্ঞাপনে তাদেরও নানা ঢং-এর ছবিছেপে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে—এ আমরাই সহ্য কোরতে পারি না, তারা কি কোরে করে, ভাই'।

"আর্ট ভাল তা আমরাও জানি, কিন্তু সেই আর্টের জন্যে আমার কোন ছেলেমেয়েকেই নৈতিক বিপদের পথে বা সাধারণ নট-নটীদের দলে ফেলে দিতে চাই না—তাতে আর্ট থাক্, আর যাক্। * * * আমিও আর্ট চাই, মেয়েদের নাচগান শেখাবার ইচ্ছা আমারও খুব, কিন্তু পয়সা কুড়োবার জন্যে বা বাহবা নেবার জন্যে আমার মেয়েকে আমি বাজারে নাচাতে চাই না * * *।"

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "অভিনয় অন্য অনেক প্রাচীন দেশের মত ভারতবর্ষেও পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট নাটক ও উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দ্বারা অন্য দেশের মত ভারতবর্ষের লোকদেরও খুব উপকার হইয়াছে।" ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে

নাটকাভিনয় প্রচলিত ছিল ও আছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য ; কিন্তু পুরাকালের সমাজতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত ও জাতিগত কাল্‌চারের দিক দিয়া মহিলারা নৃত্যগীত শিখিলেও প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যাহারা নাটকাভিনয় করিত তাহারা ভদ্রমহিলা নহে, তাহাদিগকে বলিত "কুশীলব বা স্ত্রী-জীবী"। "কুশীলব"দের পেশাই ছিল "মজুরা" লইয়া নাচগান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ। আজকালের সাধারণ নটীদের মত তাহাদের স্থান সমাজের নিম্নস্তরে ছিল। বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে" পাই, "কুশীলব—আগন্তবো অন্যস্মাদাগতা নটনর্ত্তকাঃ।" তাহাদিগকে "নট" "নটী"ও বলা হইত। "নট" ও "নটী"দের পরিচয় এইরূপ, "নটঃ—জায়াজীবঃ (ইতি অমরঃ, রঙ্গজীবঃ (ইতি হেমচন্দ্র)" "নটী"—রঙ্গ-যোষিৎ (ইতি বাৎস্যায়ণ)।" পরাশর বলিতেছেন, "নটঃ—শৌচিক্যাং কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব শৌচিকঃ শৌণ্ডি-কাজ্জাতো নটো বরুড় এবচ।" মনু বলিতেছেন, "নটঃ—ব্রাত্যায়াং ক্ষত্রিয়া-জ্জাতো।" সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে—আজকালের পেশাদার নট-নটী-দের মত পুরাকালেও পেশাদার নট-নটী ছিল, তাহারাই রঙ্গাভিনয় করিত (ভদ্রমহিলারা নহে) এবং সমাজে তাহাদের স্থান অতি নিম্নেই ছিল। অতএব "অভিনয় অন্য প্রাচীন দেশের মত ভারতবর্ষেও পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে"—এই যুক্তি দেখাইয়া সম্পাদক মহাশয় আজকালের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাভিনয় সমর্থন করিতে পারেন না।

আরো এক কথা—তিনি লিখিয়াছেন, "মহিলাদের নাট্যাভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন নিজের জন্য করা যাইতে পারে।" সুতরাং আশা করা যায়, একদল বেপরোয়া গোছের "spirited মহিলা" ব্যক্তিগত অর্থোপার্জ্জনের জন্য শীঘ্রই নৃত্যাভিনয় করিবেন ; এবং ইহাও আশা করা যায় যে, ভদ্রমহিলাদের নৃত্য দেখিবার সুবিধা পাইলে কেহই সে সুবিধা হারাইয়া পেশাদার নর্ত্তকীদের নাচগান দেখিতে যাইবে না। দেখা গিয়াছে, পুরাকালে একদল পেশাদর নটী ছিল এবং এখনও আছে। নট-বৃত্তিই তাহাদের অন্নসমস্যার সমাধান করে। নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা

তাহারা অর্থোপার্জ্জন করে বলিয়া সাধারণ পতিতা নারী অপেক্ষা তাহাদের 'হাল চাল' উহারই মধ্যে কিছু ভাল ও ভদ্র। যদি ভদ্রমহিলাগণ তাহাদের বৃত্তি কাড়িয়া লয় তবে তাহাদের কি হইবে—ইহাও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশ কি এতই দুর্ভাগা এবং তাহার অর্থোপার্জ্জনের পন্থা কি এমনই সঙ্কীর্ণ যে, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাগণকে শেষে পেশাদার নর্ত্তকীদের সহিত Competitionএ দাঁড়াইতে হইবে?

তারপর "হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য মহিলাদের নাটকাভিনয়" সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে বহুদিন হইতে বহু হিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজ চলিয়া আসিতেছে, অর্থাভাবে তাহার কোনটিই এ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। যদি নষ্ট হইয়া থাকে তবে তাহা অর্থাভাবে নহে, কর্ম্মিগণের পরস্পর বিশ্বাসঘাতকতা, কলহ, হিংসা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তার জন্য। এই সেদিন তিলক-ফণ্ডে মহাত্মা গান্ধী এককোটি টাকা তুলিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সবরমতী আশ্রমের মহিলাদের দ্বারা নৃত্যাভিনয় করাইতে হয় নাই; এই সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পল্লীসংস্কার কার্য্যে কয়েকলক্ষ টাকা তুলিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকেও ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাভিনয়ের সাহায্য লইতে হয় নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস-ভাজন হইলে ও কাজ দেখাইতে পারিলে টাকা আপনি আসে। সুতরাং অনর্থক ভদ্রমহিলাগণকে রঙ্গমঞ্চে নাচাইয়া তাঁহাদিগকে নৈতিক বিপদের পথে টানিয়া আনিবার এবং জনসাধারণের কাছে তাঁহাদের মর্য্যাদাহানী করিবার প্রয়োজন কি? 'কাল্‌চার' তো বাড়ীতে বসিয়াই করা যায়, আত্মীয়বর্গের সম্মুখেই তো নৃত্যকলা দেখাইতে পারা যায়। তাহার জন্য Stageএ নামিবার কোনই প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

আলোচনার প্রারম্ভেই সম্পাদক মহাশয় গুজরাটের হিন্দু ভদ্রগৃহস্থ বালিকা ও মহিলাদের "গরবা" নাচের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অর্থের জন্য কখনো অভিনীত হয় না। কোন বিশেষ পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে দেবস্থানে ঐরূপ নৃত্যের অভিনয় হয়। উহা তদ্দেশে পূজা অর্চ্চনার অঙ্গবিশেষ। সুতরাং গুজরাটের

"গরবা" নাচের সহিত বাংলাদেশের "সাগর" নাচ সমজাতীয় হইতে পারে না।

আর একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি পরহস্তে, সামাজিক শক্তি তো কিছু নাই বলিলেই চলে। রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি যদি নিজেদের হাতে থাকিত, অথবা সমাজ যদি এরূপ দুর্ব্বল না হইত তবে নারীদের অবমাননার কথা এরূপ নিত্য শোনা যাইত কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্র-শক্তির কথা এখন ছাড়িয়াই দি; সমাজ-শক্তি যতদিন না প্রবল হইতেছে, মহিলাদের আত্মচৈতন্য প্রতিকূল অবস্থায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য লইয়া যতদিন না জাগ্রত হইতেছে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে নারীকে যথোপযুক্ত সম্মান করিবার মনোবৃত্তির যতদিন না অধিকতর বিকাশ হইতেছে, ততদিন মহিলাগণকে (ব্যক্তিগত অর্থোপার্জ্জনের জন্য তো নহেই) পরার্থেও প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্যগীতাভিনয়ের জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে।

চন্দ্রেশ্বরানন্দ

বরপণ ও ক্ষতি—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ শেঠ চৌধুরী—মূল্য চারি আনা—বরপণের প্রভাবে দেশের ধনশক্তির ক্ষয় এবং দারিদ্র্যের সৃষ্টি দেখান হইয়াছে।

রাজগুরু যোগিবংশ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ জাতির বিবরণ—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার কর্তৃক প্রণীত, প্রথম খণ্ড—মূল্য এক টাকা—যোগিজাতির (যুগী) উৎপত্তি বিবরণ—নাথ যোগিগণের ব্রাহ্মণত্ব বিচার—ধর্ম্ম ও অবনতির ইতিহাস বিচারিত হইয়াছে।

গীতাবলী—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—ঢাকা—মূল্য আট আনা—ব্রহ্মচারী বোধচৈতন্য কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানা ভাবের গীত আছে।

ভারতের জাতীয়তা—হিন্দু-মিশন বাণী-মন্দির—হিন্দুর

সাধনা, বৈশিষ্ট্য, ত্রুটি, বিচ্যুতি, কর্ত্তব্য এবং ভারতের অ-হিন্দুদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

সতী—ভুজঙ্গধর প্রণীত—ক্ষুদ্র কাব্য; বিষয়:— দক্ষ-শাপ, উমা-রুদ্র-সংবাদ, সতী-দেহত্যাগ; ভাষা ও ছন্দ প্রাঞ্জল ও সুন্দর।

কৃষক—এর পুষ্ট কলেবর দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম—বাংলা ভাষায় এরূপ উৎকৃষ্ট কৃষি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা আর নাই।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান—সম্পাদক কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবি-রঞ্জন—প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একমাত্র বাংলা কাগজ। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন—দুর্ভিক্ষ কার্য্য

বাঁকুড়া

আমরা পূর্ব্ব আবেদন-পত্রে সহৃদয় দেশবাসীকে জ্ঞাত করাইয়াছি যে, আমরা বাঁকুড়ার অতিরিক্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছি। অর্থের অল্পতাহেতু আমরা বর্ত্তমানে বড়যোড়া থানার ৪৪ খানি গ্রামে ৫০০ জন লোককে ২৬ মণ চাউল বিতরণ করিতেছি। আমরা ঐ থানার অন্তঃপাতী গদারডিহি ইউনিয়নে সাহায্য বিস্তারের জন্য প্রতি গৃহে গিয়া তদন্ত করিতেছি, শীঘ্রই সেখানকার দুস্থ ব্যক্তিরা সাহায্য পাইবেন।

আমাদের কার্য্য অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে, কারণ—অর্থাভাব। আপনাদের আমরা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আপনাদের বদান্যতার উপর শত শত ব্যক্তির অন্ন নির্ভর করিতেছে। অন্যান্য বারে আপনারা যেমন দানে তৎপর ছিলেন এবারও